বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০২

বিশেষ পত্র ঃ নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. স্মরণ আচার্য — প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রানাঘাট মহাবিদ্যালয়

ড. শান্তনু মণ্ডল — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চন্দননগর সরকারি কলেজ

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান–৫০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০২

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

বিশ শতকের নাটক

পর্যায় গ্রন্থ : ১ রথের রশি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১ : রথের রশি : প্রাসঙ্গিক তথ্য

একক–২ : রূপকের তাৎপর্য ও নামকরণ

একক–৩ : নাট্যপ্রকরণ ও গঠন

একক–৪ : চরিত্র চিত্রমালা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ সিরাজদ্দৌল্লা – শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৫ : সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি ও ঐতিহাসিকতা বিচার

একক–৬ : ট্রাজেডি প্রসঙ্গ

একক–৭ : নাটকে গানের তাৎপর্য

একক–৮ : চরিত্র পর্যালোচনা

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ দেবীগর্জন – বিজন ভট্টাচার্য (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৯ : গণনাট্যের শর্ত ও দেবীগর্জন

একক–১০ : দেবীগর্জন : প্লট বিন্যাস

একক–১১ : নামকরণের তাৎপর্য

একক–১২ : লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ রাজরক্ত – মোহিত চট্টোপাধ্যায় (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ : নাট্যকার ও রাজরক্ত নাটকের আখ্যানের পরিচয়

একক–১৪ : অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে সার্থকতা

একক–১৫ : চরিত্র-চিত্রণে ও সংলাপ সৃজনে শিল্পকুশলতা

একক–১৬ : রাজরক্ত নাটকের নামকরণ

সূচিপত্র

তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০২

বিশেষ পত্র ঃ নাটক ও নাট্যমঞ্চ

বিশ শতকের নাটক

ডি এস ই : ৩০২	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	রথের রশি : প্রাসঙ্গিক তথ্য	১
	২	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	রূপকের তাৎপর্য ও নামকরণ	৬
	৩	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	নাট্যপ্রকরণ ও গঠন	১০
	৪	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	চরিত্র চিত্রমালা	১৫
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	ড. স্মরণ আচার্য	সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি ও ঐতিহাসিকতা বিচার	২১
	৬	ড. স্মরণ আচার্য	ট্রাজেডি প্রসঙ্গ	২৯
	৭	ড. স্মরণ আচার্য	নাটকে গানের তাৎপর্য	৩৫
	৮	ড. স্মরণ আচার্য	চরিত্র পর্যালোচনা	৪৩
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গণনাট্যের শর্ত ও দেবীগর্জন	৫৯
	১০	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবীগর্জন : প্লট বিন্যাস	৬৭
	১১	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নামকরণের তাৎপর্য	৭৩
	১২	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব	৭৭
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	শান্তনু মণ্ডল	নাট্যকার ও রাজরক্ত নাটকের আখ্যানের পরিচয়	৮৪
	১৪	শান্তনু মণ্ডল	অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে সার্থকতা	১১২
	১৫	শান্তনু মণ্ডল	চরিত্র-চিত্রণে ও সংলাপ সৃজনে শিল্পকুশলতা	১২৩
	১৬	শান্তনু মণ্ডল	রাজরক্ত নাটকের নামকরণ	১৩৩

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ১

রথের রশি : প্রাসঙ্গিক তথ্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.১.১ : রথের রশি : প্রাসঙ্গিক তথ্য

৩০২.১.১.২ : সময় বা কালের মাত্রা

৩০২.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.১.১.১ : রথের রশি : প্রাসঙ্গিক তথ্য

"কালের যাত্রা"র জন্মকথা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'রথযাত্রা' নামক একটি রচনা কবির মনে বর্তমান নাটকটি লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'রবীন্দ্র জীবনী' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, বিশ্বভারতীর সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের দিনে শ্রীবিশী তাঁর স্বরচিত 'রথযাত্রা' নাটকটি পাঠ করেছিলেন। এবং তারপরেই কবির মনে 'কালের যাত্রা' লেখার পরিকল্পনা আসে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমানসের তৎকালীন ছবিটি শ্রী মুখোপাধ্যায় এভাবে তুলে ধরেছেন —

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইল ২৫ আশ্বিন, ১৩৩০ (১২ অক্টোবর, ১৯২৩)। কবি আশ্রমেই থাকিলেন। বিজয়া দশমীর দিন তিনি তাঁহার 'যক্ষপুরী' নাটক পড়িয়া শুনাইলেন ; কিন্তু এখনো মনের মতো হইতেছে না ; তাই প্রকাশের তাড়া নেই।

ছুটির মধ্যে হাতে তেমন কাজের চাপও নেই, তাগিদও নেই ; একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিলেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, 'আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।' (রবীন্দ্র জীবনী ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮)।

'রথযাত্রা' নাটকটি রচনার এই তথ্যসূত্রের পাশাপাশি আমরা স্মরণ করতে পারি স্বয়ং শ্রী প্রমথ নাথ বিশীর স্মৃতিচারণা। তাঁর সাম্প্রতিককালের লেখা 'পুরানো সেই দিনের কথা' গ্রন্থে তিনি 'রথযাত্রা' নাটিকা রচনার উৎস সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা হল —

> ..... একদিন আমরা বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্র বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলাম সুপুর গ্রামটিতে। সেদিন ছিল রথযাত্রার টান। গিয়ে দেখি, উঁচু একটা খড়ের ঘরের মধ্যে

ভারি একটা রথ দণ্ডায়মান। আর সবাই মিলে তার দড়ি ধরে টানছে। রথ নড়ে না। শেষে আমরাও হাত লাগালাম। তবু রথ অনড়। এ কি, রথ চলে না কেন ? এতে তো গাঁয়ের অমঙ্গল সূচিত হচ্ছে। এমন সময় সকলে দেখল ধানের কলের কাজ শেষ করে সাঁওতাল নরনারী আসছে। তখন আমার মনে হঠাৎ চমক খেলে গেল, যে, এদের দিয়ে রথের দড়ি টানালে কেমন হয় ?

আমরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করলাম। সন্দেহ হল, গাঁয়ের লোকের পছন্দ হবে কিনা ! সাঁওতালদের কাছে প্রস্তাবটা করবামাত্র তারা তখনি রাজী হল, আর হাসতে হাসতে রথের দড়ি ধরে টান শুরু করল। রথ ঘড়ঘড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পথ ধরে ছুটল। .....কয়েকদিন পর একটা নাটক লিখলাম, যার নাম দিলাম রথযাত্রা। সেটি বিশ্বভারতীর বয়স্ক ছাত্রদের সভায় পড়লাম।

(পুরানো সেই দিনের কথা ঃ পৃঃ ১৭৮-১৭৯)

শ্রীবিশীর এই নাটকটিই পরে রবীন্দ্রনাথ পরিমার্জনা করেন এবং প্রবাসীতে দেন। ১৯২৩-এর অক্টোবর-এ 'রথযাত্রা' লিখিত হলেও, পরবর্তীকালে কবি তাকে পুনরায় সংশোধন ও পরিবর্তন করেন ; নাম দেন 'রথের রশি'। বর্তমানে এই নাটকটি 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। একই নাট্যবস্তুর দুই রূপ ও রূপান্তর যে-সময়ব্যাপী হয়, সেই সময় কবির অন্যান্য রচনা ও দেশকালের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। এতে স্পষ্ট হবে কবির মানসিকতাও।

'বলাকা' কাব্য রচনাকালেই 'কবির সঙ্গে একজন কর্মী এসে যোগ দিল' বলে মন্তব্য করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। তিনি আরো লিখেছেন, "এই কর্মী পুরুষকে আমরা আগের কোনো কোনো কাব্যেও দেখেছি, বিশেষত নৈবেদ্য-এ। কিন্তু এতখানি সমাজ সচেতন, অমঙ্গলপীড়িত দেশবিদেশের দুঃখ ও পাপ বিষয়ে কর্তব্য ভারগ্রস্ত কর্মীপুরুষের অস্তিত্ব ইতিপূর্বে অনুদ্ঘাটিত ছিল।" (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। পৃঃ ১০১-১০২) এক উদার মানবতাবোধ তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভাঙতে চেয়েছিলেন যুগ-যুগ সঞ্চিত প্রথার ধর্মমোহের কারাগার। শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন 'eternal man'কে খুঁজেছেন, তেমনি মানুষে মানুষে চেয়েছেন ঐক্য। প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎস রূপ তাঁকে পীড়িত করেছিল। তেমনি, এ দেশের রাজনীতিতে যে দলীয় স্বার্থবুদ্ধি, হানাহানি সাম্প্রদায়িকতা শুরু হয়েছিল তা ও তাকে করেছিল বেদনাবিদ্ধ। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন, যারা প্রধান পাপী সেই উচ্চবর্ণের উঁচুতলায় দালানকোঠায় বসবাস করে, আর মার খায় অস্পৃশ্যর দল। যাদের স্থান নীচুতলায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং গান্ধীজির নীতি — দুইই সমস্যাকে জটিল করেছে ; ঈশ্বরের দোহাই পেড়ে এই অসাম্যকে বিধান বলে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

এদিকে নোবেল প্রাইজ পাবার জন্যই বিদেশে নানাস্থানে কবি আমন্ত্রণ পাচ্ছেন বারে বারে। এই যাওয়া তাঁকে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করল। তিনি দেখলেন, ধনীর দম্ভ, যন্ত্রের পীড়ন ও আস্ফালন, আর মনুষ্যত্বের পেষণ। আলোচনা করলেন নানা মনীষীর সঙ্গে। মানবতাবোধ বিশ্বমৈত্রীতে উন্নীত হল। রাশিয়া ভ্রমণ তাঁর কাছে 'এজন্মের তীর্থদর্শন' রূপে প্রতিভাত হল, এখানে এসে উপলব্ধি করলেন, সমস্ত মানুষ কিভাবে সমানভাবে জেগে উঠেছে। আমাদের দেশে যে সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধি বিভেদ সৃষ্টি করে তার সম্পর্কে তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন 'কালান্তর' গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধেই কবির এইসব চিন্তা ও চেতনার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

কালান্তর-এর প্রকাশ গ্রন্থরূপে পরে হলেও প্রবন্ধগুলির লেখা শুরু হয়েছে অনেক আগেই। সুতরাং 'কালের যাত্রা' রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আকস্মিক ফলমাত্র নয়। বরং একটি ক্রমবিবর্তন রয়েছে। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এই বিবর্তন লক্ষ করেই বলেন যে, প্রৌঢ়ত্বে রবীন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর নবসমাজ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন তাঁর ফাল্গুনী থেকে কালের যাত্রা নাটকে।' (সমাজ ঃ প্রগতি ঃ রবীন্দ্রনাথ/ পৃ. ১৫৩)। একেবারে, শেষপর্বে রূপকথার মতন লেখা "গল্পস্বল্প" গ্রন্থেও দেখি এই মানবতা ও মনুষ্যত্বের বন্দনা। সেখানে 'বড় খবর' গল্পে নৌকার রূপকে প্রকাশিত হয়েছে দাঁড়ের দল তথা। নিচুতলার মানুষের অভিযোগ। মাঝিদের শাসিয়ে বলে, 'আমরা যদি ছোটলোক হই তবে জোটবেঁধে কাজে ইস্তফা দেব। দেখি তুমি নৌকা চালাও কি করে।" এই ছোটলোকদের জোটবাঁধার এবং জনশক্তির প্রতাপের কথাই বিশেষভাবে পাই 'রথের রশি' নাটকে। এতদিন যারা রথের চাকায় পিষ্ট হওয়াই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল, সকলের অনাদর আর অপমানই পাথেয় ভেবেছিল, তারাই এই নাটকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রমাদ গুণেছে উঁচুতলার মানুষজন। জয় হয়েছে তাদের। 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে আক্ষেপ ছিল, 'আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে জানান দিতে পারে না' — তা' এই নাটকে খণ্ডিত হয়েছে। 'লোকসাধারণ' এখানে 'নিজেকে জানান' দিতে পেরেছে। 'মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য সমাজ' — এই সত্যই তিনি প্রকাশ করেছেন 'কালের যাত্রা' নাটকে। 'চণ্ডালিকা' নাটকেও এই মনুষ্যত্বই আনন্দের উক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের কথাও। যেহেতু একই সময়ে এই দুই মহাপুরুষের কর্মকাণ্ড দেশে-বিদেশে প্রসারিত, প্রচারিত ছিল। সংগত কারণেই সাদৃশ্য ও প্রভাব থেকে গেছে। 'কালের যাত্রা'র পটভূমি বা প্রেক্ষাপটে একে উপেক্ষা করা হয়ত অনুচিত হবে।

তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, চিঠিতে, প্রবন্ধে ও গ্রন্থে বিবেকানন্দ বারংবার এই সমাজের পদদলিত শ্রমজীবীদের রুধিরস্রাবকে পূর্ণ মূল্য দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিভেদ যে মনুষ্যত্ব ও মানবতার বড় অপমান জেনেই বলেছিলেন —

'break down every barrier in the way of caste, and we should rise'

শ্রমবিভাজন মানেই শ্রেণীবিভাজন নয়, সমস্ত মানুষই এক — এই উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হলেই আমাদের ধ্বংস অনিবার্য ; অগ্রগতি রুদ্ধ। তাই ভারতের দরিদ্র, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, হীনবর্ণ সমস্ত মানুষকে অসীম ভালোবাসায় ডাক দিয়ে বলেছিলেন —

> Come all ye, the poor the poor and the disinherited, come ye, who are trampled under foot ; we are one. তাঁর বাণীই ছিল, ওঠো, জাগো, মানুষ হও — Come, be men ?

৩০২.১.১.২ : সময় বা কালের মাত্রা

রথযাত্রার একটি দিনই 'রথের রশি'র ঘটনা ও নাট্যবস্তু। উৎসব অথবা তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ভোর থেকেই। মেয়ের দল ও নাগরিকদের সংলাপে দিনের শুরু ধরা পড়েছে এইভাবে —

১. উঠেছে কোন্ ভোরে, তখন কাক
ডাকেনি
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব
দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে
গেল —

২. তবু আজ ভোর বেলা উঠে দেখি
ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে —

এই একই ভোরের উজ্জ্বলতা কাব্যিক উচ্চারণে ও উপমায় আভাসিত। রথের দড়ি প্রসঙ্গে যখন মেয়েরা বলে 'যেন যমুনা নদীর ধারা।' আমরা যমুনার নীল লাবণ্যকে ভোরের আলোয় ঝিকমিক করে উঠতে দেখি।

কিন্তু এই স্নিগ্ধতা, উৎসবের আবেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। 'বেলা হয়ে গেল' উক্তির পরেই জানতে পারি, রথ চলেনি। 'সব যেন থমথমে হয়ে আছে', এক অশুভ বোধে উচ্চকিত সকলেই। যে রথের দড়ি সকালবেলায় রৌদ্রে ছিল মনোহর, দুপুরের প্রখরতায় তাকে দেখে শেঠজির মনে হয়েছে 'যেন বাসুকি মরে উঠল ফুলে'। দুপুরের এই আলোর তীব্রতা আরো ঠিকরে পড়ে ধনপতিদের হীরের আংটি থেকে, যেন 'আলোর উচ্চিংড়েগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।' একইসঙ্গে ধনের বিকার এবং মধ্যাহ্নের খরতা এই উপমায় প্রতিভাত হয়েছে। এই মধ্যাহ্নে ধনিকদের আগমনও কি ইঙ্গিতবহ নয় ? যে বৈশ্যশক্তি ঐশ্বর্যে—প্রতিপত্তিতে দীপ্তিমান ; রাজাও যেখানে 'অর্ধ-বেনেরাজেশ্বর' তাদের সেই গৌরবের মধ্যাহ্ন কি সূচিত করে না অপরাহ্ণ এবং অবসানকে ? যা আমরা এই নাটকের প্রায় অন্তিমেই দেখতে পাই। রথের দড়ি টানায় ধনিকদের 'অর্থবান হাতের পরীক্ষা' ব্যর্থ হয়েছে ; জয়ী হয়েছে শূদ্রদল। দিনের চতুর্ভাগে চতুর্বর্ণের আসা-যাওয়াও মনে হয় তাৎপর্যপূর্ণ।

মেয়েদের পুনরাগমন ঘটেছে প্রায় বিকেল বেলায়। দ্বিতীয় নারী জানিয়েছে, তিনকড়ির মায়ের নির্দেশ মতো 'ঠিক 'দুপুর বেলা' তালপুকুরে সতের বছরের ব্রাহ্মণকন্যার স্নান করিয়ে তারই হাতে 'পাটশিয়ালা' তুলে এবং অন্যান্য মেয়েলি তুকতাক করে তবেই সে এসেছে রথের কাছে। সুতরাং দুপুর যে গড়িয়ে যাচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই। কারণ, রথের কাছে এসে সে জেনেছে দড়ি-নারায়ণের 'রোদ্দুরে তেতে উঠেছে মেঘবরণ গা'। খেদি যখন ভোগের জন্য আনে খিচুড়ি, তখন 'বেলা হয়ে গেল' এই আক্ষেপ যথার্থ মনে হয়। রান্না হয়ে যাবার মত সময় অন্তত সেদিনের বিপর্যস্ত দিনে, এই সময়ের অতিবাহন অবসিত দুপুরকেই নির্দেশ করে।

দিনের অন্তিমে এসেছে শূদ্রদল। এ যেন যুগাবসানের ইঙ্গিতও। যে রথ চলেনি পুরোহিত-রাজা-সৈনিক-ধনিকদের হাতে, সেই রথ চলল শূদ্রের হাতের স্পর্শে। সকলের আর্ত হাহাকার 'অন্যায়', 'ঘোর অন্যায়' ধুলোয় মিশিয়ে রথের চাকা এগিয়ে গিয়েছে।

দিনের শুরু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'কালের যাত্রা'র গতি। তবু সীমাবদ্ধ নয় সেই চলা, কালের যাত্রার কালসীমা সীমাহীন। তার যাত্রা অন্তহীন পথে।

৩০২.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রথের রশি' নাটিকায় কালান্তরের কি আভাস পাও, ব্যাখ্যা করো।

২। 'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনার সঙ্গে এসে মিলেছে ইতিহাসের বীক্ষা।–আলোচনা করো।

৩। কালের যাত্রায় শোষিত বঞ্চিত, অন্ত্যজ গোত্রের মানুষজনের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ 'রথের রশি' নাটিকায় কীভাবে উন্মোচিত তা আলোচনা করো।

৪। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিবর্তনের ক্রমপরম্পরা 'রথের রশি' নাটকে বিধৃত হয়েছে–বিষয়টি উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করো।

————————

একক - ২

রূপকের তাৎপর্য ও নামকরণ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.২.১ : রূপকের তাৎপর্য

৩০২.১.২.২ : নামকরণ

৩০২.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.১.২.১ : রূপকের তাৎপর্য

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে কবি 'কালের যাত্রা' নাটকটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। একটি চিঠিতে নাটকটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানান। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯-এ কবি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন —

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই — রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে সম্মুখের দিকে চলবে।

এখানে লক্ষ করার মতো, যে, 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে কবি যে হতমান মানুষকে সম্মানিত করেছেন, সেই গ্রন্থ তুলে দিয়েছেন শরৎচন্দ্রের হাতে। এই শরৎচন্দ্র, যিনি, যারা সংসারে শুধু দিলে, পেলে না কিছুই ; মানুষ হয়ে মানুষ যাদের চোখের জলের হিসাব নিলে না, — তাদের কথা, কথা ও অভিযোগ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রচার করেছেন। এই দিক দিয়ে গ্রন্থটির উৎসর্গ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের বাণী' শরৎচন্দ্র জানেন বলেই তাঁর প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রয়েছে। নইলে কেন পুনরায় 'সাধারণ মেয়ে'র কথা লিখতে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ জানাবেন !

শরৎচন্দ্রকে লেখা উল্লিখিত চিঠিই প্রমাণ করে, যে, কালের যাত্রা সাধারণ নাটক নয়। তা রূপকধর্মী নাটক। এবং এই কারণে এই নাটকে একটি তত্ত্ব দুর্নিরীক্ষ নয়। তবু প্রশ্ন জাগে, অচলায়তন,

মুক্তধারা, রক্তকরবীতে কবিরূপকে প্রতীকে নানাভাবে যা বলেছেন, সেই কথা বলার জন্য কবি কেন রূপকের দ্বারস্থ হলেন ? প্রবন্ধগুলিতে যেভাবে তাঁর বক্তব্য সোজাসুজি বলেছেন, নাটকে তা বললে কি ক্ষতি ছিল ?

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যে দৃশ্যমান জগৎ অরূপের আভাস সত্ত্বেও অবাস্তব নয়। যুগোচিত চিন্তাভাবনা যথাযথ পরিবেশে চিত্রিত হয়েই যুগোত্তীর্ণ হয়েছে। রূপক নাটক মূলত ভাবমূলক। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই 'ভাব' নীরক্ত নয়। শিল্পের প্রেরণায় নাটকে যখন তিনি রূপকে-প্রতীকে নেপথ্যচারী, তখন তাঁর প্রবন্ধের ভাষা স্বচ্ছ, খাপখোলা তলোয়ারের মতই শাণিত, উজ্জ্বল। যেমন 'পল্লীসেবা' প্রবন্ধে তিনি যখন বলেন —

> মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি, সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক ; এই সংজ্ঞাটা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।

কিংবা রাশিয়ার চিঠিতে সোজাসুজি বক্তব্য রাখেন —

> চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে। তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত।

'কালের যাত্রা'য় রথ চলার রূপকে এই উচ্ছিষ্টপালিত ছোটলোকদের কথাই বলেন, তবে অন্যভাবে —

দলপতি ঃ একবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত ঃ রশি ধরতে ! ভারি বুদ্ধি তোমাদের। জানলে কি করে !

দলপতি ঃ কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।

> ভোরবেলা উঠে সবাই বললে সবাইকে ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়, পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
>
> ডাক দিয়েছেন বাবা।

এই রূপকের মেঘাবরণ এমন ঘন নয়, যে, ভিতরের সূর্যটি দেখা যাবে না। শূদ্রের হাতেই যখন রথ প্রাণ পায়, তখন গুহাহিত সত্য সহজেই চোখে পড়ে। বচনে, বাচনে, আচরণে সমস্তই এমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যে, অবিশ্বাস করার কিছু থাকে না। অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নাট্যশিল্পের সব শর্ত মেনে কিভাবে এই নাটক 'কালান্তর'-এর ভাষা পায় তাও দেখার মত ! শূদ্র দলপতি যখন বলে,

> আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

আবার মন্ত্রী যখন জানায়,

> নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, / বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।'

তখন রূপকের অন্তরাল দূরতিক্রম্য মনে হয় না। যে রথ জগন্নাথের তা যে সমাজরথ তা অস্পষ্ট থাকে না।

৩০২.১.২.২ : নামকরণ

'কালের যাত্রা' নামে কোনো স্বতন্ত্র নাটক নেই। 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা' এই দুটি নাটিকার সমন্বয়ই 'কালের যাত্রা'।

'রথযাত্রা' নাটিকাটির প্রকৃত রচয়িতা কে, এই নিয়ে গবেষণার অন্ত ছিল না। শ্রী প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'পুরানো সেই দিনের কথা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে তথ্য দিয়েছেন, (যার বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি) তাতে সমস্ত কৌতূহল নিরস্ত হয়েছে। 'রথযাত্রা' রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, অন্য কারোর নয়।

'রথযাত্রা' ও 'রথের রশি'র বিষয়বস্তু একই হওয়া সত্ত্বেও এই নামবদল কেন ? এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। দুটি নাটকের রচনারীতির পার্থক্য —

প্রথমটি গদ্যে, পরের গদ্যছন্দে লেখার জন্যই নামান্তর, গ্রাহ্য হতে পারে না। 'রথযাত্রা' কোনো আধ্যাত্মিক নাটক নয়, মানুষের এগিয়ে চলার ইতিবৃত্ত এই 'রথযাত্রা'। কিন্তু দেখা দরকার, এগোবে কে ? রথ, নাকি মানুষ ? 'রথযাত্রা' গদ্যনাটিকায় সৈনিকদের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন, 'ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।' এই 'দড়ি' কি ? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — 'মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই রথ টানবার রশি'। এই রশি আজ অনাদৃত, অবহেলিত বলেই কালের যাত্রা স্তব্ধ। সুতরাং রথ যারা চালায়, তাদের দিতে হবে মর্যাদা। রথ বড় নয় ; রথ চলাই বড় এবং সেই রথ যারা চালায়, 'সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে' (মানুষের ধর্ম)। সুতরাং 'রথযাত্রা' নামকরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈপ্সিত মতাদর্শের সম্যক প্রতিফলন দেখতে পেলেন না। সেই নাম পরিত্যক্ত হল। নতুন নাম 'রথের রশি'। নামের সঙ্গে সঙ্গে রীতিরও বদল ঘটল। এই নামান্তরে প্রাসঙ্গিকতা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রমথনাথ বিশী — সেই রশিতে টান পড়িলে ইতিহাসের রথ নড়িয়া ওঠে, যে রথের রথী হইতেছেন মানবভাগ্যবিধাতা। কিন্তু কোনো কারণে যদি রথের রশির গ্রন্থি শিথিল হয়, বাঁধন আলগা হইয়া আসে, তখন দড়িতে টান পড়িলেও সে টান রথ পর্যন্ত পৌঁছায় না, রথ অচল হইয়া থাকে। নাটকে রথ না চলিবার ইহাই কারণ।

(রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৯৭)

'রথের রশি' নাটকের কবি-ও কি সেই ইঙ্গিত দেননি, যখন শূদ্রের ঐক্যমুখী শক্তিতে রথ ছুটে চলেছে দেখে পুরোহিত বলেন, শূদ্রশক্তিই কি শেষপর্যন্ত জয়ী হবে ? প্রত্যুত্তরে কবির সংলাপ অনাগত ভবিষ্যৎকে তুলে ধরেছে —

পারবে না হয়ত
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের
সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে-
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের

এবং 'রথযাত্রা' গদ্য নাটকে কবির ব্যাখ্যা আরেকটু বিশদ ; 'যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে।' জ্ঞান, কর্ম ও ভাবের এই অনৈক্য দূর করার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা।

অতএব 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের 'রথের রশি' নাটিকার নামকরণ কেন তাৎপর্যপূর্ণ, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ, তাতে অবহেলা, অনাদর, বিদ্বেষ এলেই ঘটে ছন্দপতন।

নাটকে মেয়েদের ব্যাকুল প্রার্থনা ও পূজো ব্যর্থ হল এইজন্যই যে, তারা পূজো করেছিল বাইরে ; 'তাদের পূজো পড়েছে ধূলোয়, ভক্তি করেছে মাটি।' যে দড়ি 'মানুষে মানুষে বাঁধা' তাকেই করেছে অনাদর। 'জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।'

তাই কবির আহ্বান : 'ওদের সঙ্গে মিলে ধরো সে রশি' এবং 'রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না।' এই রূপক বা প্রতীকের অন্তরাল ভেদ করে বেরিয়ে আসে সেই চিরচেনা কবিকণ্ঠস্বর যা আমরা গীতাঞ্জলি পর্বেই শুনেছি —

১. এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত
সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব
অপমান ভার।

২. নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

৩০২.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রথের রশি' নাটিকার নামকরণ যথাযথ কিনা আলোচনা করো।

২। 'রথের রশি' নাটিকার রূপকার্থ বিশ্লেষণ করো।

৩। 'রথের রশি' নাটকটির নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৪। 'রথের রশি'—নাটকটির রচনার পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করে নাটকটির নামকরণ কতদূর প্রাসঙ্গিক ও সার্থক তা' দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

———————

একক - ৩

নাট্যপ্রকরণ ও গঠন

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.৩.১ : নাট্য-প্রকরণ ও গঠন

৩০২.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.১.৩.১ : নাট্য-প্রকরণ ও গঠন

প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো নাট্যশাস্ত্রীর নির্দেশেই 'রথের রশি' কে বাঁধা যায় না। এর কারণ, প্রথমত এটি পূর্ণাঙ্গ নাটক নয় ; ছোট একাঙ্কধর্মী নাটক। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত নাটকের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে নবতমরূপ খোঁজার যে চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই করেছিলেন, এখানেই তা ফলবান হয়েছে। যদিও 'কালের যাত্রা' অভিনীত হবার বিস্তারিত কোনো সংবাদই আমরা পাই না ; শুধু জানি, ১৯৩২-এ শান্তিনিকেতনে এই নাটিকা মঞ্চস্থ হয় এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল আবৃত্তিকারের। 'কালের যাত্রা'র মঞ্চসাফল্য কতখানি তার বিবরণ দুর্লভ।

তথাপি এই নাটকের রীতি ও প্রয়োগে তথা প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ভাবনাই বিজড়িত। এই হিসেবে তার মূল্য যথেষ্ট।

প্রথম জীবনের নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ হিসেবে মেনেছিলেন শেক্সপীয়রকে। এছাড়াও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কম ছিল না। তাঁর 'বিসর্জন', 'রাজা ও রানী' ইত্যাদি নাটক তারই সাক্ষ্য দেয়। মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে এই রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমাদের দেশে 'যাত্রা', জাপানের 'নো' নাটকের আদর্শ ক্রমশ তাঁকে অনুপ্রাণিত করল সেই নাটক লিখতে, যেখানে দৃশ্যপটের ব্যবহার লোকের চোখ ভোলায় না। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট জানালেন — 'অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত।' ওটা তাঁর কাছে 'ছেলেমানুষ'। তিনি দর্শকের 'কল্পনার উপরে দাবি' রাখলেন।

'রথের রশি'র ক্ষেত্রে দেখা গেল কবি তাঁর মতাদর্শকে রূপ দিতে পেরেছেন। এখানে কোথাও প্রবেশ ও প্রস্থান ছাড়া সামান্যতম বিবরণ নেই। শুরু থেকেই শেষপর্যন্ত এক আদ্যন্ত সুসম গতিতে বয়ে চলল নাট্যপ্রবাহ। দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরের আঘাতে বিক্ষত হল না তার অখণ্ডতা। এই নাটকেই বোঝা গেল নাটক ও তার অভিনয় কত বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। রথ না চলার একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগাগোড়া এই নাটক স্তরে স্তরে এগিয়ে গেল প্রোথিত লক্ষ্যে। চতুর্বর্ণ বিভক্ত সমাজের শ্রেণীসংগ্রাম

তথা ধর্মমোহের প্রতি ধিক্কার এই নাটকে সোচ্চার হতে দেখা গেল। চিরাচরিত প্রথানুসারে রথ চলত রাজা ও ব্রাহ্মণের হাতে। এইবার দেখা গেল ব্যতিক্রম, রথ চলল না তাঁদের হাতে। অবশেষে শূদ্র দলপতির হাতের টানে চলল রথ। 'হায়, হায় করে উঠল প্রাচীনপন্থীর দল। তবু তারাই যোগ দিলে সেই কালের রথযাত্রায়। সমাজ-রথের দেবতা এতদিন যে অনাচার সহ্য করেছিলেন, আজ হল তার প্রায়শ্চিত্ত।

নাটকের শুরু থেকেই আমরা উৎকণ্ঠিত নরনারীদের দেখতে পাই যারা রথের মেলায় এসেছে আনন্দের জন্য ; পুণ্যার্জনের জন্য। কিন্তু রথের অচলতা তাদের আতঙ্কিত ও অশুভবোধে পীড়ন করে। সংলাপে টের পাওয়া যায় কিভাবে আকুল নরনারী রথের যাত্রাপথে চেয়ে আছে। প্রচলিত নাট্যভঙ্গিতে লেখা নয় এই নাটক। সমগ্র দিন ও রাত্রিকেও ব্যবহার করা হয়নি এই নাটকে। সমস্ত নাটকটিই দাঁড়িয়ে আছে পথের ওপরে। পথে চলাটাই বড় ব্যাপার ; তবু পথ এই নাটকের শেষ কথা নয় ; চলাও নয়। বড় কথা, যারা চলবে এবং রথ চালাবে তারা।

আগাগোড়া ঘটনার অভিঘাতে, নাটকীয়তায়, এবং কাব্যিকভাবে উজ্জীবিত এই নাটক হয়তো বা 'কাব্যনাট্য'র সঙ্গে তুলনীয়।

সমগ্র নাটকটি একটি মাত্র পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কিভাবে আমাদের জীবনের মুখোমুখি করে দেয়, সেটা দেখবার মত। উপমায়, প্রতীকে এই নাট্যরস ও কাব্যরস যুগপৎ কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা প্রবল করে তোলে। স্থান-কাল-পাত্র ছাপিয়ে এই নাটক আবেদন রাখে আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের কাছে। ঘটনার আঘাতে মন যখন বিমূঢ় ও উৎকণ্ঠিত, তখনই কাব্যের আবেগ করে চিত্তকে প্রশমিত। নাটকের দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাব্যের প্রশান্তি — এক মহৎ মানবতাবোধে উত্তীর্ণ হই আমরা। রথযাত্রার আড়ম্বর, সংকীর্ণতা, কোলাহল পেরিয়ে আমরা অনুভব করি, পূজা নয়, ভালোবাসা — মানুষকে ভালোবাসা।

যে-কোনো নাটকেই সংলাপের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যদি তা কাব্যনাট্য হিসেবে বিচার্য হয়, তবে দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্যই কাব্যপদবাচ্য। 'রথের রশি'র ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবীন্দ্র-নাটকের চরিত্রেরা তাঁরই ভাষায় কথা বলে, এই অভিযোগ অসত্য নয়। তথাপি দেখা দরকার সেই সংলাপ নাটককে তার যথার্থ প্রেক্ষাপট দিচ্ছে কিনা !

'রথের রশি'র বিভিন্ন চরিত্ররা নানা কণ্ঠে কথা বলেছে, আর সেই বচন-বাচনে যেমন পাই বাস্তবতা, তেমনি তা বস্তুর অতীতকে ছুঁয়ে যায়। মেয়েরা যখন এই নাটকে বলে,

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ—

বেরোবেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর শিষ্য নিয়ে —

বেরোবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত

পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে।

তখন চলমান জীবনকেই দেখি। তারপরই 'কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে' এই উৎকণ্ঠা ভবিতব্যকে গম্ভীর করে তোলে। এক আসন্ন সর্বনাশকে ইঙ্গিত করে। আবার সন্ন্যাসী যখন 'সর্বনাশ এল' বলে ছুটে আসে, তখন এক অলৌকিক বাতাবরণ রচিত হয় সংলাপে —

গুরু গুরু শব্দ মাটির নীচে।

ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।

গুহার মধ্য থেকে আগুন লকলক মেলছে

রসনা।

মেয়েদের সংলাপে রথের দড়িকে ঘিরে যেসব প্রতীকী উৎকণ্ঠা, আবেগ পাই তাও পরিবেশকেই স্বীকার করে। 'রথের দড়ি' তাদের কাছে কখনো অজগর সাপ, কখনও বা যমুনা নদীর ধারা, গনেশ ঠাকুরের শুঁড়। এই দড়ির বন্দনা তারা করে। মানতও করে। দড়িকে ঘিরে এই বিচিত্র অনুভূতি তাদের মনের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। সাপ বা নাগকন্যার বেণীর প্রতীকে আদিম কামনার ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে, বুঝি। যমুনা নদীকে ঘিরে যে কৃষ্ণকথার মিথ, সেখানেও আছে প্রেমের আভাস। সেইসঙ্গে সৌন্দর্য্য দর্শনও। নাগরিকরা এই একই দড়িকে দেখেছে 'যুগান্তের নাড়ী' রূপে। — যা সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্ দব্ করছে। শ্রী শঙ্খ ঘোষ এই দুই দেখার তুলনা করে বলেছেন 'মেয়েদের সংলাপে আছে এক অবোধ ভঙ্গি, সর্বনাশকে তারা দেখতে পাচ্ছে অনেকটা বাইরের দিক থেকে। কিন্তু পুরুষ নাগরিকদের কথায় দেখি, যুগযুগান্তকে বুঝে নেবার চেষ্টা, আর তাই তারা ব্যাধিটা লক্ষ করে আত্মশরীরের ভিতর থেকে। ..... এর জন্য প্রয়োজন ঘটবে আত্মচিকিৎসার।' (কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, পৃঃ ৩৭-৩৮)

সৈনিক ও ধনিকদের সংলাপে তাদের স্বভাব ও চরিত্রই প্রতিফলিত।

১. আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করিনে আমরা

২. ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে ঢালব ওদের রক্ত।

সৈনিকদের এই সংলাপ যেমন নাটকের বস্তুগত প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তেমনি কাব্যনাট্যের শর্তকেও উপেক্ষা করে না। শত্রুর মুণ্ডপাত 'ঘড়ার ঢাকনা'র উপমায় অনায়াসে উঠে আসে তাদের জিভে। ধনপতির দল প্রসঙ্গেও তারা দেখতে পায় তাদের হীরের আংটি থেকে 'আলোর উচ্চিংড়ে' লাফিয়ে চোখে পড়ছে। প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। কাব্যের স্বাদ রেখেও নাটক বলেই সংলাপে আবেগ সংহত। এমনকি নাটকে কবি যখন ছন্দের কথা বলেন, তখনও তা আবেগার্ত হয় না। 'যুগাবসানে, লাগেই তো আগুন। / যা ছাই হবার তাই ছাই হয়' — কবির এই সংলাপ একইসঙ্গে বাস্তবতাকে স্বীকার করেও এক অন্যতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে — যা এক মহত্তম মানবতাবোধে, ভালবাসায় আমাদের উন্নীত করে। 'রথের রশি'র ভাষা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'রথের রশির ভাষা গদ্য হইলেও কবিতার ন্যায় মধুর।' (বাংলা নাটকের ইতিহাস, অজিত কুমার ঘোষ, পৃ: ৪১৫)

'রথযাত্রা' নাটকের সাদামাটা গদ্যভাষার সঙ্গে 'রথের রশি'র গদ্যছন্দ তুলনা করলেই দেখা যাবে, সাদা গদ্যে কবির ভাব যেন যথেষ্ট বলশালী ও ব্যঞ্জনাধর্মী হতে পারেনি। বড্ড বেশি বিবরণময় মনে হয় সংলাপগুলোকে। অথচ যখনই গদ্যছন্দে রূপান্তরিত হল একই নাটক (নামান্তরে 'রথের রশি') যেন প্রাণ পেয়ে নেচে উঠল। ঠিক ঐ অসাড় রথের দড়ির মতোই 'রথযাত্রা' থেকে 'রথের রশি'র রূপান্তর মনে হয়

'মরা নদীতে যেমন বান আসে,' তেমনি যেন প্রাণ পেয়েছে নাটক। শ্রী অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে মূল্যবান দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, তা যথার্থ বলে মনে হয়, 'গদ্য সংলাপ কী কৌশলে গদ্যকবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে তার সূত্র নির্ণয় করা সহজ হয় যখন দেখি, নিঃশ্বাসের পতন, উচ্চবর্ণের সুবিধা এবং ভাব অনুযায়ী গদ্যের বাক্যগুলিকে নানা দীর্ঘ হ্রস্ব পংক্তিতে বিন্যস্ত করা হয় এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে ; যেখানে গদ্যের মতো বাক্যের শেষে বসে সেখানে ব্যতিক্রম বৈচিত্র্য সৃষ্টির দায়ে। নিম্নোদ্ধৃত সংলাপের দুইরূপ লক্ষ করলে এই দুইটি সূত্র সত্য বলে গ্রাহ্য হবে মনে হয়।

রথযাত্রা

২ সৈনিক ।। কবি, আজ রথযাত্রায় এই যেসব উল্টোপাল্টা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পারো ?

কবি ।। পারি বৈকি।

১ সৈনিক ।। পুরুতের হাতে রাজার হাতে রথ চল্‌ল না, এর মানে কী ?

কবি ।। ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হয় না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

রথের রশি

দ্বিতীয় সৈনিক ।। একি উল্টোপাল্টা ব্যাপার কবি। পুরুতের হাতে চলল না রথ —রাজার হাতে না— মানে বুঝলে কিছু ?

কবি ।। ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—

নিচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করল তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন
তাকে ওরা মানেনি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে
— দেবে
ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।" .....

(রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য। পৃ: ৮৪-৮৫)

এই প্রতিতুলনায় বোঝা যায় 'রথযাত্রা' নিয়েছিল বোঝাবার দায় ; ফলে এসেছিল অতিকথন দোষ। 'রথের রশি' সেই দোষমুক্ত। এখানে কবি তাঁর শর্ত — পাঠক ও দর্শকের কল্পনার দাবি মেনে নিয়েছেন। তাই তা বোঝবার চেয়ে বাজবার হয়ে ওঠে নাট্যরসিকের কাছে।

৩০২.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। রূপক ও প্রতীক বলতে কি বোঝো? রথের রশিকে কোন্ শ্রেণীর নাটক বলা যায়?

২। 'রথের রশি' নাটকের সংলাপ বিষয় ও চরিত্রানুযায়ী হয়নি। তুমি এই অভিমত সমর্থন করো? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৩। 'রথের রশি'—নাটকের ঐশ্বর্য-এর সংলাপ নাট্যদ্বন্দ্ব ও চরিত্রের মূল্যায়নে এ নাটকের সংলাপ কতখানি সহায়ক তা' দৃষ্টান্ত সহযোগে পর্যালোচনা করো।

———————

একক - ৪

চরিত্র চিত্রমালা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.৪.১ : চরিত্র চিত্রমালা
৩০২.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী
৩০২.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.১.৪.১ : চরিত্র চিত্রমালা

রবীন্দ্রনাথের নানা চর্চা ও অনুসন্ধিৎসার মধ্যে লোকজীবন ও লোকসাহিত্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ অন্যতম, একথা আমাদের অজানা নয়। 'রথযাত্রা' কে কেন্দ্র করে আমাদের জনমানসে যে উদ্দীপনা জাগে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একালেও সুলভ। সুদূর নীলাচল বা পুরীতেই নয়, গ্রামবাংলার সর্বত্র এই 'রথযাত্রা'। এক বিশিষ্ট উৎসব। একে কেন্দ্র করে ধর্মভীরু মানুষের বিচিত্র বিশ্বাস ও সংস্কার আবর্তিত হয়। রথ চলার ওপর নির্ভর করে দেশ ও দেশবাসীর শুভাশুভ, ভবিষ্যৎ। 'কালের যাত্রা' নাটকে সংগত ভাবেই রথযাত্রাকে ঘিরে উৎকণ্ঠিত নরনারীর সমাবেশ ঘটেছে। টমসনের মত সমালোচক যখন নির্দ্বিধায় লেখেন, রবীন্দ্র-নাটকের মানুষরা 'vehicle of ideas', তখন 'কালের যাত্রা'য় জনসংঘের কথা মনে পড়ে। কেননা, এই জনতা ভাবচিত্র নয়, জীবন্ত চরিত্র। তাদের কথায়, আচরণে তারা স্বতন্ত্র প্রত্যেকে। অথচ অখণ্ড এক 'জনতা'।

'রথযাত্রা' ও 'রথের রশি' নাটকের চরিত্রমালার দিকে তাকালে যে পার্থক্য প্রথমে চোখে পড়ে, তা মেয়েদের উপস্থিতি। গদ্যনাটক 'রথযাত্রা'য় মেয়েরা অনুপস্থিত। অথচ 'রথযাত্রা'র মধ্যে যে শুভাশুভ বোধ, সংস্কার, স্ত্রীআচার, মেয়েলি উচ্ছ্বাস থাকে প্রাক্তন নাটকে তা নেই। সেই পরিবেশগত বিবর্ণতা দূর হয়েছে 'রথের রশি'তে, এসেছে সম্পূর্ণতা। এই নাটকে মেয়েদের উপস্থিতি, তাদের প্রতিক্রিয়া, আচার-আচরণ সমগ্র নাটকে একইসঙ্গে বাস্তব ও জীবন্ত করেছে। নাটকের শুরুতে দেখি, রথ দেখতে ছুটে আসা মেয়ের দল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিস্মিত, চঞ্চল, উৎকণ্ঠিত। রথ চলছে না। একি অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কাণ্ড। এতদিন তারা দেখে এসেছে, ব্রাহ্মণঠাকুর, রাজা, সৈন্য-সামন্ত একে একে বেরোয় এই শুভযাত্রায়। উচ্ছল, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চারদিক। কিন্তু আজ

> চারদিকে সব যেন থমথমে হয়ে আছে,
>
> ছমছম করছে গা।

রথের দড়িকে ঘিরে শুরু হয় তাদের উদ্বেগ, ত্রাস, আকুলতা। প্রতীকের প্রয়োগে সেই ভাবনাচিন্তা আরো তীব্র ও জটিল হয়েছে। দড়ি তাদের কাছে দেবতা, এমনকি রাস্তাকেও ঠাকুর বানায় তারা। তুচ্ছ হয়ে যান রথাসীন দেবতা।

রথযাত্রার লোকায়ত রূপটি নানাভাবে ফুটে উঠেছে এ নাটকে। যেসব লৌকিক সংস্কার অর্থহীন, অবাস্তব— তাও এই রথের জন্যই মেয়ের দল মেনে নিয়েছে।

লোকচেতনায় যেসব আদিম বিশ্বাস আজো অটুটভাবে রয়ে গেছে, 'সিঁদূর' তার অন্যতম মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ। সেই সঙ্গে 'চন্দন' পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ। রথযাত্রায় এই দুয়ের উল্লেখ তাই লোকায়ত আবহকেই সুস্পষ্ট করে তোলে।

রথযাত্রার উৎসবে উৎসুক মেয়ের দলের পরেই এসেছে পুরুষ নাগরিকবৃন্দ। নাগরিকের আভিধানিক অর্থ যাই হোক, এখানে তারা জনতার অন্যতম। তাদের স্বতন্ত্র জাত বা জাতি নেই। সমাজের ভালোমন্দের ব্যাখ্যাকর্তা তারা। তারাই এই সমাজ ও মানুষের ভালোমন্দের পারদযন্ত্র। — যেখানে ধরা পড়ে তাপমাত্রা। তাদের উক্তিতেই বুঝি সমাজ কতটা এগোল কিংবা অনড়।

অচল রথ ও অনড় দড়ি নিয়ে মেয়ের দল যখন অমঙ্গলের ভয়ে শঙ্কিত, পূজোর আয়োজনে ব্যস্ত, তখনি নাগরিকদলের প্রবেশ। মেয়েদের মতো ভীরুতা তাদের হয়ত নেই ; কিন্তু ভবিতব্য ভেবে তারাও উদ্বিগ্ন। রথের দড়ি তাদের কাছে 'যুগান্তের নাড়ী' বা 'সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্ দব্ করছে।' তার রঙ নীলবর্ণ মনে হয়েছে কারোর কাছে।

সচেতনতা, পরিহাস, যুক্তিবাদিতা নিয়েও এই নাগরিকদল মেয়েদের সঙ্গে তুলনায় খুব দূরে থাকে না। রথের অচলতা, শূদ্রের অধিকারবোধ, শুচিতা ইত্যাদি বিষয়ে তারাও রক্ষণশীল, ধর্মভীরু। 'রথের রশি' নাটকের শেষে এই নাগরিকদের আর পাই না।

'রথের রশি' নাটকে (রথযাত্রা গদ্যনাটকেও) মন্ত্রী চরিত্রটি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। মন্ত্রী অর্থাৎ যিনি মন্ত্রণা দেন ; এই পদের যোগ্য ব্যক্তি তিনি। এই নাটকে পদে পদে তাঁর বিচক্ষণতা আমাদের চমৎকৃত করে। এই দূরদর্শিতার ফলে চরিত্রটির বিবর্তনও ঘটেছে। জনতার প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই প্রথম যুগান্তরকে স্বাগত জানিয়েছেন।

রথযাত্রার দিনে যে অঘটনে সকলে বিচলিত, সেখানে একমাত্র মন্ত্রীই মাথা ঠাণ্ডা রেখে একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন রথ চালাতে। 'রাজা'র নাম পেলেও এই নাটকে রাজার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। ধরে নিতে পারি রাজার ইচ্ছাকেই মন্ত্রী রূপ দিচ্ছেন। জনতা যখন পারস্পরিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে যুক্তি-তর্কে মত্ত, তখনই ধনপতির সঙ্গে মন্ত্রীর সরাসরি প্রবেশ। তাঁর সংলাপে এটুকু বোঝা যায়, এর আগেও এই রথ চালাবার নানা ব্যবস্থা তিনি করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন।

মন্ত্রীকে অনুভব করতে হয়েছে, সংসার চালায় ঐ সমাজের অধঃপতিত 'ছোটলোক' মানুষরাই। শূদ্রদলপতিকে বলতে হয়েছে —

নিজ গুণেই চলে, তাই রক্ষে।

চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি

আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

যুগের পরিবর্তন মেনে নিতে দেরী হয় না তার। যোগ দেন শূদ্র দলে ; ধরেন রথের রশি। রক্ষা পাবার, মান বাঁচাবার পথ এটাই। তাছাড়া 'ওরাই, যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।'

নাটকের শুরুতে পুরোহিতকে দেখা যায় না। শুধু মেয়েদের কথোপকথনে জানতে পারি তাঁর উপস্থিতি। কিন্তু তা বড়ই করুণ ও বিবর্ণরূপ।

ঐ দেখ, পুরুতঠাকুর বিড় বিড় করছে ওখানে

মহাকালের পাণ্ডা বসে মাথায় হাত দিয়ে।

রথ চলছে না। পুরোহিতের মন্ত্র ও নিষেধ আজ নিষ্ফল। দেবতার ডানহাত যিনি, সহসা তাঁর এই ব্যর্থতা ও পতন বুঝি জনতা' কে সাহস জোগায় পুরোহিতকে অগ্রাহ্য করার।

'রথের রশি' তে সন্ন্যাসীর বারংবার ক্ষণিক উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনাধারার মাঝে মাঝে তিনি এসেছেন বিবেকের মতো; ভবিষ্যদ্বক্তার মতো। অচল রথের দিকে তাকিয়ে জনতা যখন বিহ্বল, সন্ন্যাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে আসন্ন অমঙ্গলের কথা।

সর্বনাশ এল।

বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী

ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

তিনি দেবতার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। যা সাধারণে জানে না ; তিনি জানেন। অলোকচারী তাঁর দৃষ্টি। জনতা তাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। 'রথের দড়ি' যে মানবপ্রীতির চিহ্ন, মনে রেখেই সন্ন্যাসী সৈনিকদের বলেন 'তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।' নাটকের শেষে তারই কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে 'মহাকালনাথের জয়'।

রবীন্দ্রসাহিত্যে 'কবি'র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ঃ ধ্বংস ও নির্মাণের মধ্যে তাঁর চলা। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবি বলেন —

বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন

বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন

— তারি সম্ভাষণ।

সৌন্দর্য ও আনন্দকে নির্মাণ ও সৃষ্টির ভার কবির ওপর।

'রথের রশি' নাটকের কবিও চান প্রথাভ্যাসের শৃঙ্খল ছিন্ন হোক ; দূর হোক মানুষে মানুষে অপ্রীতি, অসাম্য। পুরুত ঠাকুরের ঠাট্টার উত্তরে কবি জানিয়েছেন, রথ যদি ফের অচল হয় তো ডাকতে হবে কবিকেই। এগিয়ে যাবার পথ ও মন্ত্র জানেন কবিই।

লড়াই এর ছবিটা 'রথের রশি' নাটকে 'কবি'র চোখে ধরা পড়েছে এইভাবে —

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন

নইলে ছন্দ মেলে না। এদিকটা উঁচু

— হয়েছিল অতিশয় বেশি

ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটর দিকে, সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়টাকে

— দিলেন কাত করে।

সমান করে নিলেন আসনটা।

কবি নিজেও দাঁড়িয়েছেন এই ব্রাত্যদলে। কবির জয় বারে বারেই ঘোষিত হয়েছে এই নাটকে :

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর।

রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারেবারে।

কিন্তু কেন ? কারণ ছন্দ মেলাতেই কবির দরকার। চলার ছন্দ, জীবনের ছন্দ, আমরাই ভেঙে ফেলি বারংবার। সেই ছন্দপতনের অপরাধ যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তখনি 'তালকাটে'। রুদ্ধ হয় জীবনের গতি ও প্রগতি। সেই রুদ্ধদ্বার খোলার ভার কবির উপরে ন্যস্ত।

'রথের রশি'র জনগণ আক্ষরিকভাবে শূদ্রদলপতি ও তার দলবল। কিন্তু নাটকের পরিণতি যে ইঙ্গিত দেয়, তাতে দেখি দ্বিস্তর বিভক্ত 'জনতা' শেষপর্যন্ত এই 'জনগণ'-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। শ্রেণীসংগ্রাম বা ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ছাপিয়ে এক মহত্তর মানবতাবাদ এই নাটকে উচ্চারিত হয়েছে — যা রবীন্দ্র-নাটকের বৈশিষ্ট্য।

অচল রথ চালাবার দায়িত্ব নিয়ে নাটকের প্রায় শেষদৃশ্যে এসেছে শূদ্রদলপতি। অনাহূত সে। কিন্তু তার কথায় জানতে পারি, সে রবাহূত। বাবার ডাক পেয়েই দলবল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে রথ চালাতে। এতদিন তাদের ভূমিকা ছিল রথের চাকার পিষ্ট হওয়ার । কিন্তু রথের দেবতা এবার সেই বলি নিলেন না ; পরিবর্তে ডাক দিলেন পদদলিতদের। কারো হাতেই যখন রথ চলল না, তখন শূদ্রের হাতে রথ চলবে, জনতার কাছে তা অবিশ্বাস্য ঠেকছে। যারা এতদিন মাথা নীচু করেছিল তারাই পাবে 'কালের প্রসাদ' ; মানতে পারেনি জনতা। এত জপতপ, তুকতাক, ভক্তি নিবেদন সব কি ব্যর্থ হতে পারে ? প্রতিবাদ করেছে তারা। সৈনিকেরা তুলেছে তলোয়ার। পুরোহিত শাস্ত্র ও অভিশাপের ভয় দেখিয়েছেন, বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রাজমন্ত্রীর আদেশে শূদ্রদলই তুলে নিয়েছে রথের দড়ি। টান দিয়েছে 'জয় মহাকালনাথ'

বলে। রথ নড়ে উঠেছে। উড়েছে ওর কেতন। পথ বিপথ অগ্রাহ্য করে ছুটে চলেছে সেই রথ। — যেন মরানদীতে জোয়ার এসেছে। সেই রথের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে গেছে শাস্ত্রাচার ; জীর্ণ প্রথা ও অভ্যাস ; বহুকালের সঞ্চিত বঞ্চনা ও পাপ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে মানুষ দেখেছে সেই রথের চলা। অনেক দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে শেষে তারাও যোগ দিয়েছে রথযাত্রায়। নেমে এসেছে পথে। কর্মযোগে সকলের সঙ্গে এক হয়ে তবেই পেয়েছে তাদের দেবতাকে।

এই প্রথম এবং শেষ রবীন্দ্রনাটকে 'জনতা'র আত্মশক্তি বিষয়ে সচেতনতা দেখা গেল। সংসার চালাবার পুরো দায় তারা সাগ্রহে চেয়ে নিয়েছে। এর জন্য কারোর নেতৃত্ব বা নির্দেশের অপেক্ষা তারা করেনি। যে কারণে, চরের মুখে শূদ্রদলের আগমন জানতে পেরেও মন্ত্রী বিস্মিত হননি। বাধা দিতে চাননি। শুধু বলেছিলেন : ওরা পারবে। 'কবি'র ভাষ্যে আমরা জানতে পারি, অচল রথ চালাবার জন্য ব্যাকুল মেয়ের দল কিভাবে ভক্তি ও পুজোকে নষ্ট করেছে পথের ধুলোয়। রথের দেবতাকে তারা ভুলেই গিয়েছিল ফুল ও ধূপের ধোঁয়ায়। অস্বীকার করেছিল, সেই রথাসীন দেবতার প্রকৃত বাহনদের। তাই দেবতা হয়েছেন অপ্রসন্ন। যতদিন শূদ্রদল তথা, কর্মীরা নিজেদের 'রথের সর্বময় কর্তা' না ভাববে, ততদিন এই রথ চলবে অব্যাহত গতিতে। কিন্তু যেদিন এর ব্যত্যয় ঘটবে, সেদিন আসবে উল্টোরথের পালা। তবে আজ সে পালা শুরু হয়েছে, তার মূল্য অস্বীকার করা যাবে না।

'সবার পিছে, সবার নীচে' যারা ছিল, তারাই আজকের রথযাত্রার প্রধান মানী দল। মহাকালের মহাসন রক্ষার ভার তাদের উপরেই ন্যস্ত। নতুন যুগের বার্তাবহ তারাই।

৩০২.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রথের রশি' নাটিকায় 'সন্ন্যাসী' ও 'কবি'র গুরুত্ব বিচার করো।

২। 'রথের রশি' নাটিকায় নারী চরিত্রগুলির ভূমিকা নির্দেশ করো।

৩। 'রথের রশি' নাটকে সন্ন্যাসী ও কবি কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যানে কতটা ভূমিকা নিয়েছে—বিচার করো।

৪। 'রথের রশি' নাটকটিতে নারী চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৩০২.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ' — প্রমথনাথ বিশী

২। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা — অশোক সেন।

৩। রবীন্দ্রনাট্যপরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক — শঙ্খ ঘোষ।

৫। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক — কনক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক — মঞ্জুশ্রী চৌধুরী।

৭। রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা ঃ রূপক-সাংকেতিক — দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৮। রবীন্দ্রনাট্যকলাপ — তরুণ মুখোপাধ্যায়।

৯। বাংলা নাটকের ইতিহাস — অজিত কুমার ঘোষ।

১০। Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist by Edward Thompson.

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৫

সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি ও ঐতিহাসিকতা বিচার

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৫.১ : নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৩০২.২.৫.২ : সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি : সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধের কারণ

৩০২.২.৫.৩ : নাট্যকাহিনির ঐতিহাসিকতা বিচার

৩০২.২.৫.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.২.৫.১ : নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঊনবিংশ শতকে শৌখিন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলা নাট্যচর্চার শুভারম্ভ ঘটেছিল। তারপর ১৯৭২ সালে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় নাটক রচনা এবং অভিনয়ের প্রবল জোয়ার এল। গিরিশচন্দ্র অজস্র নাটক রচনা করে এবং অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন অভিনয় করে বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যাভিনয়কে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এই সময় একাধিক প্রতিভাধর অভিনেতা ও নাট্যকারের আবির্ভাবে বাংলা নাটক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মনমোহন বসু প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলা নাটক যখন নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলছে ঠিক তখনই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাট্যরচনায় ব্রতী হলেন।

১২৯৯ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে) বঙ্গাব্দে শচীন্দ্রনাথের জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের অন্যতম প্রধান নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথের কর্মজীবন তথা সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে নাট্যকার হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় শচীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তাঁর বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা। এই সময় তিনি সখারাম দেউস্কর, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং অধ্যাপকগণের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর কর্মে ও সৃষ্টিতে এই আদর্শের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশপ্রেমের আবেগময় প্রকাশ এই বিপ্লবী চেতনারই ফলশ্রুতি।

শচীন্দ্রনাথের নাটক রচনার কালসীমা প্রায় তিরিশ বছর (১৯২৯-৬০)। তাঁর নাট্যরচনার এই কাল সীমাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালের এবং পরবর্তীকালের নাট্যরচনার মধ্যে গুণগত পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়।

১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'রক্তকমল' প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় বাংলা নাট্য সাহিত্যে সমৃদ্ধ। শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সেই ধারাকেই পুষ্ট করেছে। রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, দর্শক প্রভৃতি সম্পর্কে নাট্যকারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সেই দিকে লক্ষ রেখেই তিনি নাটকের গঠনশৈলী নির্মাণ করেছেন। এইখানেই তাঁর নাটকের সাফল্যের চাবিকাঠি।

শচীন্দ্রনাথের নাটকের অন্যতম আকর্ষণ সংলাপ। আবেগধর্মী সংলাপ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাছাড়া নাটকীয় সংঘাতও কাহিনিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শচীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাছাড়া ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা তার নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'রক্তকমল' ছাড়াও 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকগুলির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এখান থেকেই শুরু হয় তার নাট্যকার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। এই সময় তিনি নাট্যকর্মী এবং নাট্য সংগঠক। এই সময় বামপন্থী মতাদর্শ নাট্যকারকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাম আদর্শের সাংস্কৃতিক শাখা আই.পি.টি. এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযেগ ঘটে। ফলে নাট্যকারের দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলিতে বাম চিন্তাদর্শ বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। শচীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে বহুল অংশে গণনাট্য সংঘের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই সময়ের নাটকে তাই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, বেদনা ব্যর্থতার কথা বড় হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদী কণ্ঠের তীব্রতা ও নাটকগুলিকে ভিন্নমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের অবক্ষয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব মূল্যবোধের বিনষ্টি, তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নৈরাজ্য বা হতাশা তাঁর নাটককে ভারাক্রান্ত করেনি। তবে এই পর্বের নাটকে তাত্ত্বিকতা যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং অনিবার্য ভাবেই সেটা ঘটেছে।

শচীন্দ্রনাথ শৌখিন নাট্যকার ছিলেন না। সমাজের এবং মানুষের আনন্দ বেদনা অবক্ষয় আর হতাশাকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন নাটকে। 'কালোটাকা' স্বাধীনতার সাধনা, 'এই স্বাধীনতা', "ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর" 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'জয়নাদ ও আর্তনাদ' প্রভৃতি নাটকে নাট্যকারের বিপ্লবী চিন্তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

দুঃখের বিষয় শচীন্দ্রনাথের প্রগতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাটকগুলির আলোচনা অগ্রতিকালে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু সম্প্রতিকালে যে গণচেতনা সমৃদ্ধ নাটকগুলি লেখা হচ্ছে, তার মূল প্রেরণার সন্ধান শচীন্দ্রনাথের নাটকে পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

৩০২.২.৫.২ : সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি

সিরাজদ্দৌল্লা ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধের কারণ —

সুবে বাঙালার নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিবাদ এবং সংঘর্ষের বৃত্তান্ত বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অন্যদিকে আবার ইংলন্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসেও এই ঘটনার গুরুত্ব কম নয়। আর সেই কারণেই ভারতীয় এবং বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা

এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রথম থেকেই। সমকালীন লেখকদের মধ্যে গোলাম হোসেন ও রবার্ট অর্ম এবং পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের মধ্যে এম. সি হিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ সম্পর্কে সম্প্রতিকালে একাধিক ঐতিহাসিক নতুন করে গবেষণা করেছেন প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য। এদের মধ্যে পিটার মার্শাল, ক্রিস, বেইলী, ব্রিজেন গুপ্ত, সুশীল চৌধুরী, রজতকান্ত রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আলোচ্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে এই পর্বের ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের হাতে এসেছে।

কোম্পানির সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ প্রসঙ্গে রজতকান্ত রায় যথার্থই লিখেছেন, কোম্পানির সঙ্গে নবাবের বিরোধ একদিনের নয়। ১৬৫৬ সালে সুবেদার সুজা বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে কোম্পানিকে বহির্বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির বাড়বাড়ন্তের ফলে মুঘলদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। তাই বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কোম্পানির সুযোগ সুবিধা নাকচ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ আগের চুক্তির সুযোগ সুবিধা বহাল রেখে ফর্মান দিলেন (১৭১৭) । এর মধ্যেই ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করে ফেলেছিল (১৭১৬)। ১৭১৭ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের উদ্ধত কার্যকলাপের বিষয়টি নবাবকে বিচলিত করে তুলেছিল। ইংরেজরা বিপুল বিক্রমে সশস্ত্র বরকন্দাজ নিয়ে বাণিজ্য করে চলেছিল। শুধু তাই নয় দস্তকের অপব্যবহার করে কোম্পানির দেশি ও বিলাতি কর্মচারীরা নিজেদের পণ্যদ্রব্যাদি বিনা শুল্কে চালান করত। নবাব সরকারকে খাজনা দিতে ইংরেজদের ঘোরতর অনিচ্ছা ছিল। তাছাড়া নবাবের এলাকায় বাস করে ইংরেজরা চন্দননগরের ফরাসী বণিকদের উপর মারমুখী ভাব দেখাত। ইংরেজের এই বাড়াবাড়ি লক্ষ করে সুজাউদ্দিন খান থেকে আলিবর্দি পর্যন্ত সকলেই চিন্তিত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবে এই দুই নবাব ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ ভারত থেকে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব যাতে বাঙলায় ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য আলিবর্দি উভয় পক্ষকে সামরিক শক্তি বাড়াতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছু আগেই ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গসংস্কার এবং সেটির দুর্ভেদীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। আলিবর্দির মৃত্যুর পর (এপ্রিল ১৭৫৬) মসনদে বসলেন তাঁর দৌহিত্র সিরাজ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আলিবর্দির অপর দৌহিত্র শওকৎ জঙ্গ। ঘসেটি বেগম ছিলেন এই দুইজনেরই মাসী। তিনি শওকতের পক্ষ নিলেন। মসনদঘটিত এই বিবাদের প্রতি ইংরেজরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। তাদের ধারণা ছিল শওকৎ শেষপর্যন্ত জয়ী হবেন। তারা ফরাসীদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ বাড়তেই লাগল।

সিরাজ মসনদে বসার পরে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইংরেজরা নবাবকে কোনো নজরানা পাঠায়নি। এমনকি একবার কাশিমবাজারে তাদের এলাকায় ইংরেজরা সিরাজকে প্রবেশ করতেও দেয়নি। বলা বাহুল্য ইংরেজদের এই আচরণ নবাবের ভালো লাগেনি।

তবু এটিই যে সিরাজ-ইংরেজ বিরোধের একমাত্র কারণ সেটা ভাবলে ভুল করা হবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের তিনটি অভিযোগ ছিল—

প্রথমতঃ ইংরেজরা নবাবের অপরাধী প্রজাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সিরাজের শত্রু ঘসেটি বেগমের ডানহাত ছিলেন ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ সেন। সিরাজ তাঁকে বরখাস্ত করে মুর্শিদাবাদে নজরবন্দি করে রাখেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সপরিবারে ধনরত্নসহ ইংরেজের আশ্রয় নেন (১৭৫৬)। এই ঘটনায় ক্ষুদ্ধ সিরাজ নবাব হয়ে ঘসেটি বেগমকে গৃহবন্দিনী করেন। ইংরেজকে পলাতক কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেন। কিন্তু কলকাতার গর্ভনর ড্রেক এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। ফলে সিরাজের ক্ষোভ বাড়ল। তাঁর ধারণা হল ইংরেজের সঙ্গে ঘসেটি বেগম এবং শওকৎ জঙ্গের গোপন যোগ আছে।

নবাবের দ্বিতীয় অভিযোগ দস্তকের ব্যবহার নিয়ে। সিরাজের পূর্বসূরীরাও এ ব্যাপারে ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে শুল্কের রেহাই পাওয়ার জন্য দস্তক বা ছাড়পত্র ব্যবহার করতেন। তাছাড়া ইংরেজদের বহির্বাণিজ্য ছিল শুল্কমুক্ত অন্তর্বাণিজ্য নয়। কিন্তু অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দস্তক ব্যবহার করে তাঁরা শুল্ক ফাঁকি দিতেন। এর ফলে নবাব তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

তৃতীয়তঃ কলকাতার দুর্গসংস্কার এবং সুরক্ষার ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে নবাবের সঙ্গে ইংরেজের প্রত্যক্ষ সংর্ঘষ শুরু হল।

কলকাতায় ইংরেজরা চন্দননগরের ফরাসীদের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাদ ও লড়াই-এর সম্ভাবনায় নবাবের অনুমতি না নিয়েই দুর্গ সুরক্ষিত করবার কাজ শুরু করে দেয়। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নবাব দুপক্ষকেই এ জাতীয় বেআইনী কাজ করতে নিষেধ করেন। ফরাসীরা নবাবের আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা নবাবের নির্দেশে কর্নপাত করল না। সিরাজ ঘসেটি বেগমকে গৃহবন্দিনী করার পর শওকৎকে দমন করবার জন্য পূর্ণিয়ার দিকে পা বাড়ালেন। এই সময় পথে গভর্নর ড্রেকের লেখা একখানি দুর্বিনীত চিঠি পেলেন নবাব। চিঠি পড়ে নবাব বুঝলেন দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করার আদেশ ইংরেজরা মানবেন না। এই পরিস্থিতিতে শত্তকৎকে দমন করার চিন্তা স্থগিত রেখে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তাদের কাশিম বাজার কুঠি এবং কলকাতার দুর্গ সহজেই নবাবের অধিকারভুক্ত হল (জুন ১৭৫৬)। বিতাড়িত ইংরেজরা ফলতায় আশ্রয় নিল। হলওয়েলের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই সময়েই কলকাতায় কুখ্যাত অন্ধকূপ হত্যা ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই চেন্নাই থেকে ক্লাইভ এবং ওয়াটসন এলেন এবং কলকাতার দুর্গ পুনরাধিকার করলেন (জানুয়ারী ১৭৫৬)। সেই সঙ্গে হুগলী লুণ্ঠন করলেন। স্বাভাবিক কারণেই ভয় পেয়ে নবাব আলিনগরের সন্ধি করে (ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭) শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। ইংরেজরা তাদের সমস্ত অধিকার ফিরে পেল। এর মধ্যে শত্তকৎ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হওয়ায় সিরাজ নিষ্কন্টক হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক এস.সি. হিল উল্লিখিত তিনটি অভিযোগকে ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য নবাবের মিথ্যা ছলনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। হিল সাহেবের মত হল, সিরাজের দম্ভ এবং অর্থলিপ্সাই ছিল এই সংঘর্ষের মূল কারণ। বলা বাহুল্য হিলের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি এ ক্ষেত্রে সিরাজের প্রতি সুবিচার করেননি।

আলিনগরের সন্ধির পর ভিন্ন কারণে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের আবার বিবাদ এবং সংঘর্ষ শুরু হল। এই সন্ধির আগেই ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। (সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ)। ইংরেজরা চেয়েছিল বাঙলা থেকে ফরাসীদের উৎখাত করতে, যাতে তাদের বাণিজ্যিক সুবিধা হয়। তাছাড়া ইংরেজরা

জানত নবাবও তাদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের ব্যবহার করতে পারবেন না। অতএব ক্লাইভ চন্দননগর দখল করে (১৭৫৭ মার্চ) ফরাসীদের বিতাড়িত করলেন। নবাব এই পরিস্থিতিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন না বটে তবে বিতাড়িত ফরাসীদের তিনি আশ্রয় দিলেন। এদিকে ইংরেজদের শক্তি দিনে দিনেই বাড়তে লাগল। ফলে নবাব পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। তিনি ইংরেজদের চাপে ফরাসীদের চলে যেতে বাধ্য করলেন। কিন্তু এতেও ইংরেজদের প্রতি মনোভাব পাল্টাল না সিরাজের। তিনি ফরাসী সেনাপতি বুসীর সাহায্য চেয়ে চিঠি দিলেন। এই ঘটনায় ইংরেজদের চিন্তা ভিন্ন দিকে মোড় নিল। তারা চাইল বাংলা থেকে ফরাসীদের তাড়ানোর পর তাদের বন্ধুভাবাপন্ন কাউকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে। অন্য দিকে মুর্শিদাবাদে একদল রাজপুরুষ এবং বণিক ঠিক একই রকম চিন্তাভাবনা করছিলেন। দেশী-বিদেশী এই সব ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে গোপন বৈঠক হল (১৭৫৭ এপ্রিল-মে)। বৈঠকে ব্যাপারটি পাকা হল যে সিরাজকে গদিচ্যুত করে তাঁর স্থলে মীরজাফর হবেন বাংলার নবাব। এ বিষয়ে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে গোপন চুক্তিও সেরে ফেললেন (১৭৫৭, ৫ জুন)। পরিস্থিতি অনুকূল বিবেচনায় ইংরেজরা কালবিলম্ব না করে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল। পলাশীর প্রান্তরে দুই পক্ষ মুখোমুখি হল। শুরু হল বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। মীরজাফর, রায়দুর্লভ এবং ইয়ারলতিক খান এই তিন ষড়যন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭-২৩ জুন) নবাবের পরাজয় ঘটল। এরপর সিরাজ ধরা পড়লেন এবং তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হল।

৩০২.২.৫.৩ : নাট্যকাহিনির ঐতিহাসিকতা বিচার

ইতিহাসের 'তথ্য' এবং কল্পনার 'সত্য'র সার্থক মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক নাটক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাই ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়। ইতিহাসের উপাদান এবং বিষয়বস্তুকে কল্পনার রসে জারিত করে রচিত হয় ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু ইতিহাসের তথ্যের প্রতি অবশ্যই নাট্যকারকে সত্যনিষ্ঠ থাকতে হয়। ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ঘটনাকে বিকৃত করবার অধিকার নাট্যকারের নেই। ইতিহাসের ঘটনার শোভাযাত্রায় কেবল বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিই স্থান পায়, প্রাধান্য পায়। কিন্তু ইতিহাসের কোনো একটি পর্বের উত্থান পতনের বিরাট আলোড়নে হারিয়ে যায় অনেক ছোট ঘটনা, উপেক্ষিত হয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মানব হৃদয়ের অনেক অকথিত বেদনা। ঐতিহাসিক নাটক নাট্যকার সেই অকথিত আনন্দ বেদনার ভাষ্যরচনা করে থাকেন। আর এই কাজে যুগমানসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টির অধিকার নাট্যকারের আছে। নাটকে এই কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনাগুলি যতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততই নাটকের সার্থকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসখানির ঐতিহাসিকতা বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস ও নাটকের মূল সত্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উপন্যাসখানি প্রসঙ্গে তিনি 'ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র' করে তোলার আশ্চর্য নিপুনতার কথা বলেছেন, ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ রেখে ঐতিহাসিক নাটকে 'মানব জীবনের মহিমা' তুলে ধরাই হবে নাট্যকারের লক্ষ। ইতিহাসের সত্য বিশেষ জাতির পক্ষে বিশেষকালের সত্য কিন্তু মানব জীবনের সত্য চিরকালের। এই সত্য দেশ ও কালকে অতিক্রম করে যায়। তাই ইতিহাসের সত্য আর জীবনের সত্য ভিন্ন উপলব্ধির বিষয়। জীবনের সত্য কাব্যের সত্য এবং রসগত সত্য।

ইতিহাসের সত্য বহু চর্চার ফলে জীর্ণ, মতভেদে কন্টকাকীর্ণ। কিন্তু জীবনের সত্য, রসের সত্য চিরন্তন, চিরায়ত। ঐতিহাসিক নাটক দর্শককে যে রসানুভূতি দেয় রবীন্দ্রনাথ তাকেই 'ইতিহাস রস' বলেছেন। ইতিহাসের অধিকজন গ্রাহ্য তথ্যের ভিত্তিভূমিতে মানব জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং অনিবার্য পরিণতিকে রূপ দেওয়াই ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের যে অধ্যায় বা কালপর্বকে নাট্যরূপ দেওয়া হয় তার কালসঙ্গতি সম্পর্কে নাট্যকারকে অবশ্যই অবহিত থাকতে হয়। নচেৎ কালানৌচিত (Anachronism) দোষ ঘটতে পারে।

পৃথিবীর প্রখ্যাত নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই সার্থক ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নাটক যেহেতু দ্বন্দ্বময় জীবনের ইতিবৃত, সেহেতু নাট্যকারগণ নাটকীয় সংঘাত ও দ্বন্দ্বসৃষ্টির জন্য ইতিহাসের বিশেষ ঘটনাকে নির্বাচন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐতিহাসিক নাটক ঘটনা প্রধান বা ব্যক্তিপ্রধান হতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' ঘটনানির্ভর ঐতিহাসিক নাটক। অন্যদিকে 'সাহাজান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান', ব্যক্তিপ্রধান বা চরিত্র প্রধান নাটক। গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' চরিত্রপ্রধান নাটক।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' চরিত্র প্রধান ঐতিহাসিক নাটক। বাংলা নাটকের সূচনাপর্ব থেকেই ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়ে আসছে। মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে ঐতিহাসিক নাটক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছিল। এই সময় 'প্রতাপাদিত্য', 'শিবাজী', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে পরাধীন ভারতের মুক্তি আকাঙ্খার প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে লেখা হয়েছে একাধিক নাটক। তাই এই সময়ের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকই স্বদেশিকতার প্রেরণা সঞ্চারি। এই কালোচিত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রেখেই নাটকগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার করতে হবে।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে একাধিক নাটক লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সবার আগে মনে পড়ে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির নাম। তৎকালীন ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান নির্ভর তথ্যাদি নির্ভর করেই গিরিশচন্দ্র নাটকখানি লেখেন। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র সিরাজকে স্বদেশপ্রেমিক, প্রজাবৎসল ও জননায়ক রূপে চিত্রিত করেন।

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক গবেষণায় সিরাজ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে। সিরাজ সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের মতে—

(ক) সিরাজ দুশ্চরিত্র মদ্যপ এবং লম্পট ছিলেন।

(খ) রাজ্য শাসনে তাঁর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল না।

(গ) স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো পরিচয় সিরাজ চরিত্রে ছিল না। কারণ স্বদেশ প্রেমের উপলব্ধির উদ্ভব ঊনবিংশ শতকেই ঘটেছিল তার আগে নয়।

যাই হোক গিরিশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথ উভয়েই সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালের কয়েকটি প্রধান ঘটনা এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডিকে ভিত্তি করেই তাঁদের নাটক লিখেছেন। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি আনুগত্য গিরিশচন্দ্রের যতটা, শচীন্দ্রনাথের ততটা নয়।

শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি সংক্ষিপ্ত এবং সংহত। সে তুলনায় গিরিশচন্দ্রের নাটকখানির বিস্তৃতি অনেক বেশি। মাত্র তিনটি অঙ্কেই নাটকখানি শেষ করেছেন শচীন্দ্রনাথ। সেইজন্য ঘটনাও বাহুল্য বর্জিত। নাট্যকার ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যেই কাহিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। গিরিশচন্দ্রের মতো তিনিও লিখিল নাথ রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রের সিরাজ সম্পর্কে অনুসন্ধাকেই নাটকীয় উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইতিহাসের কাহিনি অনুসরণ করেই নাটকের ঘটনা বিন্যাস করেছেন শচীন্দ্রনাথ। নাটকের সূচনাতেই দেখা যাচ্ছে রাজ্যের প্রধানগণ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের সাবধানবাণীর মধ্যে দিয়েই নাট্যকার সেটা জানিয়েছেন। এই ষড়যন্ত্র যে ঐতিহাসিক সত্য তাতে সন্দেহ নেই (এ বিষয়ে 'সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধের কারণ' অংশে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। ইতিহাসের জটিল এবং বিতর্কিত ঘটনাবর্তের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেননি। সূত্রাকারে ঘটনাগুলি চরিত্রের মুখে ব্যক্ত হয়েছে। নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিরাজকে স্বদেশপ্রেমের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তবে সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতা ও অপবাদগুলি নাট্যকার উপেক্ষা করেননি। সিরাজের সংলাপের মধ্যে সেটিকে প্রকাশ করেছেন ঠিক তেমনি সুকৌশলে সেগুলিকে খণ্ডনও করেছেন। সিরাজের সংলাপ থেকে জানা যায় সিংহাসনলাভের পূর্বে তাঁর জীবনে যে উশৃঙ্খলতা ও ভোগপ্রবৃত্তি ছিল সিংহাসনলাভের পর তার পরিবর্তন ঘটেছে এটিই নাট্যকারের বক্তব্য। তাই তাঁর সংলাপে নারী সম্পর্কে একটি দার্শনিক উপলব্ধির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সিরাজ—"প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় নারী চেয়েছি ও পেয়েছি। নারীকে তখন দেখেছি শুধু ভোগের সামগ্রীর মতো। আর সে উদ্মাদনা নেই। আজ নারীর কাছে আমার নানা দাবী। রাজ্য যা দিতে পারে না। প্রভুত্ব যা দিতে পারে না, পরাক্রম যা দিতে পারে না, অথচ যা না পেলে জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে যায়, তাই আমি চাই নারীর কাছে।' (২/২)

পরিবর্তিত সিরাজকেই শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের নায়ক করেছেন, তার কারণ ঐতিহাসিক সিরাজ চরিত্র নাট্যকারের লক্ষবস্তু নয়, দেশপ্রেমিক সিরাজকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন দেশ প্রেমের উদাত্তবাণী প্রচারের জন্য।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানিকে পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক রূপে উপস্থিত করার পরিকল্পনা শচীন্দ্রনাথের ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন দেশপ্রেম উত্তপ্ত একখানি নাটক রচনা করতে। তাই ইতিহাসের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য দেখবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। তাছাড়া ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে নাট্যকারের ধারণাটিও তাঁর কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে তিনি বলেছেন—

'ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি, নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। এই জন্যই যে ঘটনা নয়, ঘটনাটি ঘটাবার কারণই নাট্যকারের বিষয়বস্তু।'

শচীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ঘটনা থেকে ইতিহাস চেতনার উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। আর সেই জন্যই ইতিহাসের ঘটনাস্তুপের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি।

কিন্তু এটাও অবশ্য লক্ষণীয় ইতিহাসকেও তিনি কোথাও বিকৃত করেননি। চরিত্র চিত্রণেও আছে ইতিহাসের আনুগত্য। সিরাজের বিরুদ্ধে স্বদেশ ও বিদেশের কিছু মানুষের ষড়যন্ত্র ইতিহাস স্বীকৃত। ঘসেটি বেগমের চরিত্র ও কর্মকাণ্ড অবশ্য ইতিহাস স্বীকৃত। কাহিনি বিন্যাস ও নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য একাধিক অনৈতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। আলেয়া এবং গোলাম হোসেন চরিত্র দুটি নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সিরাজের পতন এবং পরিণাম ইতিহাসসম্মত (দানসা সিরাজকে ধরিয়ে দেয় এর মীবনের আদেশে মহম্মদী বেগ তাঁকে হত্যা করে)। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা নাটকখানিকে ঐতিহাসিক নাটক বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধার কোনো কারণ নেই।

৩০২.২.৫.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ চরিত্রে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মসমালোচনা লক্ষ করা যায় কিনা বিচার করো।

২। ঐতিহাসিক নাটকের লক্ষণগুলি 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে কতখানি বর্তমান তা বিচার করো।

৩। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির ঐতিহাসিকতা বিচার করো।

৪। সমগ্র জাতির ট্রাজিক পরিণতির প্রতীক হিসেবে সিরাজ চরিত্রটির সার্থকতা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চিত্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নির্দেশ করো।

———————

একক - ৬

ট্রাজেডি প্রসঙ্গ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৬.১ : সংলাপ

৩০২.২.৬.২ : ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গ

৩০২.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.২.৬.১ : সংলাপ

নাটকের গুণাগুণ উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে সংলাপের মধ্যেই নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত থাকে। নাটক তন্ময় (objective) শিল্পপ্রকরণ। সেজন্য অন্তরালবর্তী নাট্যকারের বক্তব্য চরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়েই উপস্থাপিত হয়। চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপনার এবং পরিস্ফূটনের ক্ষেত্রেও সংলাপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংলাপ রচনার সময় অবশ্যই সচেতন থাকতে হয়। সংলাপ যেন চরিত্র, ঘটনা এবং চরিত্র বিকাশের সহায়ক হয়। সংলাপের মধ্যে দিয়েই চরিত্রের যথার্থ উন্মোচন ঘটে।

তিরিশের দশকে শচীন্দ্রনাথ যখন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি লেখেন তখন বাংলা নাটকের সংলাপ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলা গদ্যও যথেষ্ট সাবলীল এবং নমনীয় হয়েছে। প্রতিভাধর নাট্যকারগণ সে সুযোগ গ্রহণ করে নাট্যসংলাপকে শিল্পীত করে তুলেছেন প্রয়োজন মত। গিরিশচন্দ্র নাট্যসংলাপের একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। সেটি বহুলাংশে পরিস্ফূট এবং শিল্পরূপ লাভ করেছে দ্বিজেন্দ্রলালে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত আছে আশ্চর্য আবেগধর্মী সংলাপের মধ্যে।

নাট্যসংলাপের এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে সংলাপ রচনা করেছেন। শচীন্দ্রনাথের পূর্বে গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলার করুণ জীবনালেখ্য নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু নাট্য সংলাপে গিরিশচন্দ্রের সাফল্য কোনোদিনই প্রশ্নাতীত ছিল না। আবেগ উচ্ছ্বাসের তীব্র স্রোতে ভেসে গিয়েছে তাঁর সংলাপ। অতি আবেগধর্মী সংলাপ অনেক সময় নাটকীয় রস সৃষ্টির বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপও উচ্ছ্বাসধর্মী আবেগ প্রধান। আর ভাবাবেগ প্লাবিত সংলাপই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য সাফল্যের চাবিকাঠি। এই জাতীয় সংলাপ দর্শকের মনে একটি তাৎক্ষণিক আবেদন এনে দেয় বটে কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই নাটকের স্বাভাবিক গতিধারা ও সংহতিকে ব্যাহত করে।

শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ তার কাব্যগন্ধী মর্মস্পর্শী সংলাপ একসময় এই নাটকের সংলাপগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। দর্শকমনে আবেগ ও উন্মাদনা সৃষ্টিতে

নাট্যকার যে যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। গিরিশচন্দ্রের উচ্ছ্বাসবহুল সংলাপের সঙ্গে তুলনা করলে শচীন্দ্রনাথের সংলাপগুলি অনেক বেশি চরিত্রানুগ এবং মর্মস্পর্শী বলেই মনে হয়। স্বাদেশিকতার আবেগ সঞ্চারিত করবার পক্ষে এই সংলাপ যে যথেষ্ট অনুকূল ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

গিরিশচন্দ্র তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটকে একাধিক স্থানে 'গৈরিশ ছন্দ' ব্যবহার করেছেন। এমনকি নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিরাজের স্বগতোক্তিও লেখা হয়েছে গৈরিশ ছন্দে। শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে কোথাও ছন্দ-সংলাপ ব্যবহার করেননি।

নাটকের সূচনা থেকেই নাট্যকার দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য সংলাপে সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সিরাজ নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই রাজ্যলাভ নিষ্কন্টক ছিল না। একদিকে বিদেশী ইংরেজদের ঔদ্ধত্য দিনে দিনেই বেড়ে চলেছিল অন্যদিকে তাঁর ঘনিষ্ট আমত্যবর্গ, আত্মীয়জন একটি ষড়যন্ত্রে জাল বিস্তার করতে তৎপর হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজের আত্মকথন মূলক আবেগময় সংলাপ দর্শকের মনে ভাবাবেগ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। নবাব বলেছেন—

সিরাজ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি। তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব। ইউরোপীয় বণিকদের উদ্ধত ব্যবহার আমি সহ্য করব না। তোমার রাজ্যে আমি তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেব না।

এই সংলাপটুকুতে একদিকে যেমন সিরাজের আত্মপ্রত্যয় ঘোষিত অন্যদিকে তেমনি তাঁর অনাগত সংঘাতময় দিনগুলির বিপদ সংকেত ঘোষিত হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সংলাপে আবেগ বা হৃদয়ানুভবের কোনো চিহ্ন নেই। শচীন্দ্রনাথ 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি রচনা করেছিলেন একটি বিশেষ যুগানুভবকে উদ্বুদ্ধ করতে। আর সেই তিনি সিরাজদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাটকে। সিরাজদ্দৌলার সংলাপে তাই দেশপ্রেমের তপ্ত অনুভূতি। গোলাম হোসেনকে তিনি বলেছেন—

"গোলাম হোসেন বাঙলাকে তোমাদের মতো আমি তো ভালোবাসিনি। তবু আজ নিজের সব দুঃখ দুর্দশা ছাপিয়েও বাঙলার কথাই কেবল বারবার মনে পড়ে কেন? বাংলা কি আমাকে ভালো বেসেছিল গোলাম হোসেন?"

ইংরেজের বন্দিশালায় সিরাজের সংলাপগুলি বাঙালির হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করে যায়। মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিরাজ একবার শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন বাংলা আর বাঙালিকে বিদেশী বণিকদের আর ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে। তাই অপমানে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সাধারণ মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মর্মমাথিত ব্যাকুলতায় সিরাজ বলেছেন—

'তাই যদি সত্য জানো। সত্যই যদি বুঝে থাকো তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, তাহলে এস ভাই সব, এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি, পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গজননীর কনককীরিটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কিনা?'

মৃত্যুর পূর্বে সিরাজের সংলাপটি হৃদয় বিদারক। এই দৃশ্যে সিরাজের বেদনার সমব্যথী হয়ে যায় দর্শকরা। আর সেইসঙ্গে সিরাজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল আর গৌরবময় হয়ে ওঠে। মহম্মদী বেগের ছুরিকাঘাতের

পর—"দিলে না। শেষ চেষ্টা ওরা করতে দিলে না। বাঁচতে দিলে না আমাকে। কাউকে অভিশাপ দেব না। সুখে থাক ভাই সব। বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক।"

গোলাম হোসেনের দ্ব্যর্থব্যঞ্জক সংলাপগুলি নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। বিদেশী চরিত্রগুলির সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। সাধারণত বিদেশী চরিত্রেই মুখে ভাঙা বাংলা এবং হিন্দি শব্দ মিলিয়ে খিচুড়ি সংলাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শচীন্দ্রনাথ তুলনামূলকভাবে খুব কমই ভাঙা বাংলা ব্যবহার করেছেন। সাহেবদের মুখে কোথাও কোথাও হিন্দি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অবশ্য।

যেমন —

ওয়াটস — 'আপনারা বিচারে ভুল করেন। আপনারা.....বহুত দূর কি আছে দেখিতে পান না। আপনারা সকলেই নবাব হইতে চাহেন, ভাবিয়া দেখেন না that there is only one throne in Bengal সিংহাসন আছে এক। রাজবল্লভ উহাতে বসিবেন ও জাফর আলি গলা কাটিবেন। জাফর আলি নবাব হইলে শেঠরাজা গোঁসা হইলেন।'

সামাগ্রিক ভাবে বলতে গেলে সংক্ষিপ্ততা ঋজুতা ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে আবেগময়তার মেলবন্ধনে শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা নাটকটির সংলাপ একটি বিশেষ আদর্শ স্থাপন করেছে।

৩০২.২.৬.২ : ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা এবং রসনিষ্পতি বিষয়ে এতাবৎ বহু বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। নাট্যতত্ত্ববিদ্ অ্যারিস্টটলের নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুসরণ করে পরবর্তী নাট্য সমালোচক অগ্রসর হয়েছেন। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিরুপণ করে বলেছেন- "The imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete, in itself" আলোচনা মূলক নয়, নাট্যরূপেই ট্যাজেডির যথার্থ পরিচয়। ট্যাজেডি দর্শকের মনে "incidents arousing pity and fear" (ঘটনাগুলি ভয় ও করুণার সঞ্চার করে)। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল 'Catharsis' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার প্রকৃত তাৎপর্য হল Purgation বা 'Pugification'। অর্থাৎ আমাদের মনে জমে থাকা অনুভবের শুদ্ধিকরণ বা মোক্ষণ। এই বিশেষ চিত বৃত্তির অনুভব সঞ্চারের জন্য নায়ককে হতে হবে সাধারণ মানুষ থেকে উঁচু স্তরের মানুষ। যার পতনের ফলে দর্শকের মনে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার হবে। নায়কের পতন একাধিক কারণে হতে পাবে। কোথাও নায়কের পতন ঘটে নিয়তির নিষ্ঠুর অঙ্গুলি হেলনে (গ্রীক ট্যাজেডি) আবার কোথাও নায়কের পতনের বীজ নিহিত থাকে তার চরিত্রের মধ্যেই (শেক্সপীরিয়ান ট্রাজেডি)। কখনো ভাগ্যই হবে চরিত্রের পরিণতি আবার কখনো চরিত্রই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে। গ্রীক ট্রাজেডি এবং শেক্সপীরীয় ট্রাজেডি চিন্তার মৌলিক পার্থক্য এখানেই। ট্রাজেডির দুঃখান্তক পরিণাম দর্শক চিত্তে করুণার সঞ্চার করলেও এই কৃত্রিম বেদনাবোধের মধ্যে দিয়ে চিত্তের শুদ্ধিকরণ বা মোক্ষণ ঘটে। তাই ট্র্যাজেডি বেদনাদায়ক পরিণাম দর্শকের চিত্তে আনন্দ দেয়। গ্রীক এবং শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডিগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনাটিকে নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন। নাটকটিতে সিরাজের মর্মান্তিক ভাগ্য বিপর্যয়ের

বেদনাময় কাহিনি নাটকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। নাটক সিরাজদ্দৌলা নায়ক। সিরাজদ্দৌলা ব্যক্তি-ট্র্যাজিডে নির্ভর নাটক।

নবাব সিরাজদ্দৌলা সামাজিক বিচারে উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু নাটকে সিরাজকে কেবল নবাব হিসেবেই দেখানো হয়নি। নাটকে সিরাজ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীন বাংলার শেষ প্রতিনিধি। সিরাজচরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার ঐতিহাসিক তথ্যের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ইতিহাস বলে, সিরাজ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী, লম্পট এবং স্বেচ্ছাচারী নবাব। এই চারিত্রিক দুর্বলতাই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই সিরাজের চরিত্রের এই কলঙ্কময় দিকটিকে উপেক্ষা করেছেন। এই নাটকে সিরাজ লম্পট, অত্যাচারী সিরাজ নন, তিনি দেশপ্রেমিক মহৎ-হৃদয় ব্যক্তিত্ব। সুতরাং সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয় অনিবার্য ভাবেই দর্শকের মনে ট্র্যাজেডির বেদনা সঞ্চার করে।

নাটকটির ঘটনা এবং ঐতিহাসিক পটভূমি অবশ্যই ট্র্যাজিক রসসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরিবেশ ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। বাঙলার সিংহাসনকে ঘিরে অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতার বিষবাস্প এক পাপচক্রের সৃষ্টি করেছিল। এই ভয়ঙ্কর শ্বাসরুদ্ধকারী পরিবেশে, নবাব একা সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সিরাজ মর্মস্পর্শী ভাষায় দেশকে ইংরেজের দুষ্ট অভিসন্ধি থেকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে বলেছেন— 'ইউরোপীয় বণিকদের উদ্ধত ব্যবহার আমি সহ্য করব না। ....আমি বেঁচে থাকতে তোমার রাজ্যে তারা দুর্গ তৈরী করতে পারবে না। সৈন্য সমাবেশে সক্ষম হবে না।' (১/১)

সিরাজের বিরুদ্ধে তখন ষড়যন্ত্রের জাল জটিল ও বিস্তৃত হয়েছে। একদিকে ঘসেটি বেগম, সৌকত জঙ্গ আর অন্যদিকে মীরজাফর, রায়দুর্লভ। জগৎশেঠের দল সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি ও জাতির জীবনের এই চরম বিপদের দিনে নবাবের পাশে একমাত্র আলেয়া আর গোলাম হোসেন। আলেয়া প্রতি নিয়ত ইংরেজ এবং নবাবের তথাকথিত আস্থাভাজন মানুষের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে জানিয়েছে।

নবাবের এই অসহায়তা এবং তাঁর স্বদেশ রক্ষা ব্যাকুলতা দর্শকে মনে তাঁর প্রতি গভীর মমত্ববোধের সৃষ্টি করেছে।

সিরাজের চারিত্রিক দুর্বলতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা রাজা রাজবল্লভ বলেছেন—

'রানী ভবানীর কন্যার প্রতি আসক্তির কথা এমন কৌশলে প্রচার করেছে যে বাঙলার সমগ্র হিন্দু জমিদারেরা, হিন্দু প্রজারা সমস্ত মন দিয়ে সিরাজের ধ্বংস কামনা করছে।'

নাট্যকার সিরাজকে সর্বগুণযুক্ত নায়ক হিসেবে চিত্রিত করেননি। সিরাজের চরিত্রের দোষত্রুটি গুলিতে সচেতন ভাবে খণ্ডন করেছেন তিনি। নায়ক হিসেবে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন নাট্যকার। সিরাজের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি নিছক 'লোকপবাদ' বলেই গুরুত্বহীন করেছেন নাট্যকার, অন্যদিকে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত সিরাজ চরিত্রটিকে একটি সুউন্নত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তার ফলে নায়কের মর্মান্তিক পরিণতি দর্শকের মনে করুণা ও ভয়ের অনুভূতি এনে দেয়। চারিদিকের প্রতিকূলতার সঙ্গে সিরাজের একক সংগ্রাম এবং তাঁর অসহায় অবস্থা নাটকে একটি সহানুভূতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। গোলাম হোসেন এবং আলেয়ার সাবধানবানী সত্ত্বেও সিরাজ অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। এ যেন নিয়তির নিষ্ঠুর অঙ্গুলি নির্দেশ। গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যের কথাই এখানে মনে করিয়ে দেয়। সিরাজ চরিত্রে সক্রিয়তার অভাব ছিল না। ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের জাল তিনি ছিন্ন করেছেন। কাশিমবাজার কুঠিতে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রীদের গোপন পরামর্শ বানচাল করে দিয়েছেন। আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করার জন্য ইংরেজ দূতকে কঠোর তিরস্কার করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। কিন্তু যথেষ্ট সক্রিয়তা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। নায়ক চরিত্রের দুর্বলতাই শেষপর্যন্ত তাঁর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সারল্য এবং নির্বিচারে স্বজন পরিজনকে বিশ্বাস করাই সিরাজের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক জেনেও তাঁর হাতেই যুদ্ধের দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন তিনি। আলেয়াকে নবাব বলেছেন—

'মীরজাফরকে তুমি জাননা, কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছেন, আর কখনো আমার বিরুদ্ধাচারণ করবেন না।'

যুদ্ধে জয় যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠিক তখনই মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন নবাব।

সিরাজ — 'আমি আর ভাবতে পারছি না। সিপাহসালার আপনিই আমার ভরসাস্থল। যা ভালো বোঝেন, আপনি করুন।'

সিরাজের বিচারহীন সরলতাই তাঁর পতনের কারণ-আলেয়া আর গোলাম হোসেনের কথায় সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আলেয়া। 'এমন সরল বিশ্বাসী লোকের নামেও দুর্নাম রটে।'

গোলাম হোসেন। 'বাঙলার নবাবের এই সারল্যই বাঙলার অপরিসীম দুঃখের কারণ হয়ে রইল।'

সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্যেই নাটকের সমাপ্তি। পলাশীর যুদ্ধে গ্লানিকর পরাজয়ের পর আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না সিরাজের। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিয়তি আবার তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁর পায়ের জুতোতেই পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে নবাবের। মহম্মদী বেগ ব্যঙ্গ করে ছেঁড়া জুতো উপহার দিয়েছে নবাবকে। বলেছে—

'জুতোর জন্য আপনি ধরা পড়েছেন তাই ও জুতো পাল্টে ফেলে এই জুতো পরুন হুজুর।'

যে মহম্মদী বেগ একদিন নবাবের অনুগত্য লাভ করেছিল তাঁর অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন নবাব। অস্ত্রাঘাতের পূর্বমুহূর্তে মহম্মদী বেগকে চিনতে পেরে সিরাজের মর্মান্তিক আর্তনাদ—

'তুমি! মহম্মদী বেগ তুমি।'

নাটকের এই অন্তিম মুহূর্তটি দর্শকের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে করুণা এবং বিস্ময়ের যুগপৎ অনুভূতিতে ট্র্যাজিক বেদনার সঞ্চার হয়।

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের শেষ দৃশ্যটি অতিনাটকীয়তার (মেলোড্রামা) পরিচয় বহন করছে। মঞ্চের উপরে সিরাজের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে খানিকটা চমক সৃষ্টির প্রয়াস আছে। নাটকে অতিমাত্রায় ভাবাবেগ সৃষ্টি করার জন্যই নাট্যকার হত্যাকাণ্ডের এই দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন বলে মনে হয়।

৩০২.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সিরাজের ষড়যন্ত্র কন্টকিত বিষাদঘন জীবননাট্যে আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

২। বিষাদান্ত নাটক (ট্রাজেডি) হিসেবে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের মূল্য নির্ধারণ করো।

৩। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সংলাপ রচনার নাট্য সার্থকতা বিচার করো।

৪। স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে নব্যজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা'– নাটকে কাহিনী ও চরিত্র সৃজনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তা' সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

———————

একক - ৭

নাটকে গানের তাৎপর্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৭.১ : নাটকে গানের তাৎপর্য

৩০২.২.৭.২ : কাহিনি বিশ্লেষণ : বিন্যাসরীতি এবং শিল্প প্রকরণ

৩০২.২.৭.৩ : নাটকের অন্তিম দৃশ্যটির শিল্পমূল্য—জনতা চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা

৩০২.২.৭.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.২.৭.১ : নাটকে গানের তাৎপর্য

বাঙালির জীবনচর্চার সঙ্গে গান অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। পদাবলী আর বাউলের গানে বাঙলার আকাশবাতাস মুখোরিত। তাই বাঙালি সঙ্গীতহীন নাটক কল্পনাও করতে পারেনা। বাংলা নাটকের ঊষালগ্নে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের মধ্যপর্বেই নাটকের সঙ্গে গানের গাঁটছড়া বাঁধা শুরু হয়েছিল। বাংলার যে দেশজ নাট্য প্রকরণ যাত্রাও ছিল সঙ্গীত নির্ভর। তাই বাংলার নাট্যকারগণ মনমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে গানের সুন্দর শিল্পীত ব্যবহার করেছেন। এঁরা সকলেই নাটকের জন্য গান রচনা করেছেন এবং সেগুলির সুমিত ব্যবহারে নাটকগুলিকে আবেগধর্মী করে তুলেছেন। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকেই গানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে স্বদেশী যুগে দর্শকের মনে স্বাদেশিকতার আবেগ সঞ্চারের জন্য গানের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রাণশক্তি সন্ধান গানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র নাটকের গভীর অনুভব সমৃদ্ধ গানগুলি দর্শকের হৃদয়ে অচিন লোকের স্পর্শ বহন করে আনে। কালের পরিবর্তনে অনিবার্য ভাবেই নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। তবু আধুনিক জীবনধর্মী নাটকেও গান বর্ণিত হয়নি। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি আধুনিক নাট্যকারগণও তাঁদের নাটকে প্রচুর গান সংযোজিত করেছেন।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য, সেটি হল নাটকের গানের ব্যবহারে যেমন একটি ইতিবাচক দিক আছে তেমনি তার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ সম্পর্কেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' ইতিহাস নির্ভর নাটক। নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে স্বদেশী এবং বণিকদের চক্রান্ত বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর রাজত্বের অবসান এবং মর্মান্তিক মৃত্যুর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিয়ে শচীন্দ্রনাথের আগে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তৎকালীন দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে দশখানি গান যুক্ত করেছিলেন। অবশ্য তাঁর নাটকের সবগানগুলিই যে সুপ্রযুক্ত এমন বলা যায় না। এই নাটকের সব গানগুলি গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখেছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যখন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি লিখলেন তখন তিনিও গানের ভূমিকা অস্বীকার করতে পারেননি। তবে গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তাঁর নাটকে গানের সংখ্যা কম। শচীন্দ্রনাথ মাত্র পাঁচখানি গান দিয়েছেন তাঁর নাটকে। আর এই গানগুলি সবই আলেয়ার কণ্ঠে গীত।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য তাঁর নাটকের গানগুলির গীতিকার তিনি নন। শচীন্দ্রনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম নাটকের জন্য গানগুলি লিখে দিয়েছিলেন। তার ফলে গানগুলির কাব্যমূল্য এবং তাৎপর্য হয়েছে ব্যাপক এবং গভীর। এবং গানগুলির আবেদন দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করেছে সহজেই।

আলেয়ার দেশানুরাগ, ব্যক্তিপ্রেম, দেশ ও জাতির জন্য, নবাব সিরাজদ্দৌলার জন্য সুগভীর মঙ্গলাকাঙ্খা সবই প্রকাশ পেয়েছে গানের মধ্যে দিয়ে। গানের মাধুর্যময় কোমলায় আলেয়া যেন রহস্য লোকের দূতি। কখনও সে নর্তকী, কাশিমবাজার কুঠিতে ইংরেজ আর ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন খবর সংগ্রহ করবার জন্য গানের ফাঁদ পাতে। রূপ আর গানের আকর্ষণে ষড়যন্ত্রীরা অবির্ভূত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেনি আলেয়া গানই এখানে তার সম্মোহনের অস্ত্র।

একদিকে যেমন গানে চিত্তহরণ করে সংবাদ সংগ্রহে পটু আলেয়া ঠিক তেমনি এই গানের মধ্যে দিয়েই সে প্রকাশ করেছে জীবনের বিষণ্ণতা বেদনা। নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলেয়ার কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। আলেয়া গেয়েছে—'আমি আলোর শিখা। ফুটাই আঁধার ভবনে দীপ-কলিকা।'

নবাবের দরবারে নিরিড় অন্ধকার দূর করে আলো জ্বালিয়েছে আলেয়া। গানটিতে তার জীবনের স্বপ্ন এবং আশার পরিচয় ধ্বনিত হয়েছে। সিরাজকে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে গানে। আলেয়া বলেছে—

'আধাঁর দেখলেই আলো জ্বালাব হাসি দিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করবো, চঞ্চল চরণে ছন্দ টেনে এনে জড়তা ঘুচিয়ে দেব।'

আলেয়ার জীবনের এই মহৎ ব্রতটির উদঘাটন ঘটেছে তাঁর গানে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নর্তকী আলেয়ার গান—

'ম্যায় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী'

গানটি হিন্দি ভাষায় গীত হয়েছে। কাশিমবাজার কুঠিতে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ওয়াটস্, আমির চাঁদ, মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতিরা। এই ষড়যন্ত্রে প্রকৃত স্বরূপটি জানাই আলেয়ার উদ্দেশ্য। তাই গানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করে কাছে আসাটা অনায়াস করেছে সে। এই বিদেশীদের সভায় হিন্দি গানই সুপ্রযুক্ত। স্বদেশ এবং এবারের মঙ্গলের জন্যই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে কাশিমবাজার কুঠিতে মন্ত্রনাসভায় উপস্থিত হয়েছে। প্রেমের মাদকতা সঞ্চারী গানটি এখানে খুব তাৎপর্য পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটির সূচনা আলেয়ার গানে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমমধুর এই গানটিতে হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ উৎসারিত করে দিয়েছে সে।

'সখি, শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পীরিতি

মম জীবন-মরণের সাথী।'

বৈষ্ণব ভাবনায় ভাবিত এই গানটি কোমল মধুর আবেদন দর্শকের মনে মাধুর্যভাবের সঞ্চার করে। রাধার মতোই বিরহ বেদনায় ব্যাকুল সে। তার হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে আছে নিবিড় বেদনার কৃষ্ণমেঘ। তাই সে গেয়েছে—'দারুণ বিরহ-দহন জুড়াইতে শ্যাম নাম সুরধুনি ধারা।'

আলেয়ার বাইরের উজ্জ্বল এবং উচ্ছল রূপের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা প্রেম তৃষাতুর হৃদয়ের প্রকাশ তার গানে।

সিরাজের ভাগ্যের সঙ্গে আলেয়ার ভাগ্যও একসূত্রে গাঁধা হয়ে গিয়েছে। দুজনের সম্মুখেই এক অজানা ভবিষ্যৎ। বেদনার্ত হৃদয়ে অনাগত কালের এই অন্ধকার দিনগুলির কথা স্মরণ করেছে আলেয়া তার গানে—

'বুঝি-দুঃখ নিশি মোর হবেনা হবেনা ভোর।

ফুটিবে না আশার আলোক রেখা।'

গানটির মধ্যে নাটকের দুঃখজনক পরিণতির আভাস আছে। ঐতিহাসিক নাটকে এই বেদনারঞ্জিত গানগুলি একটি রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

নাটকের শেষ গানটি গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। পলাশীর প্রান্তরেই অস্তমিত বাংলা স্বাধীনতা সূর্য। গোলাম হোসেন যর্থাথই বলেছে—'সমগ্র জাতির ললাটে লেপে দিয়েছে কলঙ্কের মসী, পলাশী।'

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আলেয়ার শেষ গানে ধ্বনিত হয়েছে সমগ্র জাতির মর্মবেদনা। পলাশী বাঙালি জাতি বেদনা ও কলঙ্কের প্রতীক। আলেয়ার কণ্ঠে উৎসারিত হতাশা এই গানে।

'পলাশী! হায় পলাশী'

এঁকে দিলি তুই জননীর মুখে

কলঙ্ক কালিমা রাশি।'

আত্মঘাতি জাতির বিবেকহীন বিশ্বাসঘাতার প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে গানটিতে। কিন্তু এই নিবিড় বেদনা ও হতাশার মধ্যেও ভবিষ্যতের আশার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জ্যোর্তিময় রেখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে গানের শেষ অংশে আলেয়া গেয়েছে—

'তোর গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ

সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি।'

৩০২.২.৭.২ : কাহিনি বিশ্লেষণ : বিন্যাস রীতি এবং শিল্পপ্রকরণ

সার্থক এবং শিল্পসম্মত নাট্যবৃত্ত গঠন নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুবিন্যস্ত কাহিনিবিন্যাস ও নাট্যবৃত্ত ছাড়া নাটক কখনই সার্থক হয় না। নাটকের সমগ্র ঘটনাটিকে অঙ্কে এবং দৃশ্যে বিভক্ত করে তাকে পরিণতিমুখী করে তোলাই নাটকের প্রধান শিল্পরীতি। নাটকে নায়কের জীবনের উত্থান পতন বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায়। দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই নাটক গতিময় হয়। দ্বন্দ্ব অন্তর আর বাহিরের জটিলতা আনে।

প্রচলিত রীতি অনুসারে পঞ্চমাঙ্ক নাটকে প্রথম দুটি অঙ্কে ঘটনার জটিলতা, তৃতীয় অঙ্কে চূড়ান্ত অবস্থিতি (ক্লাইম্যাক্স)। শেষ দুটি অঙ্কে গ্রন্থিমোচনের মধ্যে দিয়ে ঘটনার অনিবার্য পরিণতি। শচীন্দ্রনাথ তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটকে এই প্রচলিত ছকটি অনুসরণ করেননি। ঐতিহাসিকতার তথ্য অনুসরণ করে নায়ক সিরাজদ্দৌলার ট্র্যাজিক পরিণতি দেখিয়েছেন নাট্যকার।

সিরাজদ্দৌলা নাটকটির বিন্যাস ও শিল্প প্রকরণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমতঃ— নাটকটি পঞ্চমাঙ্ক নয়। সমগ্র কাহিনি তিনটি অঙ্কে সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত—নাটকটির আয়তন ও বিস্তার তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং সংহত।

তৃতীয়ত—রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সম্ভাব্যতার দিকে নজর রেখেই নাটকটি ঘটনা বিন্যাস করেছেন নাট্যকার।

চতুর্থত—ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর নাটক হলেও দেশপ্রেমই সিরাজদ্দৌলা নাটকের মূল সুর। সিরাজ নাটকে ব্যক্তি মাত্র নয় একটি যুগ চেতনার প্রতিনিধি। ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার চেয়ে আবেগধর্মীতার দিকেই মূলত দৃষ্টি দিয়েছেন নাট্যকার।

পঞ্চমত — চরিত্রসংখ্যা সীমিত। চরিত্রগুলি সজীব এবং বাস্তবধর্মী।

ষষ্ঠত — নাটকে গান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কাহিনি বিশ্লেষণ ঃ

প্রথম অঙ্ক ঃ তিনটি দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য ঃ সিরাজের আত্মকথনের মধ্যে দিয়েই নাটকের সূচনা। সূচনাতেই নবাব আলিবর্দির কথা স্মরণ করেছেন সিরাজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ধত্ব এবং ষড়যন্ত্রের আভাস এই দৃশ্যেই পাওয়া যায়। এই দৃশ্যেই আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি। তাদের কথায় নবাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংবাদের খবর। আলেয়ার জীবন কাহিনির উদঘাটন। সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিত্ব। পত্নী লুৎফার সঙ্গে কথোপকথনে সিরাজের মর্মবেদনার প্রকাশ।

প্রথম দৃশ্যেই বাইরের সংঘাত এবং নায়কের অন্তর্বেদনা নাটকের পরিণতির ইঙ্গিত বহন করেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ এই দৃশ্যে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে ঘসেটি বেগমকে কেন্দ্র করে। পালিত পুত্রের সিংহাসনলাভের জন্য তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঘসেটি বেগমের সঙ্গে লুৎফার কথোপকথন তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত সিরাজের নির্দেশে ঘসেটি বেগম বন্দিনী।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ দৃশ্যটির ঘটনাস্থল কাশিমবাজার কুঠি। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি অমাত্যদের সঙ্গে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি। ইংরেজদের পক্ষে ওয়াটস, ডাক্তার ফোর্থ পাদরী স্ট্রং প্রভৃতি অংশ নিয়েছেন।

আলেয়ার উপস্থিতি নর্তকী হিসেবে। উদ্দেশ্য গোপন ষড়যন্ত্রের তথ্য সংগ্রহ।

সিরাজের কুঠি আক্রমণ। ওয়াটস বন্দি। তীব্র সংঘাত প্রত্যক্ষ রূপ নিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ দৃশ্যসংখ্যা তিন

প্রথম দৃশ্য ঃ দরবার কক্ষ। বন্দি ওয়াটস্‌কে সিরাজ তিরস্কার করেই ছেড়ে দিলেন। সিরাজের সঙ্গে মীরজাফর, রাজবল্লভ জগৎশেঠ প্রভৃতিদের তীব্র বাদানুবাদ। মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র মুখোস খুলে পড়েছে। অন্য দিকে মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতির সিরাজের প্রতি আনুগত্য। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে যথাসময় উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ করলেন না সিরাজ। এটা তাঁর একটি বড় ভুল। সিরাজ আবেগময় ভাষায় শত্রুপক্ষের হৃদয় পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। সিরাজের স্বদেশপ্রাণতা এই দৃশ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে এক বড় ভুল করলেন সিরাজ। এই দৃশ্যেই অনিবার্য ধ্বংস এবং তাঁর নিষ্ঠুর নিয়তির অশনি সংকেত দেখতে পেয়েছেন তিনি। তাই তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে 'পলাশী রাক্ষসী পলাশী'!

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ আলেয়া এবং মীরণের কথোপকথন। মীরণের হীন কামুক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় এই দৃশ্যে। ফুটে উঠেছে তার নিষ্ঠুরতার পরিচয়।

আলেয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় সিরাজের বিষণ্ণ ক্লান্ত হৃদয়ের পরিচয়টি উদঘাটিত হয়েছে। অনিবার্য সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিরাজের রোমান্টিক হৃদয়ের কোমল অনুভব ট্রাজেডির বেদনাকে তীব্র করে তুলেছে।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ দৃশ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃশ্যটিকেই নাটকের শীর্ষ পরিণতি বা ক্লাইম্যাক্স বলা যেতে পারে। এই দৃশ্যেই বাইরে সংঘাত অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। সিরাজের অসহায় আত্মসমর্থন তাঁর চরম পতনকে আভাসিত করেছে। আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের সাবধানবাণী সত্ত্বেও মীরজাফরের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে চরম ভুল করেছেন সিরাজ। শেষপর্যন্ত এই চক্রান্তের শিকার হয়েছেন তিনি। পরাজিত সিরাজের আত্মরক্ষার চেষ্টা এবং পলায়ন। সিরাজকে বন্দি করবার নির্দেশ ক্লাইভের।

সিরাজের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে জাতির ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতির অশুভবার্তা এই দৃশ্যেই ঘোষিত হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক - দৃশ্য সংখ্যা তিন

প্রথম দৃশ্য - এই দৃশ্যটিতে দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার ধারাবাহিকতা। ঘটনার জাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে এসেছে। আত্মরক্ষার জন্য সিরাজ এবং লুৎফা ছদ্মবেশে পলায়ন করেছেন। সিরাজ আজ একা—কেউ তার পাশে নেই। সিরাজের কণ্ঠে তাই হতাশা আর বেদনার ব্যাকুলতা। বন্দি হয়েছে আলেয়া আর গোলাম হোসেন। পলাতক সিরাজের গন্তব্যস্থল জানবার জন্য তাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু এরা কেউই সিরাজ প্রসঙ্গে কোনো খবর দেয়নি। আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের কথোপকথনে ব্যক্তিপ্রেম এবং স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ কারাগারে আলেয়া আর গোলাম হোসেন। এই দুই বন্দির উপর মীরণের পীড়ন এবং প্রলোভন। উদ্দেশ্য সিরাজের গতিবিধির খবর জানা।

বন্দি হয়েছেন সিরাজ। তাঁকে মুর্শিদাবাদে আনা হয়েছে। তাঁর মর্মান্তিক পরিণতি শুধু সময়ের অপেক্ষা। সিরাজের সঙ্গে আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের কথোপকথন। এই কথোপকথনে দেশপ্রেমের অপূর্ব প্রকাশ। দৃশ্যের শেষ আলেয়ার গান — 'পলাশী! হায় পলাশী'।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ অন্তিম দৃশ্য। এখানে সুপরিকল্পিত ভাবে একটি জনতার দৃশ্য রচনা করেছেন নাট্যকার। সিরাজ প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করতে আবেগময়ী ভাষণ দিয়েছেন। জনতার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা নবাবকে সাহায্য করবার আশ্বাস দিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মহম্মদী বেগের ছুরিকাঘাত। বাঙলায় নতুন সূর্যোদয়ের অভয় বাণী উচ্চারণ করে সিরাজের মৃত্যু।

৩০২.২.৭.৩ : নাটকের অন্তিম দৃশ্যটির শিল্পমূল্য—জনতা চরিত্র অঙ্কনে দক্ষতা

শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিক এবং প্রজাবৎসল নায়ক রূপেই চিত্রিত করেছেন। এখানেও হয়ত সমকালের রাজনৈতিক ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল।

শচীন্দ্রনাথের নাটকখানি গাঢ়বদ্ধ, সুপরিকল্পিত এবং সুসংহত। মাত্র তিনটি অঙ্কে ন-টি দৃশ্যে তিনি নাটকখানিকে তীব্র গতিময় করে তুলেছেন। এর ফলে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্যতা লাভ করেছে। দৃশ্য পরিকল্পনায় শচীন্দ্রনাথের সচেতনতা অবশ্যই শিল্পগুণের পরিচয় বহন করছে। নাটকটি শুরু হয়েছে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর বিশ্বস্ত আমীর ওমরাহগণের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। আলেয়া আর গোলাম হোসেন এই ষড়যন্ত্রের গোপন সংবাদ নবাবকে জানিয়েছে। কিন্তু অসহায় নবাব এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেননি। মীরমদন, মোহনলাল ছাড়া আর কেউই নবাবের দুর্দিনে তাঁর পাশে ছিলেন না। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতিরা এবং ইংরেজ বণিকেরা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শেষপর্যন্ত মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটে। পলাশী যুদ্ধে প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। মীরমদন, মোহনলাল শত চেষ্টাতেও মীরজাফরের অধীনস্থ সৈন্যদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাতে পারেনি। মীরজাফর এবং তাঁর অনুচরবর্গের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। আকস্মিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে ক্লাইভের যুদ্ধজয়কে সুনিশ্চিত করেছে।

পরাজিত সর্বহারা নবাব সিরাজদ্দৌলা আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। পাটনায় আশ্রয় পাবার আশায় তিনি গোপনে রাজধানী ছেড়ে যান। কিন্তু তাঁর ভাগ্য বিরূপ তাই ধরা পড়ে যান রাজকীয় জুতোটির জন্য। তাঁকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনা হয়। নাটকের অন্তিম দৃশ্যটি করুণ এবং নাটকীয়। দর্শকের রুদ্ধশ্বাস আশঙ্কা এবং রোমাঞ্চ ঘনীভূত হয়েছে শেষ দৃশ্যটিতে। শেষ দৃশ্যটি পরিকল্পনায় নাট্যকার অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

বন্দি সিরাজদ্দৌলা জনতার দরবারে উপস্থিত। বিচারে বোধহীন লোভী বিবেকবর্জিত জনতার উন্মত্ত আচরণের পটভূমিতেই দৃশ্যটির পরিকল্পনা। দৃশ্যটি পরিচয় দিয়ে নাট্যকার বলেছেন, এই দরবার কক্ষে

সভাসদেরা নেই, মন্ত্রী-সেনাপতি আমির ওমরাহরাও নেই। আছে একটা জনতা। তাদের মলিন বস্ত্র, রুক্ষ চেহারা, চোখে মুখে নিষ্ঠুরতা।

এই দৃশ্যটি পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। এই প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকে জনতা দৃশ্য পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে যায়। শেক্সপীয়র তাঁর 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে অসাধারণ জনতার দৃশ্য অঙ্কিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকেও জনতার দৃশ্য আছে।

জনতার একটি নিজস্ব চরিত্র আছে। জনতায় একক বা পৃথক ব্যক্তিত্বে কোনো অস্তিত্ব নেই। সামগ্রিক ভাবে জনতাই যেন একটি চরিত্র। তাদের আবেগ উত্তেজনা হাউই বাজির মতো ক্ষণস্থায়ী। জনতার মত বা বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটতে দেরি হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের বা বক্তার উত্তেজনাকর বক্তব্য সহজেই তাদের উত্তেজিত করে তোলে, তেমনি আবার বিপরীত চিন্তার আবেগময় ভাষণে পূর্ব বিশ্বাস বা ভাবনা অনায়াসেই ধুয়ে মুছে যায়। বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দোদুল্যমানতাই জনতা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের শেষ দৃশ্যে জনতা চরিত্রের সার্থক চিত্রায়ণ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর জনতা রাজপ্রাসাদে ঢুকে যথেচ্ছচার করছে। লোকের তাড়নায় তারা অস্থির। মীরণ তাদের লোভ দেখিয়ে এসেছে। জনতার বিশ্বাস রাজপ্রসাদে ঢুকতে পারলে প্রচুর ধনরত্ন হীরামুক্তা এমনকি হারেমের নারীদেরও তারা লুটে নিতে পারবে। কিন্তু কিছুই তাদের ভাগ্যে জোটেনি। ফলে কিছু না পেয়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মীরণের কাছে তারা ধনসম্পত্তি দাবি করতে থাকে। বলে, 'বেগম মহল কোন্ দিকে চাচা? উত্তেজিত জনতা বলে 'আমরা লুট করবো। লুটে নেব।'

মীরণ এবং মহম্মদী বেগ বুঝতে পারে পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। যে লোভের আগুনে তারা ঘি ঢেলেছিল এখন তা নিভানো কঠিন। অবস্থা সামাল দেবার জন্য মহম্মদী বেগ জনতাকে সেপাই-এর ভয় দেখায়-'তা হলে সেপাইদের ডাকব'। সেপাই এর কথা শুনেও ভয় পায় না জনতা। ব্যঙ্গ করে বলে — 'মীরণ চাচা এ বেটা যে সেপাই শোনায়'। মীরণের হঠকারিতা এবং দুষ্ট অভিসন্ধি দৃশ্যটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে চেয়েছে সিরাজ জনতার হাতে নিগৃহীত হোক। সেই উদ্দেশ্যেই সে জনতাকে উত্তেজিত করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মীরণের এই উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছে। এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির মধ্যেই সিরাজ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে জনতার তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রুপ। সিরাজের মাথায় তারা পরিয়ে দিয়েছে ঝাঁটার মুকুট। নিষ্ঠুর বিদ্রুপে জনতার একজন বলেছে—'কালকের নবাব ভেগে পড়া, বাঙলাহারা সিরাজদ্দৌলা বন্দি বাহাদুর।' সিরাজের সিংহাসনটিকে ঘেঁটুফুল দিয়ে সাজিয়েছে ওরা। ছেঁড়া জুতো উপহার দিয়েছে — 'হুজুর। জুতোর জন্যে আপনি ধরা পড়েছেন, তাই ও-জুতো পাল্টে ফেলে এই জুতো পরুন হুজুর।'

পরিহাস এবং বিদ্রুপের কশাঘাতে জর্জরিত করে জনতার 'একজন বলে—'ফকিরের দরগায় যাবেন বলে খিচুড়ি চাপিয়েছিলেন, খাওয়া আর হয়নি। আপনার কপাল পোড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়িও পুড়ে গেছে।'

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে আকস্মিক ভাবেই। সমস্ত বিদ্রূপ নিন্দা শ্লেষ মাথা পেতে নিয়ে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন সিরাজ। জনতাকে সম্বোধন করে বলেন—'ভাই সব'। এই নির্বোধ অল্পবুদ্ধি

জনতার প্রতি কোনো কটুবাক্য বলেননি তিনি। নবাবের এই 'ভাই' সম্বোধন তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে জনতার মধ্যে। একজন বলেছে — 'বলে কি রে! এত অপমান করলাম তবু বলে ভাই।'

এরপর সিরাজের আবেগসঞ্চারী ভাষণ জনতাকে বিপরীত মেরুতে পৌছে দেয়। সিরাজ বর্গী হাঙ্গামার অত্যাচার নিপীড়নের দিনগুলিতে প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন জনতাকে। এবার জনতার ভাবনা ভিন্নমুখী হতে থাকে। ভুল বুঝতে পেরে অকুণ্ঠ চিত্তে জনতা বলে — 'কু- লোক আমাদের দিয়ে এই সব কাজ করিয়েছে।' অতীতদিনের অনেক আনন্দঘন মুহূর্তের কথা সিরাজ স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর প্রিয় প্রজাবৃন্দকে । প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসেছে কলকাতা জয়ের সেই আনন্দময় দিনটির কথা।

এবার দ্বিধাহীন চিত্তে জনতা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের প্রিয় নবাবের কাছে। বলেছে — 'হুজুর আমরা বোকা, বলে না দিলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না।'

জনতার মুখ থেকে এবার তিনি শুনেছেন ভালোবাসার কথা। স্তুতি ঝরে পড়েছে তাদের মুখ থেকে- 'তুমি আমাদের রাজা, তুমি আমাদের দেবতা।' সিরাজের মনে আবার আশার আলো জ্বলে ওঠে। উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় সিরাজের সামনে ভেসে ওঠে স্বাধীন বাঙলার স্বপ্ন। সিরাজ উদার কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেন—

"ভাই সব এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গজননীর কনককীরিটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কেনা।'

ঘটনার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিচলিত তাঁর শত্রুপক্ষ। তাই আর বিলম্ব করতে চায়নি তারা। সিরাজের উপর নেমে এসেছে মহম্মদী বেগের তীক্ষ্ম ছুরির আঘাত। শেষ হয়েছে একটি সম্ভাবনার।

এই পরিস্থিতিকে 'অ্যান্টি ক্ল্যাইমাক্স' বলা যেতে পারে। আশা আর নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দর্শকচিত্ত যখন অনাগত সুদিনের স্বপ্ন দেখছে ঠিক তখনই নিষ্ঠুর হত্যা এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। কিছুটা মেলোড্রামাটিক হলেও ট্র্যাজিক রসসৃষ্টিতে নাট্যকার যথেষ্ট সফল।

৩০২.২.৭.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের নাট্যতাৎপর্য নির্দেশ করো।

২। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের কৃতিত্ব বিশ্বেষণ করো।

৩। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটতে পরাধীনতার শৃঙ্খলামোচন, জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বিষয়টি কীভাবে নাট্যকার তুলে ধরেছেন তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৪। আবেগ এবং প্রয়োজনের মুখোমুখি রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি ঐতিহাসিক না উদ্দেশ্যবাহী? না কি দুই-ই? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

———————

একক - ৮

চরিত্র পর্যালোচনা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৮.১ : চরিত্র পর্যালোচনা

৩০২.২.৮.১.১ : সিরাজদ্দৌলা

৩০২.২.৮.১.২ : গোলাম হোসেন

৩০২.২.৮.১.৩ : মীরজাফর

৩০২.২.৮.১.৪ : জগৎশেঠ

৩০২.২.৮.১.৫ : রাজা রাজবল্লভ

৩০২.২.৮.১.৬ : মীরণ

৩০২.২.৮.১.৭ : ক্লাইভ

৩০২.২.৮.১.৮ : আলেয়া

৩০২.২.৮.১.৯ : লুৎফউন্নেসা বা লুৎফুন্নেসা

৩০২.২.৮.১.১০ : ঘসেটি বেগম

৩০২.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.২.৮.১ : চরিত্র পর্যালোচনা

৩০২.২.৮.১.১ : সিরাজদ্দৌলা

বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত চরিত্র। সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজদ্দৌলার পরাজয় বাঙালির জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে ইতিহাসে এবং সাহিত্যে এই চরিত্রটি নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে সিরাজ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। সিরাজের পতনের কাহিনিও সেখানে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালে চার্লস স্টুয়াট তাঁর 'History of Bengal' গ্রন্থে সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক পরিচয়টি আলোচনা করেছেন। এইসব ঐতিহাসিকগণ সিরাজের ব্যক্তিচরিত্র এবং রাজনৈতিক চরিত্রে নানা কলঙ্ক লেপন করেছেন। বিশেষ করে তার সময়ে অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটির জন্যও তিনি সিরাজকে দায়ি করেছেন। অন্ধকূপ হত্যার ঘটনায় সিরাজের নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। অবশ্য অনেকে আবার মনে করেন অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটি সিরাজের অজ্ঞাতসারেই ঘটেছিল। কিন্তু তাতে সিরাজের অমানবিকতার পরিচয় মুছে যায়না। পরবর্তীকালে আচার্য যদুনাথ সরকার অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটি সত্য বলেই স্বীকার করেছেন।

পারিপার্শ্বিকের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়েই আলিবর্দি খাঁ সিংহাসন লাভ করেছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সিরাজকেও এক জটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে। আলিবর্দি তাঁর নাতি সিরাজকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সেইজন্য তিনি চেয়েছিলেন সিরাজই সিংহাসনে বসুক। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না। তাই সিংহাসন লাভের পরই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বেধে ওঠে। এরজন্য সিরাজ চরিত্রের হঠকারিতা এবং নিন্দনীয় ব্যক্তিচরিত্রই হয়তো খানিকটা দায়ি। ব্যক্তিজীবনে সিরাজ যে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন মদ্যপ এবং রমনী আসক্ত। সমকালীন বিবরণেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। Mutaqherin (মুতাক্ষরিন) গ্রন্থে গোলাম হোসেন লিখেছেন— "নবাব আলিবর্দি খাঁনের বিবিজানেরা এবং তাঁর পেয়ারের সিরাজউল্লাহ এমন সব কদর্য কুকর্ম এবং বেহায়া বেলেল্লাপানায় লিপ্ত থাকতেন যা খানদানী লোকের কথা দূরে থাক আমজনতাকে পর্যন্ত বেইজ্জত করবে।"

সিরাজদ্দৌলা চরিত্রটি নারীঘটিত কালিমা লিপ্ত। রানী ভবানীর কন্যা তারার প্রতি সিরাজের মুগ্ধতা একটি কলঙ্কজনক ঘটনা। বাঙলার আকাশে বাতাসে এইসব ঘটনা সদা প্রচারিত ছিল।

সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক বিচক্ষণতারও অভাব ছিল। তিনি অকারণে ক্রোধ প্রকাশ করতেন। রাজত্বের সূচনাতেই প্রচারিত হয় যে জগৎশেঠের মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে তিনি চপেটাঘাত করেছেন। এছাড়াও মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতি বড় বড় মনসবদারকে নিজের ইয়ার মোহনলালের বাড়িতে সেলাম বাজাতে যেতে বাধ্য করেন। বলা বাহুল্য এর ফল ভালো হয়নি। এইভাবেই তিনি তাঁর আশে পাশের মানুষগুলিকে বিরূপ করে তুলেছিলেন।

ইংরেজের সঙ্গে প্রথম থেকেই তাঁর বিরোধ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের শিক্ষা দেবার জন্য কলকাতা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে শহরের নামকরণ করলেন 'আলিনগর'।

এতো গেল ইতিহাসের দিক। কিন্তু নাটক ইতিহাস নয়। ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক সিরাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে কলম ধরলেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা সিরাজদ্দৌলার একটি অকলঙ্ক মানবিক পরিচয় তুলে ধরতে তৎপর হয়েছেন।

নবাব সিরাদ্দৌলাকে অবলম্বন করে কাব্য নাটক রচনার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। কবি নবীনচন্দ্র সেন সিরাজদ্দৌলার পতনের কাহিনি অবলম্বন করে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ'।

এই কাব্যে নবীনচন্দ্র সিরাজ সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস নির্ভর করে তাঁকে নিষ্ঠুর এবং চরিত্রহীন হিসেবেই চিহ্নিত করলেন।

সেই সময় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তখন দেশবাসী উদ্‌বেলিত। এই সময় নাট্যকারগণ নাটকে স্বাদেশিকতার অনুভবকে প্রবল ও প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্য বীর চরিত্রের সন্ধান করছিলেন। প্রতাপাদিত্য, শিবাজী প্রভৃতি ঐতিহাসিক বীর চরিত্র অবলম্বনে লেখা হয়েছে নাটক। গিরিশচন্দ্র এই পরিস্থিতিতে সিরাজকে জাতীয় বীর হিসেবে, নায়ক হিসেবে বেছে নিলেন। আর তাই অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকের বিচার নির্ভর করে গিরিশচন্দ্র সিরাজকে প্রজাবৎসল দেশপ্রেমিক সিরাজের চিত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর নাটকে। তবে সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতাগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি তিনি। নাটকে নানা ইঙ্গিতে সেটি তিনি প্রকাশ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলা নাটকখানি নতুন করে লিখলেন। গঠনরীতি ও চরিত্রসৃষ্টি সব দিক থেকেই তাঁর নাটক অভিনবত্বের পরিচয় দিল। সিরাজদ্দৌলাকে নতুন রূপে চিত্রিত করলেন তিনি। কলঙ্কবর্জিত, দেশপ্রেমিক সিরাজ চরিত্র তিনি গিরিশচন্দ্রের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। সিরাজ চরিত্রটিকে তিনি সমগ্রজাতির ট্রাজিক পরিণতির প্রতীক হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। নাট্যকার বলেছেন—

'জাতির পক্ষে যা চরম ট্র্যাজেডি তাই আমি সিরাজচরিত্র অবলম্বনে তুলে ধরতে চেয়েছি।' শচীন্দ্রনাথের নাটক সংক্ষিপ্ত এবং স্বল্পকালীন ঘটনানির্ভর। এই সময়টুকুর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়েছিল তার পরিচয় আছে। শচীন্দ্রনাথের সিরাজ দুর্বল, স্নেহপ্রবণ এবং কিছুটা রোম্যান্টিক আবার যথেষ্ট পরিমাণে আবেগপ্রবণও বটে। মীরজাফরের প্রকৃত পরিচয় তার ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তার প্রতি তিনি কঠোর হতে পারেননি এমনকি চরম মুর্হূতে তাঁর আস্থাস্থাপন করে চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। এই ঘটনাটি সিরাজের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবকে সূচিত করে। শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কূটবুদ্ধি থাকা প্রয়োজন সিরাজের তা ছিল না—নাটকে সেই কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে।

সিরাজ যে কলঙ্কিত নায়ক এ কথাটি নাট্যকার ভোলেননি, তাই সংলাপের মধ্যে দিয়ে সিরাজ চরিত্রের পরিবর্তনের দিকটিও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেননি নাট্যকার, সিরাজকে নির্দোষ নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর চিত্তপরির্তনের পরিচয়টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল।

স্বদেশভাবনার সঙ্গে সিরাজের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয়টিও দিতে ভোলেননি নাট্যকার। বাঙালির দুঃখ বেদনা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

রাজ্যশাসন এবং ষড়যন্ত্র কন্টকিত পরিবেশে বিচারহীন বিশ্বাস এবং ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় জানবার পরেও কোনো কঠোর ব্যবস্থাদি না নেওয়ার ফলেই সিরাজের জীবনে নেমে এসেছে চরম আঘাত। অতি বিশ্বাসপ্রবণতাই তাঁর জীবনের প্রধান দুর্বলতা। তাঁর জীবনের ট্যাজেডির মূল সত্যটি খুঁজে পাওয়া যাবে এখানেই। ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্য এবং ষড়যন্ত্রের যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েও ওয়াটসকে কোনো শাস্তি দেননি সিরাজ। এটি শাসক হিসেবে তাঁর দুর্বলতাও বলা যায়। পলাশীর যুদ্ধের চরম মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কাছে সিরাজের আত্মসমর্পন তাঁর চরিত্রে চরমতম দুর্বলতা।

নাটকে পরিণতি দুঃখান্তক। সিরাজদ্দৌলা বন্দি হয়েছেন ষড়যন্ত্রীদের হাতে। নাটকের শেষ দৃশ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। লোভী বিবেকহীন জনতার সম্মুখে সিরাজের শেষ বিচার। প্রজাদের সমস্ত অপমান এবং লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে আবার নতুন করে স্বদেশমুক্তির আবেগ ধ্বনিত হয়েছে সিরাজের কণ্ঠে। সিরাজ বলেছেন—

'তা হলে এস ভাইসব, আর একবার চেষ্টা করে দেখি। পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি বঙ্গজননীর কনককীরিটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কিনা।'

কিন্তু সিরাজের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। নাটকের চরম মুহূর্তটি যেমন আকস্মিক তেমনি মর্মান্তিক। মহম্মদী বেগের তীক্ষ্ম ছুরিকার আঘাতে শেষ হয়েছে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্বপ্ন। এই মহম্মদী বেগ একদিন নবাবের অনুগৃহ লাভ করেছিল। আজ সেই অনুগৃহীত মানুষটিকে ঘাতকের ভূমিকায় দেখে অন্তিম মুহূর্তে সিরাজের মুখ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য উচ্চারিত হয়েছে—

'তুমি! মহম্মদী বেগ, তুমি!'

এ যেন জুলিয়াস সিজারের সেই উক্তিটিকে মনে করিয়ে দেয়—

'ব্রুটাস্ তুমিও!'

শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলাকে সমগ্র জাতির ট্র্যাজেডির প্রতীক রূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সফল হয়েছেন তিনি।

৩০২.২.৮.১.২ : গোলাম হোসেন

নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' ইতিহাস-নির্ভর নাটক। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্রের প্রাধান্য স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়। তথ্য আর কল্পনার যুক্তবাণীতে ঐতিহাসিক নাটকের রসরূপ। আর সেইজন্য নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের পাশাপাশি অনৈতিহাসিক চরিত্রও ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অবশ্যই এই অনৈতিহাসিক ঘটনা চরিত্রগুলিকে যুগ ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই সৃষ্টি করতে হয়। সিরাজদ্দৌলা নাটকে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গোলাম হোসেন।

ট্র্যাজেডিতে একাধিক কারণে কিছু লঘু এবং নিম্নমানের চরিত্রের অবতারনা করা হয়ে থাকে। ট্রাজেডির তীব্র সংকটময় পরিস্থিতিতে দর্শকের চিত্ত বিশ্রামের জন্য কিছু লঘু ঘটনা এবং চরিত্রের প্রয়োজন হয়। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্রটি এই ভূমিকাই পালন করে। বিদূষক রাজার বয়স্য তাই রাজার সঙ্গে রহস্যময় ভঙ্গিতে লঘুসংলাপের মধ্যে দিয়ে অকপট সত্য উদঘাটিত হয়। ইংরেজী নাটকে এই জাতীয় চরিত্রের পরিচিতি ফুল (Fool)। এই আপাত নির্বোধ চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে নাটকের অনেক গূঢ় রহস্য উদঘাটন করেন নাট্যকার।

বাঙলা নাটকেও এই জাতীয় চরিত্রে দেখা মিলবে একাধিক। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে 'করিমচাচা' দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাজাহান' নাটকে 'দিলদার' প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করে এই ধারণাই অনুবর্তন করেছেন।

শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলা নাটকে নবাবের পরিণাম পর্বের কাহিনির নাট্যরূপ দিয়েছেন। গোলাম হোসেন নবাব সিরাজদ্দৌলার পরম বিশ্বস্ত সহচর। দুঃখের দিনে সংশয় সন্দেহের পটভূমিতে গোলাম হোসেন নবাবের একমাত্র নির্ভর। কাল্পনিক এই চরিত্রটির আবেগাপ্লুত সংলাপের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে জাতির অনাগত সর্বনাশের অশুভ সংকেত।

গোলাম হোসেন মূর্তিমান ভাঁড়। তার সাজপোশাক কথাবার্তা সবই অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর। বিশেষ করে তার বেশভূষায় বৈচিত্র্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সংলাপগুলি আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে দ্ব্যর্থক ব্যঞ্জনা। হাস্যকর আচার আচরণের অন্তরালে গভীর স্বদেশানুরাগ। নাট্যকার গোলাম হোসেনের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

'যেমন উৎকট তাহার চেহারা, তেমনি উদ্ভট পোশাক। এক পায়ে প্যান্ট আর বুট। আর এক পায়ে মোগলাই পাজামা আর নাগরা। দেহের এক অর্ধে ইংলিশ কোট, আর এক অর্ধে নামাবলির মেজরাই। গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক। মাথায় অর্ধেক টপহ্যাট আর অর্ধেক ফেজ। গোঁফ কামানো আর চাপ দাড়ি। প্রকাণ্ড এক গোছা টিকি।'

এই বিচিত্র পোষাকের তাৎপর্য অবশ্যই আছে। গোলাম হোসেন তার পোশাকের বৈচিত্র্যে মধ্যে দিয়ে বাঙালির অবক্ষয় এবং আত্মঅবনতির পরিচয়টি তুলে ধরতে চেয়েছেন। গোলাম হোসেন বলেছে—

'ফরাসী, ইংরেজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে বাঙালীর যে হাস্যকর রূপ ফুটিয়ে তুলেছে তা দেখিয়ে দিয়েও তাদের বোঝাতে পারি না। তারা ভাবে পাগলের খেয়াল। বোঝেনা যে, আজকের বাঙালীর সত্যিকারের রূপই এই।'

গোলাম হোসেন কেন এই ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখে। কেন আজ তাই ভাঁড়ের ভূমিকা? এর উত্তর পাওয়া যায় তার কথাতেই। গোলাম হোসেন বলেছে—

'দেখলাম বড় বড় সেনাপতি, রাজা উজীর সবাই স্বার্থের সন্ধানে উন্মাদ, শুধু একটি লোক স্বার্থেরই খাতিরে বাঙলা-বাঙলার স্বাধীনতা-বাঙলার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করছে। সে হচ্ছে বাঙলার এই হতভাগ্য নবাব। বাঙলার জন্যই বাঙলার নবাবের প্রেমে পড়লাম, ব্যক্তিটির জন্য নয়।'

তথাকথিত 'ভাঁড়' গোলাম হোসেনের গৌরবময় অতীত আছে। সেই অতীতকে গোপন করবার জন্যই তার এই ছদ্মবেশ। গোলাম হোসেনের প্রকৃত নাম পুরন্দর। তার প্রকৃত পরিচয়টি কেবলমাত্র আলেয়ারই জানা ছিল। পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর আগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নিরঞ্জন স্বামীর শিষ্য পুরন্দর। আজ গোলাম হোসেন ছদ্ম নামের অন্তরালে তার প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে।

স্বদেশপ্রেম গোলাম হোসেনের জীবনের প্রধান উপাদান। বাঙলা আর বাঙালিকে তার মত আর কেউ ভালোবাসেনি। আর এই স্বদেশ স্বজাতির প্রতি ভালোবাসাই নবাবের প্রতি ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই নবাবের বিপদের দিনে সে অতন্দ্র প্রহরী। নবাবের প্রতি ভালবাসার গোপন রহস্যটি উদঘটিত হয় তার কথায়—

'সারা বাঙলা ঘুরে এসেছি ভাই, পুণ্যবান লোক দেখেছি , দয়ালু দাতা দেখেছি, শক্তিমান বীরও দেখেছি কিন্তু দেশপ্রেমিক একটিও দেখিনি।'

গোলাম হোসেনের দার্শনিক উপলব্ধি গভীর। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর জাতি যখন চরম লাঞ্ছনা আর সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তখনও সে অনাগত দিনের শুভ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছে, বলেছে—

'এ পরাজয়ের প্রয়োজন আছে জাঁহাপনা, দাঁত থাকতে নির্বোধেরা দাঁতের মর্ম বোঝে না। দেশের স্বাধীনতা থাকতে অপদার্থরা স্বাধীনতারও মর্ম বোঝেনা।'

গোলাম হোসেনের ছদ্মবেশ এবং আত্মগোপন প্রয়াসের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় সংবেদশীল একটি হৃদয়। সমস্ত দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিয়ে দেশপ্রেমের প্রতীক রূপে নবাবকে ভালোবেসেছিল। নাটকের শেষে বড় বিষণ্ণ বেদনাকৃত গোলাম হোসেন।

আত্মরক্ষার চেষ্টায় পলাতক নবাব সিরাজদ্দৌলা। মীরণ তাঁর সংবাদ জানতে চায় গোলাম হোসেন এবং আলেয়ার কাছে। দুজনেই বন্দি। অকথ্য অত্যাচারেও সামান্য একটি কথাও বলাতে পারেনি মীরণ গোলাম হোসেনকে।

গোলাম হোসেন দেশপ্রেমিক এবং প্রেমিক। নাটকের শেষে গোলাম হোসেন তথা পুরন্দরের প্রেমিক হৃদয়ের স্নিগ্ধ প্রকাশে মানবিক। আলেয়ার প্রতি তার প্রেমগোপন পুষ্পগন্ধের মতই মধুর। অপ্রয়োজনীয় এই প্রেম শুধু বেদনাই বহন করেছে।

ব্যর্থতা, বেদনা এই নিয়েই গোলাম হোসেনরা জীবনের ট্র্যাজেডি। জীবনে যে শুধু দিয়েই গেছে, পায়নি কিছুই। স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, নবাবের প্রতি ভালবাসা তার জীবনের একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আনন্দ বেদনার অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় গোলাম হোসেন চরিত্রটি শিল্পমাধুর্যের পরিচয় বহন করছে।

গোলাম হোসেন চরিত্রটি অনেকটা গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো। কোরাসের মত বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে সে। তবু নিয়তির অঙ্গুলি হেলনে ঘটেছে মহতি বিনষ্টি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সিয়র-উল-মুতাক্ষরিণ গ্রন্থের লেখকের নাম গোলাম হোসেন খান। তাঁর গ্রন্থে পলাশীর যুদ্ধের শেষ তিন-চার বছরের ইতিহাসের রূপ রেখাটি স্থান পেয়েছে। নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর কাল্পনিক চরিত্রটির নামকরণে এই নামটির কথা মনে করেছিলেন এমন অনুমান হয়ত অসঙ্গত নয়।

৩০২.২.৮.১.৩ : মীরজাফর

বাঙালির কাছে 'মীরজাফর' বিশ্বাঘাতকতার আর এক নাম। বাঙলা নাটকেও দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক রূপেরই মীরজাফরের স্থান নির্দিষ্ট আছে। শুধু বিশ্বাসঘাতকই নয় ব্যক্তি হিসেবেও মীরজাফর ছিলেন কাপুরুষ এবং অর্কমণ্য। কিন্তু মীরজাফর সম্পর্কে এই অপবাদ কতখানি ঐতিহাসিক সত্য সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কাপুরুষ এবং অকর্মণ্য হলে তিনি কেমন করে দু-দুবার বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার মোগল সওয়ার বাহিনীর 'বকশী' (Paymaster-General) হয়েছিলেন? পলাশীর যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁর নামের সঙ্গে কলঙ্ক পরিচয়টি চিরস্থায়ী করেছে।

মীরজাফরের সম্পূর্ণ নাম মীরজাফর আলি খান (১৭৪৭-৬০, ১৭৬৪-৬৫)। তিনি উচ্চবংশীয় আরব সৈনিক ছিলেন। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ আহম্মদ নজাগি। প্রথমে তিনি নবাব সুজাউদ্দিনের নিম্নপদস্থ সেনানী

ছিলেন। পরে আলিবর্দির সৎ বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আলিবর্দি বাঙলার নবাব হবার পর মীরজাফর পুরোদস্তুর মনসবদার বনে যান। পরবর্তীকালে বর্গির হাঙ্গামার সময় বীরত্ব দেখিয়ে তিনি নবাবের আস্থা ভাজন হন এবং ধীরে ধীরে সুরে বাঙলার 'বকশী' পদে নিযুক্ত হয়ে নবাবের দক্ষিণ হস্ত ও প্রধান সেনাপতির গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন।

কিন্তু এরপর তাঁর কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসঘাতকতায় দরবারে তাঁর প্রতিপত্তি কমে যায়। বৃদ্ধ আলিবর্দি মৃত্যুর পূর্বে মীরজাফরকে কোরান হাতে শপথ করিয়ে নেন তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন লাভের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। ক্ষমতা হাতে পেয়েই সিরাজ ঘসেটি বেগমের মোতিঝিল প্রাসাদ ধুলিসাৎ করে দিলেন। আর সেই সঙ্গে পুরানো সেনাপতির উপরেও রুষ্ট হলেন। মীরমদন এবং মোহনলালকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা হল। সব দরবারী মনসবদারদের মোহনলালকে সেলাম জানাতে হুকুম দেওয়া হল। অনেকে গেলেও মীরজাফর সেলাম জানাতে গেলেন না। সিরাজের অপমানজনক ব্যবহারে প্রধান প্রধান সেনাপতিদের আত্মসম্মান বজায় রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। মীরজাফর প্রকাশ্য দরবারে অপমানিত হলেন।

এইসব ঘটনার অনিবার্য প্রতিক্রিয়াতেই মীরজাফর সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রধান হয়ে উঠলেন। প্রথমে তিনি পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁকেই মসনদে বসাবার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু শওকৎ জঙ্গের নির্বুদ্ধিতায় পূর্ণিয়ার ষড়যন্ত্র দানা বাঁধল না। এদিকে ক্লাইভ এবং ওয়াটসনের কলকাতা জয়ের পর তাদের শক্তি সম্পর্কে মীরজাফরের কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি জগৎশেঠ রায়দুর্লভ প্রভৃতির সঙ্গে জোট বেঁধে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নায়ক হয়ে উঠলেন।

সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীরজাফর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৭৫৭-তে নবাব হবার পর ১৭৬০ সালে ইংরেজরা তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাঙলার নবাব করেন।

ভারতের ইতিহাসে মীরজাফর কলঙ্কিত চরিত্র হয়েই আছেন। চরিত্রহীন মাদকাসক্ত মীরজাফরকে বলা হত 'ক্লাইভের গাধা।'

ইতিহাসের এই ষড়যন্ত্রকারী চরিত্রটিকে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এবং শচীন্দ্রনাথ ঘৃণিত চরিত্র হিসেবেই এঁকেছেন। উভয়েই সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে এই মানুষটি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় উদঘাটিত করেছেন। গিরিশচন্দ্র মীরজাফরকে নিজে নবাব হবার জন্যই ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে শচীন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে আরও সক্রিয় করে তুলেছেন। তার কথাবার্তা এবং ষড়যন্ত্রের ছক রচনার কূটবুদ্ধিও দেখানো হয়েছে। এই চরিত্রটিতে খানিকটা 'ভিলেন' চরিত্রের আভাস আছে।

৩০২.২.৮.১.৪ : জগৎ শেঠ

অষ্টাদশ শতকে বাঙলার নবাবদের উত্থান পতন এবং তাঁদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা ছিলেন ধনকুবেরগণ। অপর্যাপ্ত ধনসম্পদের অধিকারী এই শেঠগণ তাঁদের অর্থের কৌলিন্যে বাঙলার শাসন ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রিত করতেন।

শেঠ সদাগরদের পূর্ব ইতিহাস হল জগৎশেঠ মহতাব রায় এবং স্বরূপ চন্দ্র ছিলেন একই পরিবারের কর্তা। মরুভূমির মারওয়াড়ের মধ্যস্থিত মরুদ্যান শহর নাগৌর। সেখান থেকে পরিবারের পূর্বপুরুষ হীরানন্দসাহ বাদশাহ শাহজাহানের সময় পাটনায় আসেন। এঁরা জাতিতে ওসওয়াল, ধর্মে জৈন। এই পরিবারের খ্যাতিমান পুত্র মহাজন শেঠ মানিক চন্দ্র, জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

দিল্লির বাদশাহ ফতেহ চন্দকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে (১৭২২-২৩) প্রদত্ত এক ফরমানে ফতেহ চন্দকে 'জগৎশেঠ', তাঁর ছেলে আনন্দ চন্দকে 'শেঠ ' উপাধি দেওয়া হয়। তারপর থেকে 'জগৎশেঠ' শেঠ পরিবারের বংশানুক্রমিক উপাধি।

মাঝে মাঝে বিবাদ হলেও ইংরেজদের সঙ্গে জগৎশেঠদের সম্পর্ক ভালোই ছিল। ইংরেজরা ভালোভাবেই জানতেন জগৎশেঠদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ইংরেজদের কাগজপত্রে ফতেহ চন্দকে The Nabab's Chief favourite বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লীর রাজদরবারে জগৎশেঠদের প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়েই চলতে থাকে। এমনকি বর্গির হাঙ্গামার সময়েও শেঠদের ব্যবসার কোনো ভাঁটা পড়েনি। কি পদমর্যাদায় কি ধনসম্পদের বা দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তিতে জগৎশেঠ ভাতৃদ্বয় ছিলেন চূড়ায়। ক্লাইভের অন্যতম সুহৃদ রবার্ট অর্মের কথায় শেঠরা তখন 'The Greatest shroff and banker in the known world'

নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে শেঠদের সম্পর্ক যে খারাপ ছিল তা নয়। নবাব ভালো করেই জানতেন শেঠদের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে রাজত্ব চালান সম্ভব নয়। আবার ইংরেজরাও বুঝেছিল শেঠদের এড়িয়ে কোনো কিছুতেই সফল হওয়া যাবে না।

শেঠদের গুরুত্ব জানা সত্ত্বেও সিরাজ হিসেবে ভুল করে বসলেন। ক্ষমতায় বসে তরুণ নবাব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পুরোনো মানী ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের অপমান করতে শুরু করলেন। শেঠরাও তাঁর লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না।

মহতাব রায় যিনি সিরাজের মাতামহকে সিংহাসনে বসাবার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তিনি আশা করেছিলেন আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজ মসদনে বসে তাঁদের পরামর্শ মতোই চলবেন। কিন্তু শেঠ মহতাবের যে আশা পূর্ণ হয়নি, বরং অস্থিরমতি সিরাজ ক্ষমতা পেয়েই উচ্চপদস্থ সম্মানীয় ব্যক্তিগণকে অপমান করতে লাগলেন। স্বয়ং মহতাবও সিরাজের হাতে অপমানিত হলেন।

সিরাজের অপমান নীরবে হজম করে নেবার লোক শেঠেরা ছিলেন না। এরপর থেকেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয় জগৎশেঠ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মঁসিয় ল তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন— "শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ই পলাশীর বিপ্লবের জন্মদাতা, তাঁদের ছাড়া ইংরেজরা কখনোই কিছু করতে পারত না।" [Mamoir by Jean Law, Chief of the French Factory at Cossimbazar. [পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ'-রজতকান্ত রায়-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

সিরাজের হাতে অপমানিত হয়ে জগৎশেঠ ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং সিরাজ তথা মুসলমান বংশ ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

৩০২.২.৮.১.৫ : রাজা রাজবল্লভ

নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রের অন্যতম যন্ত্রী ছিলেন রাজা রাজবল্লভ। ঢাকা সরকারের কৃষ্ণজীবন মজুমদার নামে এক অখ্যাত রাজকর্মচারীর পঞ্চম পুত্র রাজবল্লভ সেন। ফরাসী ভাষা জানতেন বলে তিনি পেশকারের পদ পেয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পদোন্নতি। তিনি হোসেন কুলীখানের ঢাকার নিয়ামতে কাজ করতে থাকেন, তার ফলে রাজবল্লভের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি প্রচুর বেড়ে যায়। আর এই ক্ষমতা এবং প্রভূত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি পৌরাণিক রীতি অনুসারে অগ্নিষ্টোম এবং বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তিনি বৈদ্যজাতির উপবীত ধারণ বিধি প্রবর্তন করেন। রাজবল্লভ হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত এ কাজে ব্যর্থ হন।

প্রচুর অর্থ ও প্রতিপ্রত্তি লাভ করলেও রাজবল্লভ অসৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আলিবর্দির অসুস্থতার সুযোগে তিনি রাজকোষের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন। পরে তাঁর কাছে নবাব হিসাব নিকাশ চাইলে তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ধনসম্পত্তিসহ সপরিবারে কলকাতায় আশ্রয় ভিক্ষা করেন। আলিবর্দির মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগম ক্ষমতা দখল করবে ধরে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কতৃপক্ষ রাজবল্লভের পুত্র এবং তাঁর পরিবার বর্গকে আশ্রয় দেন।

পলাশীর ষড়যন্ত্রে রাজা রাজবল্লভ প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ না করলেও গোপন সংবাদ আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। রাজা রাজবল্লভ অনেক প্রাসাদ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কীর্তিনাশার প্লাবনে সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে রাজবল্লভকে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবেই দেখিয়েছেন। রাজা যে ঘসেটি বেগমের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বস্ত ছিলেন সে কথাও নাটকে আছে।

৩০২.২.৮.১.৬ : মীরণ

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কুলাঙ্গার পুত্র মীরণ। মীরণের চরিত্র পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা এবং চরিত্রহীনতায় কলঙ্কিত। পলাশীর ষড়যন্ত্র সফল হবার পর নবাব হলেন মীরজাফর—এটি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। কিন্তু রাজ্য চালাবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাই সকলের কাছে তাঁর পরিচয় হল 'ক্লাইভের গাধা।' রাজকার্যে বীতশ্রদ্ধ মীরজাফর নেশাগ্রস্ত হয়েই দিন কাটাতেন। ফলে মীরণ সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। লোকে মীরণকে 'ছোট নবাব' বলতে লাগল। অপদার্থ মীরজাফর যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মীরণই তাঁর হয়ে রাজত্ব চালাতেন।

মীরণ ছিলেন নিষ্ঠুর বিবেকহীন মানুষ। পলাশীর ষড়যন্ত্রের সময় তিনি ষড়যন্ত্রকারী এবং ইংরেজদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে ষড়যন্ত্রকে বেশ পাকিয়ে তুলেছিলেন। মীরণের নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। বন্দি সিরাজকে হত্যার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সিরাজ নিহত হবার পর আলিবর্দি বেগম, তাঁর দুই কন্যা ঘসেটি এবং আমিনা এবং সিরাজের পত্নী এবং শিশুকন্যাকে অত্যাচারে জর্জরিত করেছেন তিনি। তাঁর হুকুমেই ঘসেটি বেগম এবং আমিনা বেগমকে জলে ডুবিয়ে মারা হয়। ডুবে মরবার আগে দুই বোন মীরণের মাথায় বজ্রাঘাতের অভিসম্পাত দেন। আশ্চর্য এই যে, শেষপর্যন্ত অভিসম্পাত আক্ষরিক অর্থেই

ফলেছিল। খোলা মাঠে তাঁবুর মধ্যে তিনি বজ্রাহত হয়ে মারা যান। মীরণের সমস্ত দুষ্কার্যের সঙ্গী ছিলেন খাদেম হোসেন খান। মীরণের মৃত্যুর পর খাদেম তরাইয়ের জঙ্গলে পালিয়ে যান।

শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে মীরণকে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপেই চিহ্নিত করেছেন। সিরাজকে হত্যার ব্যাপারেও যে তাঁর ভূমিকা ছিল নাটকে সে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

মহম্মদী বেগ

নবাব সিরাজদ্দৌলার ঘাতক— ইতিহাসে মহম্মদী বেগের এই ঘৃণিত পরিচয়। মহম্মদী বেগের মত কৃতঘ্ন চরিত্র খুবই কম দেখা যায়। সে একসময় সিরাজের পিতার স্নেহের পাত্র ছিল। প্রচুর অর্থব্যয় করে মহম্মদী বেগের বিয়েও দিয়েছিলেন তিনি। পিতার স্নেহের এবং উপকারের প্রতিদান সে দিয়েছিল সিরাজকে হত্যা করে। তার তলোয়ারের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় সিরাজের দেহ। মীরণের হুকুমে জল্লাদ মহম্মদী বেগ সিরাজকে শেষ বারের মত নমাজ পড়বার সুযোগও দেয়নি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সিরাজ আর্তনাদ করে বলে ওঠেন—'হয়েছে আর নয়-খতম হলাম হোসেন কুলীখাঁর খুনের বদলা।'

৩০২.২.৮.১.৭ : ক্লাইভ

বাঙলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রধান নায়ক কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫- ১৭৭৪)। 'ব্যারন অফ পলাশী' ক্লাইভ ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

ক্লাইভের প্রথম জীবনের ইতিহাস আদৌ গৌরবের নয়। তখন ক্লাইভের মত অপদার্থ ছেলেদেরই ভারতে পাঠানো হত। ভাগ্যান্বেষণেই ক্লাইভ ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে কিছুই করে উঠতে পারেনি। এমনকি একসময় আত্মহত্যা করবার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। যদিও সে যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। পরে ফরাসীদের সঙ্গে এবং মারাঠা জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি। এই সাফল্যের জন্যই তিনি 'কর্নেল' উপাধি পান। ক্লাইভের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে কলকাতার বিপদগ্রস্থ ইংরেজদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়। কলকাতায় এসেই তিনি কর্মদক্ষতা দেখাতে থাকেন। ক্লাইভ একদিকে যেমন ছিলেন বীর, সাহসী অন্যদিকে তেমনি ছিলেন চতুর এবং কূটকৌশলী। তিনি কলকাতায় এসে সিরাজদ্দৌলার হাত থেকে ফোর্টউইলিয়ম দুর্গটি পুনর্দখল করেন।

পলাশীর ষড়যন্ত্রের ইংরেজ পক্ষের প্রধান নায়ক ছিলেন তিনি। সিরাজের প্রতি তাঁর অমাত্য এবং আত্মীয়স্বজনের অসন্তুষ্টির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন তিনি। এই সব লোভী স্বার্থপর দুর্বলচিত্ত মানুষগুলিকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। আর সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে এদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্লাইভ ছিলেন শঠতার প্রতিমূর্তি। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর অনেককেই তার প্রতিশ্রুতি মতো প্রাপ্যে থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। চন্দননগর জয় করার পর তিনি হয়েছিলেন পলাশীর যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। ক্লাইভের সাফল্যের পিছনে ছিল ধূর্ততা, মিথ্যাচার এবং জালিয়াতি। কিন্তু এই মানুষটির জীবনে যথেষ্ট সাফল্য এলেও তাঁর জীবনের পরিণতি ঘটেছে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে।

১৭৬০ সালে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। এরপর আবার ১৭৬৪তে তিনি ভারতে আসেন। এই সময় তিনি কোম্পানির সর্বেসর্বা-প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে

অভিযোগ উঠতে শুরু হয় পার্লামেন্টে। অনেক জলঘোলার পর সে যাত্রা এই সব অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পান এবং নির্দোষ প্রমাণিত হন।

কিন্তু এই অপমানের জ্বালা তিনি সহ্য করতে পারেননি। ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর 'ব্যারণ অব পলাশী' কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয়বারের চেষ্টায় তিনি আত্মহত্যায় সফল হন।

ক্লাইভের কর্মময়, বর্ণময় জীবনের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানকেই মনে করিয়ে দেয়।

৩০২.২.৮.১.৮ : আলেয়া

আলেয়া নাট্যকারের মানসকন্যা। ইতিহাসের পাতায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই অনৈতিহাসিক চরিত্রটির ভূমিকা নাটকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনা গ্রন্থনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা এবং নিপুনতা নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই নাট্যকার নাটকে তাঁর বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেন। আলেয়া চরিত্রটির সার্থক রূপায়ন সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'আলেয়া' চরিত্রটির এই নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ। আলেয়া অধরা আলোর (অভিধানিক অর্থে বিভ্রান্তিকর প্রহেলিকা)। আলেয়ার মায়াময় রূপ ও দ্যুতিতে সৃষ্টি হয় মায়াজালের। নাটকে আলেয়া চরিত্রটির ভূমিকাটিও মায়াবী। রূপ আর ব্যক্তিত্বের বর্ণময় উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে সেই হয়েছে নাটকের প্রধান আকর্ষণ। স্বদেশাত্মার প্রতিভূ সে—বাঙালার স্বদেশপ্রেমী নবাব সিরাজদ্দৌলার মঙ্গল সাধনে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মায়াময় আলোকবৃত্তের প্রহেলিকায় সে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রীদের চক্রান্তের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে।

গোলাম হোসেন খাঁন প্রণীত Seir Mutaqherin (মুতাক্ষরীন) গ্রন্থের হাজী মুস্তাফাকৃত অনুবাদের পাটটীকায় জানা যায়, সিরাজদ্দৌলাকে নিজের পরমাসুন্দরী স্বচ্ছগ্রীবা ক্ষীণতটী ভগিনীকে উপহার দিয়ে কাশ্মিরী মোহনলাল স্বীয় পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। আলেয়া চরিত্রটির পরিকল্পনায় এই সুন্দরী মোহনলালের ভগিনীর ছায়া থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নাটকে আলেয়াকে মোহনলালের ভগিনী হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবাবের আপনজন যাঁরা, প্রিয় অমাত্য যাঁরা, তারাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং এই স্বার্থপর মানুষগুলির বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সিরাজকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ষড়যন্ত্রের বিষবাস্পে বিষাক্ত পরিবেশে তার জীবনের চরম দুর্দিনে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁর পাশে ছিল আলেয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। নাটকে আলেয়া এবং গোলাম হোসেন পরস্পরের পরিপূরক। এই দুটি নরনারী দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য সিরাজের মঙ্গল কামনা করেছে এবং তাঁকে অনিবার্যে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে।

বিষাদাচ্ছন্ন জীবন আলেয়ার। সে দিয়েছে অনেক, পায়নি কিছুই। এই নারীটির জন্মলগ্নেই বিধাতা তার ভাগ্যে দুঃখের মসীলেখা এঁকে দিয়েছিলেন। নবাবের সঙ্গে কথোপকথনে তার ভাগ্যবিড়ম্বনা এবং লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত জানা যায়। জানা যায় সে সিরাজের একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপ্রধান মোহনলালের ভগিনী।

তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডির সূচনা যৌবনেই। এই সময় পর্তুগীজরা তাকে অপহরণ করে। বুদ্ধি এবং তৎপরতায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলেও সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি। অসহায় এই নারী স্বদেশ এবং স্বজাতির মঙ্গলের জন্য দূরুহ কাজে ব্রতী হয়েছে। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ সিরাজের মঙ্গলসাধন। কারণ সিরাজ দেশপ্রেমিক স্বাধীন বাঙলার প্রতিনিধি।

নাটকের প্রথম দৃশ্যই আলেয়ার উপস্থিতি। সুকৌশলে সে নবাবের হাবেমে প্রবেশ করেছে। আলোয়ার উপস্থিতি সিরাজকে বিভ্রান্ত করেছে। গুপ্তচর বলেই সন্দেহ করেছেন তাকে। গুপ্তচরের কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

কিন্তু নবাবের প্রচণ্ড ক্রোধ এবং অপমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলেয়া অকুতভয়।

সিরাজের সংবেদনশীল হৃদয় বেদনার প্রকাশ ঘটেছে আলেয়ার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক আলাপচারিতায়। শুধু তাই নয় তাঁর চরিত্রের অপবাদ ও কলঙ্কের স্খালন করতে চেয়েছেন এই মোহিনী নারীটির কাছে। তাই সিরাজ চরিত্রটি সম্যক পরিচিতির জন্য আলেয়া চরিত্রটির একান্ত প্রয়োজন। নারীঘটিত অপবাদে সিরাজের অস্তিত্ব বিপন্ন। নায়ক হিসেবে, দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর গৌরবজন প্রতিষ্ঠার জন্য এই অপবাদকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আলেয়া সিরাজের বিরুদ্ধে এই অপবাদ বিশ্বাস করে না তাই সে বলেছে—

'আলেয়া। ঐ সিংহাসনের উপর লোভ রয়েছে অনেকের। কিন্তু শক্তির পরিচয় দিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার সাহস যাদের নেই, তারাই প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্য এই কুৎসা রটায়'।

নবাব হিসেবে সিরাজের সীমাবদ্ধতা প্রচুর। তাঁর আন্তর বেদনা প্রকাশের কোনো সুযোগই নেই। আলেয়ার সান্নিধ্যে নবাব তাঁর ব্যক্তি অনুভবকে উজাড় করে দিয়েছেন—

'কলঙ্ক কালিমায় নাম পরিচয় সবই ঢাকা পড়েছে। বেঁচে থাকবার একটু গৌরববোধ এখনও অবশিষ্ট আছে। গুপ্তচরের কলঙ্ক দিয়ে তাও নষ্ট করে দেবেন না জাঁহাপনা।'

মোহনলাল এবং সিরাজের সংলাপের পর আলেয়ার প্রকৃত পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। অনুতপ্ত সিরাজ তাই বলেছেন—'তোমাদের নবাবকে ক্ষমা করো সুন্দরী।' গোলাম হোসেনের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। সে বলেছে—'চেয়ে দেখুনত জনাব, এই আগুনের শিখা একি কলঙ্কের পরশে কালো হতে পারে।'

প্রাসাদের বাইরে নবাবের হিতৈষী যে সামান্য কয়েকটি নরনারী ছিল আলেয়া তাদেরই একজন। নবাবের ভুল ভাঙানোর পর আলেয়াই তার পরম সহায়, পরম হিতার্থী। শত্রুপক্ষের অভিসন্ধি এবং ষড়যন্ত্রের গোপন খবর জানবার জন্য নর্তকী হয়ে সে কাশিম বাজার কুঠির মন্ত্রনা কক্ষে উপস্থিত। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ ওয়াটসের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতেও সে দ্বিধা করেনি। খোজা পিদ্রুর গোপন চিঠিটি সেই তুলে দিয়েছে নবাবের হাতে। এইভাবে সিরাজদ্দৌলার চরম সঙ্কটের দিনে নিজের সমস্ত ভয় এবং লাঞ্ছনার কথা ভুলে নবাব তথা দেশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছে আলেয়া। যুদ্ধের চরম মুহূর্তেও আলেয়া নবাবের পাশে থেকেছে। যথোচিত পরামর্শ দিয়েছে তাঁকে। তবু শেষরক্ষা হয়নি।

সিরাজের অতি সারল্যের মাশুল দিতে হয়েছে প্রাণ দিয়ে। ধীরে ধীরে নবাবের প্রতি গভীর আবেগ এবং গোপন দুর্বলতা সঞ্চারিত হয়েছে আলেয়ার হৃদয়ে। নবাবের সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় তার হৃদয়াবেগ উদবেলিত হয়েছে। আলেয়া বলেছে—'নিজেকে বুঝি আর সামলাতে পারি না জাঁহাপনা।' আবেগ জর্জরিত হয়ে সে বলেছে- 'বড় কষ্ট হচ্ছে জাঁহাপনা আমাকে একটু কালের জন্য অবসর দিন। আমি নিজেকে সুস্থ করে ফিরে আসি।'

আলেয়ার জীবনে আবার কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়েছে যুদ্ধে পরাজয়ের পর। কঠিন পীড়নে জর্জরিত হতে হয়েছে তাকে। তার সামনে এসেছে লোভ প্রলোভন। তবু সমস্ত অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে সে অটল থেকেছে।

মীরণ তাকে প্রলুব্ধ করেছে। বলেছে—'তাহলে আমার সঙ্গে ঝুলে পড়-আমি তোমাকে নতুন জগতে নিয়ে যাবো।'

মীরণ সিরাজের মর্মান্তিক পরিণতির কথাও শোনাতে ভোলেনি। মীরণ বলেছে—'শুনে রাখ সুন্দরী, পলাশীতেই সিরাজের সমাধি।'

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করেছেন সিরাজ। এই সময় মীরণের হাতে বন্দি হয়েছে আলেয়া, সিরাজের গন্তব্যস্থল জানবার জন্য তার ওপর চলে বর্বরোচিত অত্যাচার। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সিরাজকে নিরাপদে রাখতে চেয়েছে সে। চতুরতার সঙ্গেই সে সিরাজের গন্তব্যস্থলটি গোপন রেখেছে। বরং সে ভুল সংবাদ দিয়ে মীরণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। বলেছে— 'ঘসেটি বেগমের মহলে যাও। সন্ধান পাবে তাদের।'

আলেয়ার অজেয় মানসিক শক্তির পরিচয় মেলে তার নির্ভয় সংলাপে।

গোলাম হোসেন। আলেয়া আর কতদিন এ পীড়ন সইবে তুমি।

আলেয়া। যতদিন না জানব নবাব নিরাপদ।

দেশপ্রেম আলেয়ার জীবনের প্রধান উপাদান হলেও ব্যক্তিপ্রেমের অনুভবের মধ্যে দিয়ে চরিত্রটি মানবিক গুণে অভিষিক্ত হয়েছে। গোলাম হোসেনের (পুরন্দর) প্রতি তার ভালোবাসা অব্যক্তই থেকে গিয়েছে। আলেয়া প্রথমেই ছদ্মবেশী পুরন্দরকে চিনতে পেরেছিল। আলেয়াই কেবল গোলাম হোসেনকে পুরন্দর বলে সংম্বোধন করেছে। নাটকের শেষে সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্যে আলেয়া তার গোপন হৃদয় বেদনার কথা প্রকাশ করেছে। গোলাম হোসেনকে সে বলেছে—'তাহলে ভালো তুমিও বেসেচ?'

আলেয়া চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তার গানে। তার গাওয়া গানগুলি নাটকের সম্পদ। একদিকে গানের মধ্যে দিয়েই সে তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছে আবার গানের মাদকতায় আচ্ছন্ন করে সে শত্রুপক্ষের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের গানটি তাৎপর্যপূর্ণ। সে গেয়েছে—'পলাশী! হায় পলাশী। নাটকের মর্মবাণী গানটিকে ধ্বনিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের এবং স্বদেশ প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা নিয়েই তার ট্র্যাজেডি। দুঃখ আর মর্মপীড়ায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে আলেয়া স্বদেশের ঋণশোধ করেছে।

৩০২.২.৮.৯ : লুৎফউন্নিসা বা লুৎফুন্নেসা

নবাব সিরাজদ্দৌলার পত্নী হিসেবে পরিচিত হলেও লুৎফুন্নেসা তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না। সিরাজের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন মীর্জা ইরাজ খান নামে এক উচ্চবংশীয় মোগল রাজপুরুষের কন্যা। সিরাজ শ্বশুর এবং স্ত্রীর দ্বারা পরিত্যক্ত হন। সিরাজের স্ত্রীর নাম ছিল ওসদাৎউন্নেসা। পরে সম্ভবত লুৎফুন্নেসাকে সিরাজ বিবাহ করেছিলেন। এছাড়াও ফৈজী এবং মোহনলালের ভগ্নীও সিরাজের স্ত্রী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে এঁরা হয়তো কেউ সিরাজের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না।

বেভারিজের মতে লুৎফুন্নেসা এবং উমদাৎউন্নেসা একই ব্যক্তি ছিলেন। যাইহোক সিরাজের যে একাধিক পত্নী এবং উপপত্নী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সিরাজের জীবনে একাধিক নারী এলেও লুৎফুন্নেসাই যে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা স্বীকৃত। তিনিই ছিলেন নবাবের প্রিয়তমা পত্নী (লুৎফ-ভালবাসা নেসা-স্ত্রী। লুৎফউন্নিসা-প্রিয়তমা স্ত্রী) ইতিহাসে বলা হয়েছে-'লুৎফ কোনো উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাল্যকাল হইতে ক্রীতদাসী রূপে নবাব আলিবর্দির সংসারে প্রবিষ্ট হন।'

[মুতাক্ষরিনে লুৎফুন্নেসাকে সিরাজের 'জরিয়া' বলা হয়েছে। জরিয়া বলতে নিচ ক্রীতদাসী বোঝায় না। কালক্রমে এঁরাই ভার্যার গৌরব লাভ করতেন।]

লুৎফুন্নেসা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। বেভারিজ বলেছেন— 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লুৎফা তাঁহার অপূর্বরূপের ছটায় যুবরাজ সিরাজের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন।' সিরাজ একাধিক রমণীর সঙ্গ লাভ করলেও তাঁকেই সর্বাধিক ভালবাসতেন।

১৭৯০ সালে লুৎফুন্নেসার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তান জীবিত ছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ইতিহাসকে অনুসরণ করেই লুৎফুন্নেসা চরিত্রটি অঙ্কিত করেছেন। নাটকেও তাঁর চরিত্রটি প্রেমে উজ্জ্বল।

৩০২.২.৮.১০ : ঘসেটি বেগম

নবাব আলিবর্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগমের জীবন আদৌ সুখের ছিল না। ঘসেটি বেগম তাঁর প্রকৃত নাম নয়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মেহেরউন্নিসা। কিন্তু ইতিহাসে তিনি ঘসেটি বেগম নামেই পরিচিত। জীবনের একটি পর্বে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। কিন্তু তার আগে তাঁর জীবনে একাধিক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

আলিবর্দির বড় ভাই হাজী আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নওয়াজিশ ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা। আলিবর্দির পরে তিনিই ছিলেন সিংহাসনের দাবিদার। কিন্তু আলিবর্দির জীবদ্দশাতেই নওয়াজিশের মৃত্যু হয়। নওয়াজিশ এবং ঘসেটির দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। তাঁদের কোনো সন্ত্রানাদিও হয়নি। নওয়াজিশের অধীনস্থ রাজ পুরুষদের অন্যতম ছিলেন হোসেন কুলী খান এবং রাজা রাজবল্লভ। হোসেন কুলীর সঙ্গে ঘসেটির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। আর সে জন্য নওয়াজিশ খাঁ হোসেন কুলীর উপর যথেষ্ট চটেছিলেন। এদিকে পরবর্তীকালে ঘসেটি বেগমও হোসেন কুলীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ হোসেন কুলী ঘসেটিকে ছেড়ে তার বোন আমিনার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এদিকে পারিবারিক

সম্মানহানিতে ক্ষুব্ধ আলিবর্দি হোসেন কুলীর গর্দান চাইলেন এবং শেষপর্যন্ত সিরাজই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগম স্বামীর প্রিয় পাত্র রাজা রাজবল্লভের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন এবং সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে অন্যতমা নায়িকা হয়ে উঠলেন। মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং ঘসেটি বেগম এই ত্রয়ী মিলে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটিকে তো মজবুত করে তুললেন। এই পরিস্থিতিতে আলিবর্দি মীরজাফরকে কোরান হাতে শপথ করিয়ে নিলেন শত্রুর হাত থেকে সিরাজকে তিনি রক্ষা করবেন। মীরজাফরের ভিন্ন চিন্তা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ঘসেটি বেগম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। সেইজন্যই এই শপথ নিয়েছিলেন তিনি। এই ষড়যন্ত্রে ঘসেটি বেগম যদি সেদিন সফল হতেন তা হলে নওয়াজিশের পালিত শিশু পৌত্রকে (এই শিশু সিরাজের ছোট ভাইয়ের ছেলে) মসনদে বসিয়ে মীর নজরআলি রাজত্ব করতেন। কিন্তু বেগমেরে সে চেষ্টা সফল হয়নি মীরজাফরের কূট কৌশলে।

পলাশীর যুদ্ধে ষড়যন্ত্রীরা সফল হলেও ঘসেটি বেগমের আখেরে কিছুই জুটল না। বরং মর্মান্তিক পরিণতি হল ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম মীরণ তাঁকে মাঝনদীতে ডুবিয়ে মেরে ফেলেন।

নাটকে ইতিহাস নির্ভর ঘসেটি বেগমের পরিচয়টি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। তিনি যে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম ছিলেন নাটকে তাও দেখানো হয়েছে। ঘসেটি বেগমের বন্দি হবার ঘটনাটিও নাটকে স্থান পেয়েছে।

৩০২.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গোলাম হোসেন ও আলেয়া অনৈতিহাসিক হলেও নাটকে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন? আলোচনা করো।

২। সিরাজদ্দৌলা নাটকের অন্তিম দৃশ্যে জনতার দরবারে সিরাজের উপস্থিত ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে এক উচ্চতর জগতে সিরাজকে মুক্তি দিয়েছে। এই শেষ দৃশ্যটি নাটকের মূল ভাবনার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ?

৩। পাঠ্য 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অন্তিম দৃশ্য অবলম্বনে সিরাজের ভূমিকা কতটা স্বাভাবিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ তা আলোচনা করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করো।

৩০২.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ক্ষীতিশ বংশাবলীচরিত — দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায়।

২। সিরাজদ্দৌলা — নিখিলনাথ রায়।

৩। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

৫। শচীন সেনগুপ্ত — ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

৬। বাংলা নাটক ও নাট্যশালা — শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

৭। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা — মন্মথ রায়।

৮। The Bengali Drama — its origin and devolepment — Dr. P. Guha Thakurata.

৯। পলাশির যুদ্ধ — নবীন চন্দ্র সেন।

১০। বাংলা নাটকের পুনর্বিচার — ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ — রজতকান্ত রায়।

১২। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা — (সম্পাদনা — ক্ষেত্র গুপ্ত)

১৩। সিরাজদ্দৌলা — (সম্পাদনা — স্মরণ আচার্য)

১৪। সিরাজদ্দৌলা ঃ গিরিশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথ — অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

গণনাট্যের শর্ত ও দেবীগর্জন

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.৯.১ : বাংলা নাট্যসাহিত্য ও বিজন ভট্টাচার্য

৩০২.৩.৯.২ : বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও নাট্যাভিনয়ে বিজন ভট্টাচার্যের অভিনবত্ব

৩০২.৩.৯.৩ : গণনাট্যের উদ্ভব-বিকাশ : গণনাট্যের শর্ত

৩০২.৩.৯.৪ : 'দেবীগর্জন' কি গণনাট্য?

৩০২.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৩.৯.১ : বাংলা নাট্যসাহিত্য ও বিজন ভট্টাচার্য

অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা নাটক ও নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার বিভক্তিকরণ, প্রবল উদ্বাস্তুস্রোত, ভারতবর্ষে জমিদার-আইন চালুর পর নবজাত জোতদার-মহাজনদের শোষণ, নাট্যকারদের প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের আগে পর্যন্ত, বাঙালি নাট্যকাররা যে বিষয়গুলি নিয়ে নাটক লিখছিলেন, চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। স্বভাবতই আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়। একথা ঠিক দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'রথের রশি', 'রক্তকরবী', দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কৃষক-আন্দোলন, ধর্মীয় মৌলবাদ, শ্রেণীশোষণ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ এসেছিল এবং গণনাট্যকার ও গণনাট্যের শিল্পীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা মনেও রেখেছিলেন। তবু গণনাট্য সংঘ তার বিভিন্ন সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার উপর দাঁড়িয়েই বিজন-তুলসী-সলিল সেনরা গণমুখী নাটক রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ যদিও বলেন, পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই গণনাট্যের উপর স্বাধীন দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আক্রমণের ফলে অন্য অনেকের মতো গণনাট্যের অন্যতম স্থপতি বিজন ভট্টাচার্যও গণনাট্যের আওতা

ছেড়ে নতুন থিয়েটার গড়েছিলেন কিন্তু আমরা মনে করি আমৃত্যু রচিত তাঁর নাটকে গণনাট্যের আদর্শ ও লক্ষ্যই অনুসৃত হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কলকাতা এবং গ্রাম বাংলার শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেভাবে নাট্যচরিত্র সৃষ্টিতে, সংলাপ যোজনায়, সঙ্গীত প্রয়োগে তাঁকে সাহায্য করেছে, তাঁর পূর্বে আর কোনো বাঙালী নাট্যকারকে তা করেনি। আজন্ম পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বললেও পশ্চিমবঙ্গের নানা আঞ্চলিক উপভাষা তাঁর নাটকে উঠে এসেছে তা বিস্ময়কর। এ কথা ঠিক, মূলত দীনবন্ধুর নাটক 'নীলদর্পণ'-ই বাংলায় প্রথম কৃষক-জীবন নির্ভর নাটক এবং সে কারণেই গণনাট্যকারদের কাছে দিকনির্দেশক। তবে নীলদর্পণে টুকরো টুকরো প্রতিবাদের ছবি তোরাপ ও নবীনমাধবের মধ্যে পাওয়া গেলেও বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জনে' সংঘবদ্ধ কৃষকের প্রতিবাদ প্রথম পাওয়া যায়। বিজন ভট্টাচার্যের জীবনও নাটকীয়তায় পূর্ণ। ফরিদপুরের মায়া কাটিয়ে ১৯৩০-এ কলকাতার কলেজে পড়াশুনো। ঐ সময়ই ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী। ১৯৩৮-এ আনন্দবাজারে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু। ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আমেদের প্রেরণায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। ঐ বছরই তাঁর প্রথম একাঙ্ক - 'আগুন' ছাপা হয়। 'অরণি' পত্রিকায় তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন' ধারাবাহিক বার হয়ে ১৯৪৪-এ গ্রন্থাকারে বার হয়। ঐ বছরই আনন্দবাজারের চাকরি ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার হন।

বিচিত্র জীবন বিজন ভট্টাচার্যের। ১৯৪৮-এ গণনাট্য সংঘের সংস্রব ত্যাগ এবং ১৯৫০-এ 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা।

১৯৫০-এ কলঙ্ক নাটক লিখলেন এবং পরের বছরই নেতাজী সুভাষ ইনস্টিট্যুট-এ তার প্রযোজনা করলেন। এই নাটকটিই পরে, অনেক পরিবর্তন নিয়ে, 'দেবীগর্জন' নাটকের রূপ পায়। 'দেবীগর্জন' নাটকের শেষ দৃশ্যে তাঁর চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৫২-তে জীবিকার জন্য বিজন বোম্বাই পাড়ি দেন এবং 'নাগিন' ছায়াছবির Script রচনা করেন। ১৯৬৯-এ ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'; ১৯৬০-এ 'মেঘে ঢাকা তারা'য়, ১৯৬১ তে 'কোমল গান্ধার', ১৯৬৫-তে 'সুবর্ণরেখা'য় অভিনয় করে সিনেমা-অভিনয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান।

লক্ষণীয় সিনেমার পাশাপাশি তাঁর নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয় ধারাবাহিক চলছিল। আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাট্যতালিকা তুলে ধরেছি যাতে এই সমান্তরাল দুটি শিল্পধারায় তাঁর সাফল্য বোঝা যায়।

নাটকের নাম	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ	গ্রন্থপ্রকাশ
১ আগুন	মে, ১৯৪৩	নাট্যভারতী	অপ্রকাশিত
২ জবানবন্দী	৩ জানুয়ারি, ১৯৪৪	স্টার থিয়েটার	১৯৬২
৩ নবান্ন	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪	শ্রীরঙ্গম	১৯৪৪
৪ জীয়নকন্যা	১৯৪৭	রঙমহল	১৯৪৮

৫	মরাচাঁদ	১৯৫২	ই বি আর ইনস্টিটিউট	অপ্রকাশিত
৬	কলঙ্ক	১৯৫১	” ”	”
৭	জননেতা	অনভিনীত		”
৮	গোত্রান্তর	১৬ আগস্ট, ১৯৫৯	নিউ এম্পায়ার	১৯৫৯
৯	মরাচাঁদ (পূর্ণাঙ্গ)	৩১ মার্চ, ১৯৬১	” ”	১৯৬৮
১০	ছায়াপথ	১১ অক্টোবর, ১৯৬১	মিনার্ভা থিয়েটার	১৯৬২
১১	মাষ্টারমশাই	১৯৬১	পার্কসার্কাস রবীন্দ্র-শতবর্ষ মঞ্চ	অপ্রকাশিত
১২	জতুগৃহ	অনভিনীত		
১৩	দেবীগর্জন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬	ওয়েলিংটন স্কোয়ার	১৯৬৯
	নাটকের নাম	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ	গ্রন্থপ্রকাশ
১৪	কৃষ্ণপক্ষ	১২ জানুয়ারি, ১৯৭৫	রবীন্দ্র সদন	অপ্রকাশিত
১৫	ধর্মগোলা	১৯৬৭		”
১৬	সাগ্নিক	অনভিনীত		”
১৭	গর্ভবতী জননী	মে, ১৯৬৯	মুক্তাঙ্গন	১৯৭১
১৮	স্বর্ণকুম্ভ	অনভিনীত		অপ্রকাশিত
১৯	আজ বসন্ত	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২	আকাদেমি	”
২০	লাস ঘুইর‍্যা যাউক	১৯৭০		”
২১	সোনার বাংলা	১৯৭১	ইডেন গার্ডেন	”
২২	গুপ্তধন	অনভিনীত		”
২৩	চলো সাগরে	৩০ মার্চ, ১৯৭৭	তপন থিয়েটার	১৯৭২
২৪	চুল্লী	অনভিনীত		অপ্রকাশিত
২৫	হাঁসখালির হাঁস	”		

‘দেবীগর্জনে’র ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রথম অভিনয় ১৯৬৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বিজন ভট্টাচার্যের নির্দেশনা, সুরযোজনা এবং প্রভঞ্জন চরিত্র অভিনয়ে প্রথমদিনই সাফল্য আসে। তিনবছর পরে রবীন্দ্র লাইব্রেরী নাটকটি গ্রন্থাকারে বার করে।

৩০২.৩.৯.২ : বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও নাট্যাভিনয়ে বিজন ভট্টাচার্যের অভিনবত্ব

ক- তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, কলকাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যদি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা না যায় তাহলে প্রগতি আন্দোলন পূর্ণতা পায় না। কিন্তু গণনাট্যের সঙ্গে সম্পর্কছেদের ফলে তাঁর উদ্যোগ মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়েছে। 'কবচকুণ্ডল' নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা (১৯৭০) এবং 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক', 'চলো সাগরে', এবং 'হাঁসখালির হাঁস' - এ তাঁর লক্ষ্যচ্যুতি ঘটেছে। তবু সামগ্রিকতার বিচারে তিনি প্রগতি নাট্যকার হিসেবে প্রথম সারির নাট্যকার। উৎপল দত্তের নাট্যধারাতেও একদা এই ত্রুটি ঘটলেও বিজনের মত তিনিও প্রবাদপ্রতিম প্রগতিশীল নাট্যকার ও অভিনেতা।

খ - বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যশৈলীও একান্তই তাঁর নিজস্ব। 'কলঙ্ক' নাটকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদল সাঁওতাল কন্যাকে যে শ্বেতসন্তান উপহার দেয় তার উপস্থাপনা বিচিত্র। 'দেবীগর্জনে' রত্নার উপর প্রভঞ্জনের ধর্ষণের দৃশ্য, প্রভঞ্জন ও ত্রিভূবনের দাবা খেলার দৃশ্য এবং নাট্যশেষে মাতৃকাশক্তি আবির্ভাবের ছায়াদৃশ্য অসাধারণ। 'স্বর্ণকুম্ভ' নাটকে সংকেতের ব্যবহার।

গ - নাটকে লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া ও লোকাচারের চমৎকার প্রয়োগ দেখি 'দেবীগর্জনে'। বিজন নিজে গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন এবং গেয়েছেন। 'কৃষ্ণপক্ষ' নাটকে চর্যাপদের একটি গান তুলে ধরেছেন। 'জীয়নকন্যা'য় এনেছেন দাঙ্গাবিরোধী গান। দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ তাঁর নাট্যসঙ্গীতের প্রাণ।

ঘ - 'নবান্ন' থেকে 'দেবীগর্জনে' পৌঁছতে নাট্যকারকে অনেকটা পথ পার হতে হয়েছে। দুটোই কৃষক জীবনের মর্মবাণী। ফলে দুটো নাটকের মধ্যে তুলনা অবশ্যম্ভাবী। যদিও 'নবান্ন' স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে এবং 'দেবীগর্জন' স্বাধীনতার দু-দশক পরে লেখা, কিন্তু শাসক বদল হলেও শোষণের অবসান হয়নি। তবে এই কাল পরিবর্তনে কৃষকের প্রতিরোধের শক্তি বেড়েছে।

গণনাট্যের কোনও নাটকেই ব্যক্তিচরিত্র শ্রেণীসংগ্রামের পূর্ণ নেতৃত্ব দেয় না। নাট্যপ্লটের বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণীনেতৃত্ব গড়ে ওঠে। হয়তো তার সামনের সারিতে দু-একটি বিকশিত চরিত্র এগিয়ে আসতে পারে, যেমন 'নবান্ন'-তে অগ্রণী চরিত্র, প্রতিবাদী চরিত্র নিরঞ্জন, কুঞ্জ, রাধিকা। প্রমাণ, হারু-কালীধনের বিরুদ্ধে নিরঞ্জন প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়িয়েছিল। কুঞ্জ সংসারের সকলের প্রতি যেমন কর্তব্যপরায়ণ তেমনি দয়ালকে সে সংসারের শেষ সম্বল দু সের চাল নির্দ্বিধায় তুলে দেয়। আবার কলকাতার ফুটপাথে আশ্রয় নেওয়া খুড়ো, রাধিকা, পঞ্চাননী, বিনোদিনী — সবাইকে সে আগলে রাখে। তাই তার প্রতিবাদী শক্তিকে নাট্যশেষে নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল।

নিরঞ্জন এবং কুঞ্জ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে শ্রেণী সংগ্রামের শিক্ষা প্রাথমিক ভাবে হলেও, লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পাঠ দয়াল কোথা থেকে পাবে ? কাজেই প্রথমাংশের নিষ্ক্রিয় চরিত্র দ্বিতীয়াংশে যখন হঠাৎ আমিনপুর গ্রামের শোষিত মানুষের নেতা বনে গেল, তখন ঘটনাটা নাটকীয় হলেও অবিশ্বাস্য। সে এখন হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্বের রূপকার, পরবর্তীকালে 'দেবীগর্জনে' যে ধর্মগোলার পরিচয় পাই, 'নবান্ন'-তে বিজনবাবু তার সূচনা দেখিয়েছেন

দয়ালের নেতৃত্বে ধর্মগোলায় কৃষকের ধান মজুতের দৃশ্যে। সর্বোপরি একদিকে নবান্ন উৎসবের পরিকল্পনা, অন্যদিকে নাট্যশেষে প্রতিরোধের অবিনাশী শপথ — এ দুয়েরই দাবিদার হল দয়াল। নাটকের ঘটনার কার্য-কারণ সূত্র, নাট্যচরিত্রের গতিময়তা — কোনও দিক থেকেই কিন্তু নাট্যকার দয়াল চরিত্রকে কেন্দ্রে এনে সফল হয়নি। তাই গণনাট্যে থেকেও গণনাট্যীয় গোষ্ঠীনায়কের দেখা মিলল না 'নবান্ন'-তে, অথচ 'দেবীগর্জন' লেখার সময় বিজন গণনাট্যের আওতায় না থেকেও গণনাট্যের আইনানুগ শ্রেণীনায়কের সফল রূপ দিলেন। মংলা প্রথম থেকেই নিরঞ্জনের মতো জোতদার মজুতদারের বিরুদ্ধে লড়েছে। তার কয়েকটি উক্তি প্রমাণ করে অন্যান্য কৃষক — খগেশ্বর, লক্ষ্মণ, ভাল্লু, গুণাই-এর চেয়েও পরিণত বুদ্ধির অধিকারী ঃ

১. মংলা ।। (গর্জে ওঠে) বেআইনি সুদ দিব নাই। নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোপ!

২. মংলা ।। কে রাজা, কার রাজ্য?

৩. মংলা ।। খুলি দাও ধর্মগোলা।

মংলার হাতে টাঙি ধরিয়ে দেয় ঘুগর‍্যা। সে প্রথম যোদ্ধা। কিন্তু নাট্যকার দেখালেন ঃ

অ. প্রভঞ্জনের পালাবার সুযোগ নেই কেননা বল্লম হাতে সবদিকে জনতার কঠিন পাহারা

আ. জনতা ধর্মগোলা অবরোধ করে

ই. মংলার সঙ্গে আশেপাশের কৃষকদের 'সমস্ত অস্ত্রগুলিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে লক্ষ করে।'

অর্থাৎ 'নবান্ন'-র শেষের জোর প্রতিরোধের শপথ ছিল আর 'দেবীগর্জনে' প্রতিরোধ কার্যকর হ'ল। প্রথাসিদ্ধ এক নায়কের পরিবর্তে সম্মিলিত গণশক্তির প্রয়োজনীয়তার তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই বিজন ভট্টাচার্যের অভিনবত্ব। এ নাটক নায়কহীন (No Hero), কৃষক সমাজ এখানে সম্মিলিত শ্রেণী নায়ক।

৩০২.৩.৯.৩ : গণনাট্যের উদ্ভব-বিকাশ : গণনাট্যের শর্ত

১৮৫২ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত বাংলা নাটকে সংস্কৃত-গ্রীক-ফারসী-ইংরাজী প্রভৃতি দেশ বিদেশের নাটকের অজস্র অনুবাদ হয়েছে, পাশ্চাত্য ট্রাজেডি, কমেডি-ফার্সের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে, নাট্যাভিনয়ে নতুন নতুন আঙ্গিকের প্রয়োগও হয়েছে কিন্তু নিপীড়িত জনতার কণ্ঠস্বর পুরোপুরি কোনো নাটকে ছিল না। কোনো নাট্যকারই জনগণের সংগ্রামের সাথী হতে পারেননি।

গণনাট্যের নাট্যকারদের কলমে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্র যে জীবন্ত হতে পারল তার পিছনে তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সাহায্য করেছিল। ঐ সময়কালের ইতিহাস না জানলে গণনাট্যগুলির সাফল্যের কারণ বোঝা যাবে না।

বিশের শতকের তিরিশের দশকে সরকারের চরম পরাজয়ের ছবিটি দৃশ্যগ্রাহ্য হচ্ছিল। ঐ সময় কেবল নাট্যনিয়ন্ত্রণই নয়, সর্বরকমে জনতার ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রণই শাসকের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৬-এ ব্রুসলস্-এ অনুষ্ঠিত 'Women's International League for Peace and Freedom'-এ

ভারতের প্রগতিশীল লেখকেরা যে মন্তব্য প্রেরণ করেন তাতেই সেই সময়ের নিয়ন্ত্রণ-চিত্রটি পরিস্ফুট ঃ

> 'ভারতের নাগরিক অধিকার হইতে যে সাংঘাতিকভাবে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, উহা কেবল রাজনীতির দিক হইতে অনর্থপাত নহে, কিন্তু উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও তাহার বিস্তার চেষ্টাকে খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করা হইতেছে। নানাপ্রকার পুস্তকের মধ্যে ... ওয়েব দম্পতির [Sidney and Beatrice webb; Soviet Communism] পুস্তক নিষিদ্ধ হইয়াছে; এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজী অনুবাদও নিষিদ্ধ হইয়াছে।' অর্থাৎ নাটকের পাশাপাশি অন্যান্য শ্রেণীর রচনার উপরও সরকারের দৃষ্টি ঘুরে ফিরছিল। তবে নাটককে মূল্য দিতে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

এই তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সারা বিশ্বের রাজনীতিতে ব্যাপক ভাঙাগড়ার খেলা চলে যার পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। এই ঢেউ ভারতেও আসে। এই সব রাজনৈতিক ঘূর্ণীর মাঝে বসে নাট্যকাররাও তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হল 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' যার প্রকাশ্য সম্মেলন প্রথম হল ১৯৩৬ সালে ইস্টারের ছুটিতে, মুন্সী প্রেমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। এরই সূত্র ধরে ১৯৪০ সালে বাঙ্গালোরে ও বোম্বাইয়ে 'জননাট্য সংঘ'-এর উৎপত্তি। প্রগতি লেখক সংঘ উঠে গিয়ে ১৯৪২-এ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হল 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এরই একটি নাম, গণনাট্য সংঘ। এর পাশাপাশি, ১৯৪৬-এ চলা শুরু করল 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ'। বাংলাদেশে পরবর্তীকালে এমন বহু নাট্যকার, অভিনেতা এবং গায়কের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে যাঁদের হাতেখড়ি গণনাট্যের পরিবেশে। গণনাট্যের মধ্যেই পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকারদের বিদ্রোহী মনোভাব এবং নতুন সৃষ্টির শপথ দানা বাঁধল।

এখানে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাসকার ডঃ দর্শন চৌধুরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আমরা উদ্ধার করছি ঃ

> "গণনাট্য সংঘই পেরেছিল, তার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সারাদেশের চিন্তাশীল, প্রগতিবাদী মানুষগুলিকে সংস্কৃতি জগতের পতাকাতলে সমবেত করতে।"

বিজন ভট্টাচার্যের আদর্শ হল রোমা রোঁলার 'The Peoples Theatre' গ্রন্থ এবং গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম প্রকাশিত বুলেটিনের ঘোষণা। তার ভাষ্য মেনেই লিখলেন কৃষকের যন্ত্রণানির্ভর নাটক 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৩), বেদে সমাজনির্ভর 'জীয়নকন্যা', শ্রমিকশোষণ নির্ভর নাটক 'অবরোধ' (১৯৪৭), আদিবাসী সমাজের দুর্দশা নিয়ে 'কলঙ্ক' (১৯৪৬) একাঙ্ক এবং সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী এক গণনায়ককে নিয়ে 'মরাচাঁদ' একাঙ্ক।

এইভাবে যে সংঘ গড়ে ওঠে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয় এবং আগেই ১৯৪৭-এ গণনাট্যের রিহার্সাল রুম আক্রান্ত হওয়ার ঘৃণ্য ঘটনা তীব্রতর হল ১৯৪৮ থেকে। গণনাট্যের শিল্পীরা খুনও হলেন। সে সময় প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের ভয়ে কিংবা উচ্চাশার কারণে সংঘ ত্যাগ করলেন তাঁদের মধ্যে শম্ভু মিত্র, রবিশঙ্কর, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, মহম্মদ ইসমাইল

এবং বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। কাজেই পরবর্তীতে লেখা 'দেবীগর্জন' গণনাট্য কিনা এ নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত, 'দেবীগর্জন' 'গণনাট্য' না 'নবনাট্য' এ নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। গণনাট্যের পতাকাতলে নাট্যজীবন-সংগীতজীবন শুরু করার পর, মোটামুটি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কেউ কেউ গণনাট্য সংঘ ছেড়ে যান। বিজন ভট্টাচার্য সেক্ষেত্রে একা নন। শম্ভু মিত্রও তাঁদের একজন। সংঘ ত্যাগের নানা কারণ ছিল। প্রথমত, স্বাধীন সরকারের গণনাট্য-বিরোধী ভূমিকা; দ্বিতীয়ত, সংঘের আওতায় জনপ্রসিদ্ধি ঘটায় ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঝোঁক; তৃতীয়ত, গণনাট্যের নাট্যকর্মীদের আদর্শ রক্ষার উদ্দেশ্যে, কিছু নির্দেশিকা মানার বাধ্যবাধকতা। বিজন ভট্টাচার্য মনে করেছিলেন, কমিউনিস্ট অনুশাসন গ্রহণীয়, কিন্তু শিল্পসংস্কৃতির প্রশ্নে শিল্পীর উপর পার্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কাম্য নয়। কিন্তু তাই বলে 'সৎনাট্য', 'নবনাট্য' ইত্যাদি নামের আড়ালে বামপন্থার বিরুদ্ধে যাঁরা নেমেছিলেন, বিজন ভট্টাচার্য আজীবন তাঁদের থেকে দূরে ছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে রচিত তাঁর নাটকগুলি কোনোটাই গণনাট্যের আদর্শবিরোধী নয়। গণনাটকের শর্তগুলি হল — ১. নাটকে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তদের সংগ্রাম প্রাধান্য পাবে। ২. নাট্যকারকে অবশ্যই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। ৩. গণসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও লোকভাষার উপর তাঁর দক্ষতা থাকা চাই। ৪. শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি চরিত্রদের শোষণের রূপটি মার্কসীয় দর্শনে ব্যাখ্যাত হবে। ৫. গণনাট্যকারকে ব্যক্তিনায়কের বদলে শ্রেণীনায়ক সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

৩০২.৩.৯.৪ ঃ 'দেবীগর্জন' কি গণনাট্য ?

'দেবীগর্জন' গণনাটক। এ নাটকের মূল প্রশ্ন — 'কে রাজা, কার রাজ্য?' নাটকের ঘটনাস্থল স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের অজস্র গ্রামের সমতুল, বীরভূমের একটি গ্রাম। স্বাধীনতার পর দেশের সংবিধানে সব নাগরিকদের সমান মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বহু শতাব্দীর জমিদারি ব্যবস্থার অভিশাপ আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। অথচ ১৯৫৯-এর রাজ্যজোড়া খাদ্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কত মানুষ প্রাণ দিল। ১৯৬২-তে ভারতরক্ষা আইন চালু এবং রাতারাতি বহু জননেতাকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখল। গ্রামের মানুষ এও দেখল জমিদারের জায়গায় নতুন জোতদারকে। এরা মহাজন, এরাই অবৈধ মজুতদার, এরাই কালোবাজারি। এরাই ১৯৬৬-তে আবার খাদ্য সংকটের সৃষ্টি করে, যার বিরুদ্ধে গ্রাম-নগরের মরিয়া জনগণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে। সেই ১৯৬৬-তেই গণনাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লেখেন গণনাটক 'দেবীগর্জন'। সৎনাট্য বা নবনাট্যের ভাববাদ, শৈল্পিক কলাকৌশল অথবা সমঝোতার মনোভাব এ নাটকে নেই। সাবেকী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বদলে নতুন পঞ্চায়েতের পক্ষে সওয়াল করেছেন বিজনবাবু। শ্রেণীবৈষম্যের গণনাট্যসুলভ ব্যাখ্যা এ নাটকে সুস্পষ্ট। একশ্রেণী অত্যাচারী, প্রভঞ্জন-ত্রিভুবনরা; আর এক শ্রেণী অত্যাচারিত, সর্দার-মংলা-মনা-রত্না-সঞ্চারিয়ারা। গণনাট্যকাররা জানেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য। 'দেবীগর্জন' সেই শ্রেণীসংগ্রামের নাটক এবং অবশ্যই গণনাট্য।

এ সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনার মধ্যেও 'দেবীগর্জন'কে গণনাট্য বলার যুক্তি আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩০২.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'দেবীগর্জন' নাটকে গণনাট্যের আদর্শ ও লক্ষণগুলি উপস্থিত কিনা?

২। 'দেবীগর্জন' নাটকে গান ও সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব।

৩। 'দেবীগর্জন' নাটকে গণনাট্যিক ঐতিহ্য কতটা অনুসৃত হয়েছে, আলোচনা করো।

৪। 'দেবীগর্জন' নাটকের ভাষা-সংলাপ কতটা নাট্যোপযোগী? দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ করো।

৫। 'দেবীগর্জন' নাটকে গণনাট্য ও লোকনাট্য উভয় ধারার বৈশিষ্ট্য বর্তমান–বিচার করো।

———————

একক - ১০

দেবীগর্জন : প্লট বিন্যাস

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১০.১ : 'কলঙ্ক' থেকে 'দেবীগর্জন'

৩০২.৩.১০.২ : 'দেবীগর্জন' : প্লট বিন্যাস

৩০২.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৩.১০.১ : 'কলঙ্ক' থেকে 'দেবীগর্জন'

১৯৬৬ সালে রচিত ও বিজন ভট্টাচার্যেরই প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা থিয়েটারের উদ্যোগে অভিনীত 'দেবীগর্জন' নাটকটি নাট্যকারের দু-দশকের উপর নাট্যচর্চার পরিণত ফসল। চল্লিশের দশকে তাঁরই লেখা নাটিকা 'কলঙ্ক' অনেকটাই অনুসৃত হয়েছে দেবীগর্জনে। দুটি নাটকেই মোড়ল বা সর্দার, তার স্ত্রী গিরি, পুত্র মংলা, পুত্রবধূ রত্নাকে আমরা দেখেছি। কৃষক পরিবারগুলি সাঁওতাল ও বাউরি সম্প্রদায়ের।

পরিবর্তন ঘটেছে দুটি দিক থেকে — এক. বাঁকুড়ার গ্রাম স্থানান্তরিত হয়েছে বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দুই. ব্রিটিশ শাসনের শেষ মুহূর্তে লেখা নাটকে ছিল গোরা সৈন্য, স্বাধীনতার বিশ বছর পরে লেখা নাটকে তারা স্বভাবতই নেই। তাছাড়া 'কলঙ্ক' ছোট নাটক, 'দেবীগর্জন' পূর্ণাঙ্গ নাটক।

'কলঙ্ক' নাটকে সাঁওতাল আদিবাসী পরিবারের নববধূ রত্নার উপর গোরা সৈন্যের ধর্ষণের ঘটনা আছে। তার ফলশ্রুতিতে সদ্যোজাত শিশু সন্তানের হত্যার প্রস্তাবও হয়। কিন্তু বৃদ্ধ মোড়ল তাতে বাধা দেয় একারণে যে তাহলে গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুযোগ থাকবে না। কালো আদিবাসীর ঘরে সাদা চামড়ার সন্তান দেখে রত্নার প্রতি স্বামী মংলার ক্ষোভ তীব্র হলেও তার পিতা প্রকৃত পদক্ষেপ নেওয়ায়, সন্তানকে ঘরে স্থান দেওয়ায় গণনাট্যের প্রতিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হয়।

'দেবীগর্জন'-এ 'কলঙ্ক' নাটকের চরিত্রগুলির নামের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তবে নাট্যদৃশ্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে, নতুন চরিত্র এসেছে। 'কলঙ্ক'-র ঘটনাস্থল বাঁকুড়া 'দেবীগর্জন'-এ স্থানান্তরিত হয়ে বীরভূম। কিন্তু দুটি নাটকেই আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কাহিনী।

'কলঙ্ক' নাটকের শেষে গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের শপথটুকু ছিল। কিন্তু 'দেবীগর্জন'-এর শেষে অত্যাচারী জোতদার প্রভঞ্জনের হত্যাদৃশ্য এঁকে নাট্যকার আরও পরিণত সমাপ্তি আনতে পেরেছেন।

'কলঙ্ক'-তে রত্নার উপর ধর্ষণ ও সন্তান জন্মের বিষয়টি 'দেবীগর্জন'-এ পাল্টেছে। প্রথমত রত্নার প্রতি লালসা থেকে প্রভঞ্জনকে দূরে রাখতে ত্রিভুবন চেষ্টা করে; বলে — 'গ্রামের বউ-বিটি-মেয়ের সম্ভ্রম রাখি কাজ করিবারে হয়।' তবু রত্না নিরুদ্দিষ্ট। বাঘরূপী প্রভঞ্জনের গ্রাস থেকে রত্নাকে উদ্ধারের শপথ করে মংলা জননীর কাছে। দ্বিতীয়তঃ প্রভঞ্জন রত্নাকে নানা প্রলোভন দেখিয়েও বশ করতে ব্যর্থ হয়। মদ্যপ অবস্থায় জন্তুর মত ধর্ষণের চেষ্টা করে। 'কলঙ্ক'-র রত্নার মতই 'দেবীগর্জন'-এর রত্না সহজে হারতে চায় না। নাট্যাঙ্গিকের বদলে উপন্যাসের মত সেই প্রতিরোধের ছবি আঁকেন নাট্যকার ঃ

> 'প্রাণভয়ে রত্না তখন প্রভঞ্জনের মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁত বসিয়ে দেয় নাগিনীর মতো। শিকার ছেড়ে দিয়ে আহত জন্তুর মতো আর্তনাদ করে ওঠে প্রভঞ্জন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ছুটে যায় রত্নার দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে। কঠিন আকর্ষণ করে দুহাত বেড়ে রত্নাকে।'

[রত্না অজ্ঞান হলেও 'দেবীগর্জন'-এর রত্নাকে 'কলঙ্ক'-এর রত্নার মত ধর্ষিতা হতে দেননি নাট্যকার] —

> মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চাঙা হয়ে নেয় প্রভঞ্জন। তারপর জানোয়ারের মতো রত্নার দিকে টলতে টলতে এগিয়ে যায়। ছিটকে সরে যায় রত্না। শঙ্কা ও আগুন দুটোই যুগোপৎ রত্নার চোখে জ্বলতে থাকে। প্রভঞ্জন এগিয়ে গিয়ে রত্নার কেশপাশ জাপটে ধরে। দৃঢ়মুঠ ছাড়িয়ে নিয়ে কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করে রত্না। শিকার ছুটে গেলে বাঘ যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে — প্রভঞ্জন শ্বাপদ-সঞ্চারে রত্নার অনুধাবন করে। বসন-ভূষণ বিশ্রস্ত হয়। রত্নার হাত ধরে মুচড়ে মুচড়ে আকর্ষণ করে প্রভঞ্জন রত্নাকে। প্রাণভয়ে রত্না তখন প্রভঞ্জনের মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁত বসিয়ে দেয় নাগিনীর মতো। শিকার ছেড়ে দিয়ে আহত জন্তুর মতো আর্তনাদ করে ওঠে প্রভঞ্জন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ছুটে যায় রত্নার দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে। কঠিন আকর্ষণ করে দুহাত বেড়ে রত্নাকে। লুটিয়ে পড়ে বরদেহ মাটিতে সংজ্ঞাহীন হয়ে। কিন্তু প্রভঞ্জনের ভ্রূক্ষেপ নেই। পাশব-লালসায় প্রভঞ্জন তখনও রত্নাকে দু-হাতে জাপটে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার অবচেতন মনের পাপবোধ এক মুহূর্তের জন্য শঙ্কার সৃষ্টি করে মনে। মহাকালের খাঁড়া লাফিয়ে ওঠে তার মাথার ওপর। প্রভঞ্জন স্পষ্ট দেখতে পায় রুধিরাক্ত একখানি উদ্যত খাঁড়া। আঁৎকে ওঠে প্রভঞ্জন। ভীষণ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে অনুচরদের উদ্দেশে। হাজির হয় রংকু, ভীমা। প্রভঞ্জনের নির্দেশমতো রত্নাকে তারা মুহূর্তের মধ্যে ভেতরে নিয়ে গিয়ে গুম করে রাখে।

[সুতরাং বলা যায় 'কলঙ্ক' এবং 'দেবীগর্জন'-এর মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি।]

৩০২.৩.১০.২ : দেবীগর্জন : প্লট বিন্যাস

গণনাট্যের আঙ্গিক-গঠন বা প্লট নির্মাণ প্রচলিত নাট্যধারা থেকে যে আলাদা তার প্রমাণ 'দেবীগর্জন'-ও। পাঁচ অঙ্কের বদলে সমগ্র নাটকটি তিন অঙ্কের। দৃশ্যসংখ্যাও ঐতিহাসিক-পৌরাণিক নাটকের চেয়ে কম। যেমন এখানে প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি এবং তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। এই এগারোটি দৃশ্যেই আছে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধি কিংবা অ্যারিস্টটলের প্লট রচনার পাঁচটি ধাপের যোগ পরম্পরা।

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী সর্দার পরিবারের সমস্যার বর্তমান রূপ। **দ্বিতীয় দৃশ্যেই** শোষক প্রভঞ্জনের খামার বাড়িতে কর্জ শোধ করে কৃষকদের ধান নেবার প্রয়াস। স্বাধীনতার দু-দশক পরেও কী নির্মম পরিহাস, ওজনের বাটখারা কম পড়ায় মনা নামের এক ঋণী কৃষককে পাল্লায় চাপিয়ে, তার বুকের ওপর ওজন চাপানো হল। মনা-ধনারা এটা নীরবে মেনে নিলেও নাট্যকার মংলার কণ্ঠে প্রতিবাদী উক্তি শোনালেন —

বেআইনি সুদ দিব নাই।

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। সংশ্লিষ্ট দৃশ্যটি অনবদ্য, ব্যঞ্জনাময়। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের দাবা খেলার দৃশ্য। এ খেলা, খেলা নয়। আসলে গ্রামজীবনে নিপীড়িত জনগণের মধ্যে নতুন পঞ্চায়েত গড়ে তোলার যে আওয়াজ উঠছে, তাতে পুরোনো পঞ্চায়েতের মাতব্বররা বিচলিত। অবশ্য ক্ষমতা ও অর্থের দম্ভে অন্ধ প্রভঞ্জন কোনও পরিবর্তনেই রাজি নয়, কিন্তু ত্রিভুবন শোষণের পক্ষে থেকেও, চাতুর্যের সঙ্গে এই সংকটের মোকাবিলা করতে চায়। দাবার রাজা-মন্ত্রি-গজ-বোড়ের চলাফেরার মধ্য দিয়ে ত্রিভুবন সেই নতুন যুদ্ধসজ্জার শিক্ষা দিতে চেয়েছে প্রভঞ্জনকে। এই দৃশ্যটি গণনাট্যে নতুন আঙ্গিক পরিকল্পনা।

দৃশ্যটি শুরু হচ্ছে এইভাবে —

[মিড-স্টেজ বরাবর টানা কালো সামনে আপ-স্টেজ-এর মাঝামাঝি একটা ছোট্ট ফরাস। বিদরি হুঁকোয় সটকা টানতে টানতে দাবা খেলছে প্রভঞ্জন। সর্দার ত্রিভুবনের সঙ্গে। পাশে পরিচারিকা। সতর্ক দু-তিনটি চাল। প্রভঞ্জনের ঘোড়া লাফিয়ে পড়ে ত্রিভুবনের গজের ওপর।]

প্রভঞ্জন ।। ই দিতেম!

ত্রিভুবন ।। হুঁশ কর।

প্রভঞ্জন ।। হঁ হঁ।

ত্রিভুবন ।। সমুঝ কর।

প্রভঞ্জন ।। হঁ হঁ, মারলম গজে, — চাল ঘুঁটি।

ত্রিভুবন ।। (সতর্ক করে) আবার কহি বুঝ কর।

প্রভঞ্জন ।। হঁ হঁ, ঠিকই আছে।

ত্রিভুবন ।। ঠিকই আছে, না? (ঘুঁটি খায়) তবে ই দেখ।

প্রভঞ্জন ।। অঁ হঁ হঁ হঁ — কীরকম কথা!

ত্রিভুবন ।। (হাসে) ই কথা।

প্রভঞ্জন ।। না না, দিতম নাই।

ত্রিভুবন ।। (ঠাট্টাচ্ছলে) কী খেলোয়াড়, দেখেন আপনারা।

প্রভঞ্জন ।। নজর করি নাই।

ত্রিভুবন ।। সেটাই তো তুমার নাই। অতিকম চার চারবার আমি তোমাকে হুঁশিয়ারি করেছি।

প্রভঞ্জন ।। আরে যাও কেনে!

ত্রিভুবন ।। নাও নাও, ঘুরতি নিলম চাল। কিন্তুক ইটা কোনো ক্রীড়া না, — ছেল্যাখেলা করছ তুমি। ঘুঁটি ফিরাও।

প্রভঞ্জন ।। (ঘুঁটি টানে) হঁ হঁ, ফিরবে ঠিকই, ঠিকই ফিরবে ঘুঁটি। কিন্তুক ফিরতি এসেই চলতে থাকবে ঘুঁটি বন্দুকের গুলিটার মতো ছত্রভঙ্গ করি শত্রুব্যূহ।

[চুপচাপ ঘুঁটি চালে তিনবার। চারবারের বার ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্রিভুবন মন্ত্রী নিয়ে]

ত্রিভুবন ।। মার কিস্তি।

এই পর্যন্ত অভিজাত সমাজের দাবাখেলার মজার পরিচয় মেলে। কিন্তু তার পরই খেলার প্রতীকে শোষকের যুক্তিবিহীন শক্তি প্রদর্শন দেখিয়ে প্রভঞ্জনের মুর্খামি ও ত্রিভুবনের চাতুর্যের ছবি আঁকা হয়েছে —

প্রভঞ্জন ।। একই চাল?

ত্রিভুবন ।। একই চাল।

প্রভঞ্জন ।। একই চাল, না! — একই চাল! একই চাল যখন, তখন ই দেখ আমি গজটাক চালাইতম।

ত্রিভুবন ।। ঘুঁটিটাক টপকে?

প্রভঞ্জন ।। আলবাৎ টপকাবে গজ।

ত্রিভুবন ।। হাঁতিঠো তুমার বড় বুড়া হইয়েছে প্রভঞ্জন; — মন্ত্রীর মাথাঠো আমার অনেক উঁচা।

প্রভঞ্জন ।। পাও দিয়া মন্ত্রীর মাথাঠো দাবাই চলবে আমার হাঁতি শুণ্ডটা তুলি।

ত্রিভুবন ।। হঁ, সে এক দৃশ্য হবেক বটে। তবেই খেলাঠো জমবে তুমার ময়দানের মাঠে। দাবার ছকে হাঁতিঠোর তুমার হাত-পাও বাঁধা।

প্রভঞ্জন ।। (রাগে লাথি মেরে উল্টে দেয় দাবার ছক) ইটা কোনো ক্রীড়া না। ইটাক আমি বুলব ভাঁওতা মারছ তুমি আমাক, জুয়াচুরি করছ তুমি।

ত্রিভুবন ।। (ধমক দেয়) প্রভঞ্জন! ই রকম খেলাটা তুমার সবঠাঁই, সবখানে। এই তো দেখলম তুমার হাঁতির খেলাটা খোলানের ময়দানে। কর্জা ধানের সুদের দায়ে আধিয়ারের মস্তকটা ফাঁড়ি দিলে তুমি লাঠিবাজি করি। আধিয়ারের রক্তে খোলানের মাঠি যদি না ভিজল তো কীসের দাপট তুমার! তারপর, চাল দিয়েই বেচাল তুমি, ঘুরতি নিলে তুমি সে চাল, — আমাক পাঠাইলা ঐ অতগুলান মারমুখী রুখী আধিয়ারের সাথ সমঝোতা করতে।

প্রভঞ্জন ।। হঁঃ।

[জালের ওধারে প্রেতছায়ার মতো সর্দার এসে দাঁড়ায়]

ত্রিভুবন ।। ঝঙ্কার আর হুঙ্কার তুমার আমি অনেক শুনেছি। — তুমি ইখানেও অন্ধ, উখানেও অন্ধ। আর তুমার চোখে চোখ রেখে আজ আমিও হয় তো দৃষ্টিটা হারাতে বসেছি, — জানি না। —

প্রভঞ্জন ।। (পাল্টা ধমক দেয়) ত্রিভুবন!

ত্রিভুবন ।। (সর্দারের দিকে প্রভঞ্জনের দৃষ্টি ইঙ্গিতে আকর্ষণ করে সতর্ক করে ত্রিভুবন) রায়ত, — বুঝ করি গলাটো কাটিবার হয়।

লক্ষণীয় ত্রিভুবন এই খেলার মধ্যে প্রভঞ্জনের যে একনায়কসুলভ ব্যবহার সে জন্য বারবার সতর্ক করেছে। যুগের পরিবর্তন, নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইত্যাদির কবলে মহাজন, জোতদারদের একচেটিয়া শোষণের সুযোগ যে দ্রুত কমছে, খেলার ফাঁকে ত্রিভুবন তা বোঝাতে চেয়ে ব্যর্থ। সে শোষক শ্রেণীর দাসত্ব করলেও পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শোষণের পদ্ধতি বদল যে জরুরী এই সার কথাটি বুঝে সর্দারের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে, আর একবার প্রভঞ্জনকে সতর্ক করে মঞ্চ ছেড়ে যায়।

গণনাট্যে শিক্ষা দাবা খেলার দৃশ্যে এইভাবে আছে — সামন্ততান্ত্রিক হাতির দিন শেষ হতে চলেছে, গণতান্ত্রিক মন্ত্রীর ভূমিকা গুরুত্ব পেতে চলেছে। বাংলা নাটকের ধারায় দাবাখেলার মধ্য দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের বিষয় মঞ্চস্থ করায় দৃশ্যটি অসম্ভব গুরুত্ব পেয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্যটিতে গণনাট্য-সুলভ গ্রামীণ লোকায়ত আচার দৃশ্যমান। সম্ভাব্য সংগ্রামের মাঝে মংলা-রত্নার বিবাহ Comic রিলিফ দিচ্ছিল। গরিব গ্রামবাসীরা নাচে-গানে মেতে উঠেছিল। কিন্তু নাট্যকার এই পরিবেশের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন অকস্মাৎ মহাজন প্রভঞ্জনের চক্রান্ত সামনে এনে। এই সংকটময়তা আসলে নাটকের মধ্যে একাধিকবার প্রয়োগ করা হয়েছে।

দাবা খেলার দৃশ্যে ত্রিভুবন বলেছিল —

হাঁতিটো তুমার বড় বুড়া হঁইয়েছে প্রভঞ্জন ; — মন্ত্রীর মাথাটো আমার অনেক উঁচা।

এই শিক্ষা প্রভঞ্জনের মনে ধরেনি। সে ভেবেছিল, তার সামন্ততান্ত্রিক হাতি, নবীন গণতান্ত্রিক মন্ত্রীর মাথার ওপর পা দিয়ে, উঁচুতে শুঁড় তুলে চলতেই থাকবে। তাই মংলার সদ্য বিবাহিতা বউ রত্নাকে অপহরণ করে ; ভাবে না, আগামী পঞ্চায়েতে ত্রিভুবন এবং তাকে জব্দ করার জন্য কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হতে পারে।

তৃতীয় অঙ্কের সূচনা সেই শপথ দিয়ে। এই প্রথম বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্যের সংগ্রামের নতুন রূপরেখা আঁকলেন। দেখলেন, ভূস্বামী-মহাজনদের আক্রমণ যখন সর্বগ্রাসী, তখন গ্রামের পর গ্রাম সংঘবদ্ধ হতে হবে। এ নাটকে ভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে সঞ্চারিয়ারা। দাবা খেলার মত বহুরূপীর দলের উপস্থিতিও প্রতীকী।

[রাত্রি। সর্দারের আঙিনা। সঞ্চারিয়া আর ভাল্লু বাঁধের ওপর দিয়ে এসে চুপিসাড়ে আঙিনায় দাঁড়ায়। ভাল্লুর হাতে জ্বলন্ত মশাল। সঞ্চারিয়া হাতে তালি দিয়ে সর্দারকে ডাক দেয়। সর্দার বেরিয়ে আসে ঝোপড়ার ভেতর থেকে]

সর্দার ।। হঁ হঁ, তালি শুনলম কিন্তু মানুষ চিনলম নাই। কে বটে?

সঞ্চারিয়া ।। সঞ্চারিয়া বুলছি।

সর্দার ।। অ, সঞ্চারিয়া!

সঞ্চারিয়া ।। গড়খণ্ড গেঁইছিলম।

সর্দার ।। দামোদর পার?

সঞ্চারিয়া ।। হঁ, দামোদর পার! মংলাক দেখলম।

মংলা প্রস্তাব দিয়েছে বাঘবন্দী খোলায় পুরানো পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সভায় যখন সওয়াল করবে ত্রিভুবন তখন নতুন পঞ্চায়েতের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করবে সঞ্চারিয়া। মংলার যুক্তি, 'আমি বহুরূপী, থাকতম, কিন্তু মুখ খুলতাম নাই। সঞ্চারিয়া, মংলার কথানুযায়ী 'বহুরূপীর আজ্ঞা' বলেই, নেতৃত্ব দেবে। সঞ্চারিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার যে ক্ষমতা আছে তা দোলাচলচিত্ত খগেশ্বরকে তার কঠিন মতামত দিয়ে বোঝায় এবং খগেশ্বরও হাতে টাঙি তুলে নেয়।

তৃতীয় অঙ্ক জুড়েই চরম নাটকীয়তা, একটানা climax! মদ্যপ প্রভঞ্জন পশুবল প্রয়োগ করেও রত্নাকে করায়ত্ব করতে ব্যর্থ হল।

রত্নার মৃত্যু হল। আবার এর পাশাপাশি জন্মও হল সংগঠিত প্রত্যাঘাতের। মংলা-সঞ্চারিয়ার দল এবার শ্রেণীশত্রুকে শেষ আঘাত করবেই। চতুর ত্রিভুবন পালাবার আগে প্রভঞ্জনকে শেষবার সতর্ক করে—

হিসাব যারা চাহে তারা আসছে।...

৩০২.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'দেবীগর্জন' নাটকের নামকরণের সাফল্য।

২। 'দেবীগর্জন' নাটকের গঠন কৌশল বিশ্লেষণ করো।

৩। 'দেবীগর্জন'–নাটকে গ্রামীণ পটভূমিতে সামাজিক শোষণের যে রূপটি প্রতিভাত, তার স্বরূপ নির্ধারণ করো।

৪। 'দেবীগর্জন' নাটকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্রকল্প কিভাবে এসেছে দেখাও।

————————

একক - ১১

নামকরণের তাৎপর্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১১.১ : শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য : নামকরণের তাৎপর্য

৩০২.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৩.১১.১ : শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য : নামকরণের তাৎপর্য

দেবীগর্জনের শেষ দৃশ্যটিই নাট্য নামকরণের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৭৭-এর আগষ্টে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে স্বয়ং নাট্যাকর বলেছেন—

'In *Devigarjan,* I moved into the experience of the peasantry, into the economic repression and exploitation that endure even today. Drawn to a last ditch they are compelled to revolt. The violence of their revolt I associated with the Devi's garjan, the roar of the angry goddess. As long as my people make the gods and goddesses dance, I am prepared to accomodate the belief of my people.'

নাট্যকর ভূমিকায় শেষদৃশ্য এবং নামকরণের যে আলোচনা বিজন ভট্টাচার্য করেছেন তা এখানে তুলে ধরা জরুরী—

দেবীগর্জন—আভিধানিক অর্থে দেবী অর্থাৎ বসুধা গর্জন করেছেন। অশান্ত হয়ে উঠেছেন জননী। বাসুকীর ফণায় ধরিত্রী মাতা অস্থির। ভূমিকম্প হচ্ছে।

লোকায়ত অর্থে দেবীগর্জন-এর ব্যাখ্যা একটু ভিন্নতর। বর্ষান্তে শরৎকালের আকাশ মেঘমুক্ত। অমন দিগন্ত প্রসারী নীলিমা আর কোনো ঋতুতে মেঘলোকে পরিদৃশ্যমান নয়। অখণ্ড নীলিমার নিচে ঘনসন্নিবিষ্ট কাশফুলের আন্দোলিত শ্বেত উত্তরীয় এক গৈরিক প্রশান্তিতে ভরে দেয় প্রাণমন। শরৎ যেন এক উদাসীন মাঠ। যৌবন নয়, বানপ্রস্থ নয়, এমন কী কৈশোরও নয়, শুধু শিশুদেরই যেন এখানে মানায় ভালো—ঘুমভাঙা শত শত শিশু। ঢাকের বাজনায় হাততালি দিয়ে তারা মাকে আবাহন জানায়। আর লক্ষ্মীর ভাঁড়ে চতুরালির সামান্য সঞ্চয়ে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর আয়ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ করে। ছেলেরা সবাই অসুর আর যারা কাকলীতে কথা কয়, কৃষ্ণা কাবেরীর দল, সিংহবাহিনী।

এমনই এক সুন্দর দিন—যখন আকাশ পৃথ্বী আনন্দঘন, তখন আচম্বিতে শুনি ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষ হচ্ছে। অথচ নিঃসীম নীলিমায় কালো মেঘের লেশমাত্র নেই। লোকে বলে, শিব দুর্গায় ঝগড়া লেগে গেছে। ত্রিশূলীর তাণ্ডব শুর হয়েছে। মায়ের বাপের বাড়ি আসতে মানা। কিন্তু মাকে তো আসতেই হবে। তাঁর ছেলেমেয়েরা যে চরাচর কাশবন জুড়ে বাজনা বাজাচ্ছে আর মাঙ্গলিক গাইছে। শেষটার দীর্ঘ কলহের পর একটা রফা হয়ই—ফি বছরই তিন চার দিনের কড়ারে। মাঝখানে ঐ তাণ্ডব, ঐ অশান্তি — আর দেবীর গর্জন। লোকায়ত অর্থে, বিশেষ করে, পূর্ববাংলার দেশাচার কালচারে দেবীগর্জনের ব্যাখ্যা এই রকম।

দুই ব্যাখ্যার যে ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হোক — ঊষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কৃষক —আন্দোলনের ভিত্তিতে, শত্রুকে পরাহত করে, জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনায় দেবীগর্জন নাটকটির নামের দিক থেকে সার্থক হতে বাধা নেই — এই বিশ্বাসে একান্তই বাস্তবনিষ্ঠ কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে সংগ্রামী এই চিত্রকল্প কাহিনীর পৌরাণিক নামাকরণ করেছিলাম। আমার মনে হয় লোক-সংস্কৃতির বহতা অক্ষুণ্ণ রেখেই এই নামটি প্রযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক হতে পরেছে। সুরাসুরের যুদ্ধে দেবীকে চিনে নিতে আজকের মানুষ ভুল করেনি।

নাটকটির নামকরণটিকে যথাযথ প্রতিষ্ঠা করতে নাট্যকার কিভাবে দৃশ্যটিকে মহিষাসুর বধ এবং মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে কৃষকদলের প্রভঞ্জন হত্যার ঘটনা মঞ্চে এনেছেন তা দর্শক দেখেছে। পুরাণকে সমকালের পটে স্থাপনের এই পদ্ধতি গণনাট্যধর্মী।

'দেবীগর্জন' নাটকের সমাপ্তি দৃশ্যে বিজনবাবু যে মাতৃকাশক্তির ছবি দেখিয়েছেন, এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার যে ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। এখন দেখা যাক্ বিতর্কমূলক সেই অংশটি ঠিক কী ছিল।

নতুন গণমুখী পঞ্চায়েতের সাধারণ অধিবেশন। দশরথ কৃষকদের সামনে জনমুখী কর্মসূচী ঘোষণা করল। স্বভাবতই প্রভঞ্জন এখন ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত। একদিনে ত্রিভুবনের কৌশল তার মনে পড়েছে। এই বকধার্মিক অত্যাচারিতদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে পালাবার পথ খোঁজে।

কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। নাট্যকার ইতিমধ্যে মঞ্চ নতুন করে সাজিয়েছেন। সামনে একটি স্থির চিত্র— মহিষাসুর বধ, তবে দেবী দুর্গা নয়, মহাকালী। পুরাণানুযায়ী অবশ্য কোনও পার্থক্য নেই। কালী এবং দুর্গা—উভয়েই শিবের স্ত্রী।

ঐ দৃশ্যটি মংলাকে অতিরিক্ত শক্তি যোগাল। তাণ্ডব নৃত্য অতিরিক্ততম শক্তিসঞ্চারি। প্রভঞ্জনের মাথায় মংলার টাঙ্গি নেমে এল। মহিষাসুর বধ ও প্রভঞ্জন বধ। কোনও সংলাপের প্রয়োজনও হল না। রুদ্ধশ্বাস এই পরিণতি পরে মনোজ মিত্র-র বহুপরিচিত 'চাকভাঙা মধু'র পরিণতিতে অনুসৃত। ব্যতিক্রম, 'দেবীগর্জনে' শেষ আঘাত হেনেছে পুরুষ মংলা, 'চাকভাঙা মধু'তে সে দায়িত্ব পালন করছে নারী বাদামী।

গণনাট্যে জনতার সংগ্রামে দেবীশক্তির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য কিনা এ নিয়ে একদল দর্শক প্রশ্ন তুলেছিল। ১৯৭৭-এ দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে বিজনবাবু তার জবাবও

দিয়েছিলেন। আমরা এ বিষয়ে তিনটি বিষয় উল্লেখ করছি। প্রথমত, গণনাট্যকাররা কোনও দর্শকের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করতে চান না, বিশেষত পূর্ববর্তী পঁচাত্তর বছর ধরে বাংলা পৌরাণিক নাটকে মুগ্ধ সাধারণ বাঙালি দর্শক এ জাতীয় পরিণতি গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, আদিবাসী সমাজ কালীর আরাধনা বেশি করে, তাই দুর্গার বদলে কালীর পরিকল্পনা। তৃতীয়ত, প্রভঞ্জনের ধর্মগোলা অধিকার করে প্রভঞ্জনের বাঁধ ও বাধা ধ্বংস করতে যখন কৃষকরা সংঘবদ্ধ তখন চালচিত্রে দেবী কালীর সংহারিণী রূপ তুলে ধরে এটিকে লোকনাট্যের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হল।

দেবীগর্জনের সমাপ্তি দৃশ্যের কোরিওগ্রাফি — প্রযোজনার নানা রূপ

দেবীগর্জনের শেষদৃশ্যের কোরিওগ্রাফি নিয়ে নানা নাট্যসংস্থা মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, চালচিত্রের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে নানা পরীক্ষা করেছেন। বিজনের পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য যে শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন তা নাট্যকারই জানান। 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর প্রযোজনার সময় তিনি স্বয়ং এর কিছু বদল ঘটান। বালুরঘাটের 'ত্রিতীর্থ' গোষ্ঠী দৃশ্যটি কিছুটা পালটে নেয়। আবার কলকাতার 'অর্ণব নাট্যসংস্থা' 'দেবীগর্জন' অভিনয়ের সময় কিছু পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু তার ফলে মূল কোরিওগ্রাফির কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যেমন মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক্।

নাটকে বর্ণিত মূল, 'কোরিওগ্রাফি' ছিল এরকম —

প্রভঞ্জন ডানদিকের চোরাপথ ধরে পালাতে চেষ্টা করে। আবছা অন্ধকারের ভেতর থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটি বল্লম। কঠিন প্রহরা। প্রভঞ্জন তখন বাঁদিক দিয়ে পালাবার পথ খোঁজে। কিন্তু এখানেও অনিবার্য আর একটি বল্লম। এগুলেই গেঁথে ফেলে দেবে। প্রভঞ্জন তখন পেছন দিকে পথ খোঁজে। কিন্তু সর্বত্রই কঠিন প্রতিরোধ। উদ্যত বল্লম, টাঙি, কুঠার, রামদা — বহুবিধ শস্ত্রের দৃঢ় বেষ্টনী। কোনো পথ নেই পালাবার। অপেক্ষা করে প্রভঞ্জন অনন্যোপায় হয়ে।

ওদিকে ধর্মগোলা অবরোধ পর্বও শেষ হয়। ধানের বদলে মংলা খুঁজে পায় মাঠের লক্ষ্মী রত্নাকে। মান বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে মুক্তি পেয়েছে সে।

জনতা পাথর। সতীর দেহভার নিয়ে এগিয়ে আসে মংলা সামনের দিকে। শুইয়ে দেয় রত্নাকে মাটিতে।

এইবার শুধু একটি কঠিন কর্তব্য। হাত বাড়িয়ে অস্ত্র খোঁজে মহাবলী। ঘুগর‍্যা মংলার হাতে টাঙি এগিয়ে দেয়। একটি মুহূর্তমাত্র। দৃপ্তভঙ্গিতে দু-হাতে ঘুরিয়ে ধরে টাঙি মংলা প্রভঞ্জনের মাথার ওপর। আশপাশের সমস্ত অস্ত্রগুলিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে লক্ষ করে। মহিষাসুর-বধের একটি স্থির চালচিত্রে পশ্চাতে বাঁধের ওপর মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে প্রভঞ্জন - নিধন পালার যবনিকা পড়ে।

নাটকের এই বর্ণনা বিভিন্ন নাট্যদল কিভাবে করেছে দেখা যাক —

ক. ক্যালকাটা থিয়েটার ঃ দৃশ্যায়িত হয় অকালবোধন, দেবী দুর্গার মূর্তি। মঞ্চের উপর রত্নার মৃতদেহ। কিভাবে মহিষাসুরের মতো প্রভঞ্জন নিজেকে বাঁচাতে চাইছে এবং কিভাবে কৃষকরা লাঠি-সড়কি দিয়ে তাকে আঘাতে প্রস্তুত তা প্রচণ্ড বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে উত্তেজিত দর্শক দেখে। মঞ্চের শেষদিকে মহাকালীর নৃত্যরতা রূপ।

খ. ত্রিতীর্থ ঃ বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ প্রভঞ্জনের উপর কৃষকদের সরাসরি আক্রমণ দেখাত। তারা বহুরূপীর দল, কালীনৃত্য এবং মহিষাসুর বধ বাদ দিয়ে পরিণতিকে সরাসরি বাস্তব জগতের দিকে নিয়ে আসে।

গ. অর্ণব ফাইন আর্টস ঃ এখানে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রতীক হিসেবে একটি কৃষক শয্যাশায়ী প্রভঞ্জনকে বল্লম দিয়ে মারছে। পাশ থেকে একজন লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। এখানেও জনশক্তির উপর মাতৃকাশক্তির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার প্রবণতা।

নাটকটির নামকরণটি এই শেষ দৃশ্যটির জন্যই সফল-উত্তীর্ণ।

৩০২.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'দেবীগর্জন' নাটকের নামকরণের সার্থকতা এবং নাটকের শেষ দৃশ্যের গুরুত্ব বিচার করো।

২। 'দেবীগর্জন' নাটকের শেষ দৃশ্যের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে তা কতটা নাট্যোপযোগী হয়েছে বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৩। 'দেবীগর্জন'-নাটকে 'বাদামি'-অত্যন্ত বাস্তব ও সক্রিয়"।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪। 'দেবীগর্জন'-নাটকে সংযোজিত সঙ্গীতগুলির উপযোগিতা বিচার করো।

———————

একক - ১২

লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১২.১ : 'দেবীগর্জনে' লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব কতখানি?

৩০২.৩.১২.২ : প্রভঞ্জন ও ত্রিভূবন : একই শ্রেণীর দুই চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

৩০২.৩.১২.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩০২.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.৩.১২.১ : 'দেবীগর্জনে' লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব কতখানি ?

'দেবীগর্জন' নাটকে বাংলা লোকনাট্য, লোকগীত ও লোকনৃত্যের ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে। গণনাট্যের অন্যতম লক্ষ্য হল বাংলার লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পল্লীনির্ভর নাটকের সংযোগ ঘটাতে হবে। নাটকের তেমনি কয়েকটি লোকায়ত চিত্র ঃ

ক. মংলা-রত্নার বিয়ের অংশ। আদিবাসী বিবাহ-আচারের সুন্দর পরিচয় এখানে মেলে। লোকনৃত্যগীতের প্রয়োগে রুদ্ধশ্বাস এই নাটকে এক চিলতে সুখাবেশ। বাসরঘরে আনা হয়েছে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথার প্রসঙ্গ।

দৃষ্টান্ত —

১. দশরথ ।। হঁ, পক্ষীরাজে বসাই। (সবাই হাসে)

[মেয়েদের গান ও জোকার-পুকারের মাঝখানে বরানুগমন হয় টেঙ্গোবাঁশী ঢোলসহরতে। মেয়েরা বরণডালা হাতে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গিয়ে সংবর্ধনা করে নব বরবধূকে]

২. [বর্ষীয়সী মেয়েরা নবাগতা বধূকে আচারসম্মতভাবে বরের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে স্ত্রী-আচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর আশীর্বাদের পালা। দশরথ, সনাতন, ত্রিভুবন— বয়োজ্যেষ্ঠগণ বরবধূকে আশীর্বাদ করে। উৎসব-আনন্দের মাঝখানে মংলার বাপ বুড়ো সর্দার ঘরে ফেরে হন্তদন্ত হয়ে। বুড়োকে দেখে গিরি গদগদ হয়। চাদর ধরে টানে। গায়ে ঢলে পড়ে। পুরনারীগণ মিঠাই-মণ্ডার দাবি জানায় সর্দারের কাছে]

[বরণ ও স্ত্রী-আচারের পর বরবধূ ঘরে যাবে; কিন্তু এখানেও নবীনারা বাধার সৃষ্টি করে। হাতে হাতে বন্ধনী রচনা করে তারা বরবধূর পথ আগলে দাঁড়ায়]

প্রথম নবীনা ।। টাকা পয়সায় হবেক নাই গ, সোনা দানা রূপা চাই।

গিরি ।। (হাসে) অ বুড়া বুড়া গ। তামাশা দেখ। বুলে কিনা টাকা পয়সা লিব নাই, সোনা দানা রূপা চাই।

৪. দিগম্বর ।। ইবার বেয়াই বেয়ানের পাল্টা লিবে — ধানখেলা শুরু হোক কেনে?

[তুমুল হট্টগোলের মাঝখানে কোমর বেঁধে এগিয়ে আসে ধান ভরতি কুলো হাতে গিরি]

গিরি ।। নাচবে নাকি গ বিয়াই বুড়াকালে? — কোমর ভাঙবে তো?

লেদুয়া ।। মন ভেঙেছে আর কোমর ভাঙবেক নাই? দেখি নাচুনী কেমন? (ঢোলে কাঠি দেয়)

[দু-ধারি নৃত্যপর স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানে লেদুয়া ও গিরির ধানখেলা শুরু হয় ঢোলের তালে নেচে নেচে।]

খ. বহুরূপীর দল বাংলার লোকজীবনে আনন্দের উৎসব হাজির করে। 'দেবীগর্জনে'র শেষাংশে বহুরূপীর দল সেই ভূমিকা পালনের সঙ্গে কৃষক সংগ্রামেরও অংশীদার হয়।

গ. বাংলায় লোকক্রীড়ার একটি হল দাবা খেলা। মহাভারত-হিন্দুপুরাণ - বৌদ্ধপুরাণ - চর্যাপদে এই পৌরাণিক ক্রীড়া, 'দেবীগর্জনে'র সমাজ-বদলের লৌকিক ছক হিসেবে প্রযুক্ত। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের ভবিষ্যৎ কৌশলগত বিরোধের পটভূমি আগেই তাদের লোকক্রীড়ার মধ্যে আভাসিত।

ঘ. ঘটনার ঘনঘটায় একসময় অশিক্ষিত কৃষক রমণী গিরি মনে করে তার পুত্রবধূ রত্নার 'অপয়া' ভাগ্যই সর্দার-পরিবারের সর্বনাশের কারণ। তার সংলাপের মধ্যে লৌকিক ধর্মীয় কুসংস্কারই প্রকাশ পেয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ

গিরি ।। (স্বগত) যেই দিন থিকা পাঁও দিছে ঘরে, লেগেই আছে অশান্তি। আবাগীর বিটি জ্বালাই দিল ঘর-সংসার; জমি-জিরাৎ নীলামে চড়াইছে, ছেলেটাকে দেশান্তরী কঁরছে, এখন বুড়া-বুড়ির কল্‌জাটা খোঁপাইতে লেগেছে।— খা কেনে খা, চিবাই চিবাই খা আবাগীর বিটি, মুখ্যার বিটি।

ঙ. লোকসমাজে লাঠিয়াল পাঠিয়ে নারী অপহরণের নানা ঘটনা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। অনেক সামন্ততান্ত্রিক প্রভু এজন্যই লাঠিয়াল পুষতেন। প্রভঞ্জন লাঠিয়াল পাঠিয়ে যেভাবে রত্নাকে অপরহণ করল, তা লোকনাট্য-সুলভ ঘটনা।

চ. 'দেবীগর্জনে' এমন অনেক লৌকিক ছড়া ও প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে, যা কেবল গণনাট্যের পরিধিতেই বাস্তবসম্মত হতে পারে। লোকউৎসবের অঙ্গরূপে ছড়া ব্যবহার বাংলার জনজীবনে সুলভ। এ নাটকের একেবারে শুরুতে যখন পূবাকাশে ঊষার সূচনা হতে চলেছে তখন ছড়াগান গেয়ে পথ চলার দৃশ্যটি অসাধারণ। তেমনি প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, কামিনেরা যখন কুলোয় শস্য প্রস্তুত করছে, তখনও শ্রমসংগীত হিসেবে ছড়াগানের সার্থক ব্যবহার।

দৃষ্টান্ত —

এক.

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল। ঊষাকালের পূর্ব-মুহূর্ত। পূর্ব-দিগন্তের দিকচক্রবাল রেখা ধরে টানা সড়ক তখনও অস্পষ্ট। বাউরি, সাঁওতাল কুলি-কামিন ছেলেমেয়েরা আলো হাতে লাইনবন্দী কাজে চলেছে গান গাইতে গাইতে]

হাতে মগের বাতি মাথাত বেতের ঝুঁড়ি,
চলিলাম দাদা গ পাতালপুরী।
চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা রুম্‌ঝুম্‌
সুমরি শুকরি যাঁইছে পাতাল নিঝুম।।

[কামিন ছেলেমেয়েরা গান গাইতে গাইতে চলে গেলে সোনার থালায় সূর্য ওঠে।]

দুই.

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রভঞ্জন সর্দারের খামারবাড়ির খোলান। সকালবেলা। ডানদিকে খামারবাড়ির লাগাও সিঁড়িসমেত ধানের মরাই। মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে বাঁদিক ঘেঁসে ধানসমেত খড়ের ডাঁই, মই ও মাচাং। মেয়ে কামিনরা এখানে ধান ঝাড়ছে; কুলো করে ধান উড়োচ্ছে গান গাইতে গাইতে]

গুণের ননদ ময়না
নিশাকালে শিয়াল ডাকে
ঘরেতে মন রয় না।
গুণের ননদ ময়না
ধনীর প্রাণে সয় না
ধান ঝাড়িতে দোসর পাইলম না।

ছ. সংলাপে সাঁওতালী আদিবাসী ভাষার বলে প্রয়োগ

দৃষ্টান্ত —

১. গিরি ।। আঁই দেখ। ...বুঝলম...তা সে রাগমান কঁরেছেন ভালো করেছেন, এখন আসান একটা করেন দেখি। আমরা তো নাচার হঁইয়েছি। (বউকে) জল দিস কেনে? (ত্রিভুবনকে) বুল্লম না, দেঁখতেই, কামের লয় বউ!

ত্রিভুবন ।। তা, তুমরা বসাই বসাই খোঁয়াইবে, উয়ার কী দোষ? গতর আছে, খাটি খাক। বউ-বিটি আজকাল সক্কল করছে। (সর্দারকে) পাঠাও কেনে খোলান? ধান উড়াবে, চাল ঝাড়বে — দেড় টাকা থিকা দুই টাকা রোজ উশুল হয় তো মন্দ কী?

[রত্না জল এনে দেয়]

গিরি।। তা, সে মন করলে তো করিবারই পারে।

ত্রিভুবন ।। মনঠো কন্যার ঠিকই আছে, এখন আঁজ্ঞাঠো তুমাদের হলেই হয়!

সর্দার ।। আঁজ্ঞাঠো দেওয়াই আছে, — ও বুঝবে, ও করবে....

ত্রিভুবন ।। তা পাঠাও কেনে খোলান? কামঠো উয়ার বাঁধা থাকবে, আমি কথা দিলম।... বড় ভালো বউ হঁইয়েছে, টুক্‌চা বউ!

....তা, মংলাটাকে দেখিবার পাই না। — না না, বুল্লে তো শহর গেঁইছে।

সর্দার ।। কয়লাখাদে কাম লিয়েছে।

ত্রিভুবন ।। হঁ হঁ, ভুলে গেঁইছিলম কথাঠা। আচ্ছা তো আসি সর্দার!

(২) কাটা কাটা উপভাষার মধ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর —

প্রভঞ্জন ।। সে কঁরেছিলেন এক রামচন্দ্র।

মংলা ।। তা সে আমরাও করব অকালবোধন। একশত আটঠো নীলোৎপল লাগে তো তাই দিব। আজই পূজা, আজই সেবা। খুলি দাও ধর্মগোলা।

প্রভঞ্জন ।। না, ধর্মগোলা খুলি দিব নাই।

সঞ্চারিয়া ।। ধর্মগোলা খুলি দাও!

প্রভঞ্জন ।। না, দিব নাই।

মংলা ।। খুলি দাও ধর্মগোলা!

প্রভঞ্জন ।। না।

মংলা ।। প্রভঞ্জন!

প্রভঞ্জন ।। রংকু, ভীমা, সাটোর।

[ধর্মগোলা অবরোধ করবার জন্য মংলা চেঁচিয়ে ওঠে]

মংলা ।। ধর্মগোলা!

গণনাট্যের সংগ্রামী ভাষার এটি একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।

রত্নার একাধিক সংলাপে লোকসংস্কার-লোকপ্রবাদ প্রতিধ্বনিত হতে শুনি।

জ. বহুরূপীর দলকে দশরথ রক্ততিলক পরিয়েছে। অতঃপর তাদের লৌকিক বৃন্দগান। রক্তের রঙ লাল। এই লাল রং বিপ্লব-বিদ্রোহের চিহ্ন। আসন্ন কৃষক-বিদ্রোহের কথা মনে রেখে, লোকশিল্পীদের ললাটে এই রক্ততিলকের ব্যবহার নাট্যানুগ। গণনাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য গ্রন্থের ভূমিকায় আশা প্রকাশ করেছিলেন—

সুরাসুরের যুদ্ধে আজকের মানুষ দেবীকে চিনে নিতে ভুল করবে না। তাঁর আশা যে পূর্ণ হয়েছে, তার প্রমাণ 'দেবীগর্জনে'র ব্যাপক জনপ্রিয়তা। আর তার পিছনে রয়েছে প্রভূত লোকনাট্যের উপাদানের সার্থক প্রয়োগ।

৩০২.৩.১২.২ : প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবন : একই শ্রেণীর দুই চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

প্রভঞ্জন :

শোষক ও অত্যাচারী জোতদার মহাজন। চরিত্রটি আগাগোড়া অবিবর্তিত। নতুন পঞ্চায়েতে কৃষকদের দাবী শেষ পর্যন্ত না মানায় তার পরাজয় ও মৃত্যু।

প্রভঞ্জন শুধু শোষক নয়, সে দেহবিলাসী। বহু নারীর সর্বনাশ সে করেছে। যুগের ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনে তার চরিত্রের বদল না ঘটলে যে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী সেকথা ত্রিভুবন তাকে বারবার বললেও সে শোনেনি। রত্নাকে ভোগ করতে যাওয়ায় তার প্রতি স্বামী মংলার ক্রোধ তীব্র হয়।

'কর্জ ধানের সুদের দায়ে আধিয়ারের' মাথা সে ফাটিয়ে দেয়। সাক্ষী ত্রিভুবন। এ ক্ষেত্রেও সে প্রভঞ্জনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে। কিন্তু প্রভঞ্জন তাতেও নিরস্ত হয় না। সে কৃষক হত্যার স্বপ্ন দেখে। এটাও তার বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। প্রভঞ্জনের অহংকার আকাশস্পর্শী। তার সর্বত্র 'মঙ্গলগ্রহে ইজারা নিব।'

প্রভঞ্জন হত্যার সময় পুলিসের অনুপস্থিতিতে সমালোচকদের কেউ কেউ অস্বাভাবিক ভেবেছেন। কিন্তু সর্বহারা কৃষকের হাতে জমিদার-জোতদার-নিধন বাংলাদেশে অনেক ঘটেছে। সে আর এক ইতিহাস।

ত্রিভুবন :

নাটকে সে প্রভঞ্জনের দোসর প্রায় শেষাংশ পর্যন্ত। তবে শেষে সে আত্মরক্ষা করার জন্য মঞ্চ ছেড়ে পালিয়েছে।

একদিকে ত্রিভুবন অন্নদাতাকে রক্ষা করার জন্য চাষীদের বোঝায়। নতুন পঞ্চায়েতের সভায়। অন্যদিকে সর্দারকে বলে ত্রিভুবন এখন আর ত্রিভুবন নাই। বহু আঘাতে পোড়খাওয়া চাষীরা অবশ্য তার কথায় ভোলে না। তার চতুর বক্তৃতায় কোন কৃষক বিভ্রান্ত হলে সঞ্চারিয়া তাদের সামনে প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের মুখোশ খুলে দেয়।

ত্রিভুবনও রত্নার রূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। সর্দারের বাড়ি থেকে প্রস্থানের সময় রত্নার প্রতি উক্তিটি তার প্রমাণ। রত্নাকে খোলানে কাজ দেওয়ার প্রস্তাবে তার অভিসন্ধি আরও দৃঢ় হয়। আবার রত্নার প্রতি প্রভঞ্জনের লালসা বিস্তারিত হওয়ায় একইভাবে সে ক্রোধ প্রকাশ করে।

প্রভঞ্জন বুদ্ধিহীন তাই সদরে কাজকর্মের জন্য ত্রিভুবনকে তার প্রয়োজন। এজন্য ত্রিভুবনের অহংকারও কম নয়। সেই জোরেই অন্নদাতার মুখের ওপর কথাও বলতে পারে।

ত্রিভুবন চতুর। কালসচেতন। তার সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত। ভিলেন চরিত্রের সব লক্ষণই তার আচরণে ও সংলাপে মেলে। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের কিছু সংলাপ তুলে দুটি চরিত্রের স্বরূপ বোঝানো যায়।

প্রথমতঃ শোষক প্রভঞ্জন ধান মাপবার বাটখারার ঘাটতি হলে কৃষক মনাকে পাল্লায় চাপায়। এমনকি তার বুকে পাথর বসায়। নির্লজ্জ মহাজনের সংলাপ ভয়াবহ—

[প্রভঞ্জনের নির্দেশে মনাকে পাল্লায় চাপান দেওয়া হয়]

....এইবার ঠিক হইয়েছে বাটখারাঠো। (হাসে)

মনা ।। (চিৎকার করে) আঁই দেখ, বাটখারা বানাইল দেখ....ই দেখ বাটখারা বানাইছে, দেখ...

প্রভঞ্জন ।। (ধমকে) আরে চাপি বসেক খাসিটা! সরেস বাটখারা। আমার ধানঠো ই বাটখারায় মাপিবার হয়। চাপা পাথর।

অন্যদিকে শোষকের অনুচর হলেও ত্রিভুবন অন্ধ নয়। সে জানে কৃষকের উপর এই সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার আর চলবে না। নিম্নোক্ত সংলাপে তার দূরদৃষ্টির আভাস আছে —

ত্রিভুবন।। বুলছিলম বুদ্ধির কথাঠো। আগেও বুলেছি, এখনও বুলছি— পঞ্চায়েতী শাসন তোমাক এখনই চালু করিবার হয়। কেন কী, অভাব আর অভিযোগের বহরঠো যে পরিমাণ বাড়ি যাঁইছে, তাত করি দায়িত্বটা তুমার নিজের উপুর রাখাটা আর উচিত হয় না জানিবে।

দ্বিতীয়তঃ এই দুই চরিত্রেই নারীতে আসক্ত। কিন্তু ত্রিভুবনের দেহলালসার বহিঃপ্রকাশ এতই নগ্ন নাট্যকার বর্ণনায়, সংযমের সাহায্যে তার পরিণতি এঁকেছেন। কিন্তু রত্নার প্রতি ত্রিভুবনের আকর্ষণ থাকলেও তা ধর্ষকামীর মত নয়, বরং ইঙ্গিতধর্মী —

ত্রিভুবন।। হঁ হঁ, ভুলে গেঁইছিলম কথাঠো। আচ্ছা তো আসি সর্দার! (হাসে) টুকচা বউ, সুন্দর বউ, খাসা বউ!

[সর্দারের চোখে প্রশ্ন। গিরিরও সেই একই প্রশ্ন। ত্রিভুবনের প্রস্থান।]

তৃতীয়তঃ নতুন পঞ্চায়েতে অনেক বাক্যজাল বিস্তার করেও ব্যর্থ ত্রিভুবন নিজেকে সঠিক সময়ে সরিয়ে নিয়ে বেঁচে গেল। কিন্তু বুদ্ধিহীন, শক্তিগর্বী প্রভঞ্জন কৃষক সমাজের কঠোর ফাঁদ ছেড়ে বার হতে পারল না, নিহত হল।

৩০২.৩.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'দেবীগর্জন' নাটকে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য কতখানি আছে?

২। 'দেবীগর্জন'-এ প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবন একই শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়েও একই ছাঁদের চরিত্র নয় কেন?

৩। 'দেবীগর্জন' নাটকটির মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৩০২.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত—ড. মন্দিরা রায়।

২। কালজয়ী বাংলা নাটক ঃ পুনর্বিচার — ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

৩। নাট্য আকাদেমি পত্রিকায় (৫ম সংখ্যা)—ড. দর্শন চৌধুরীর প্রবন্ধ 'দেবীগর্জন ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য'।

৪। দুই দশকের বাংলা নাটকের বিবর্তন — ড. গীতশ্রী দে সরকার।

৫। বিজন ভট্টাচার্য — রণেশ দাশগুপ্ত।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

নাট্যকার ও রাজরক্ত নাটকের আখ্যানের পরিচয়

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৩.১ : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক নাটকের ইতিহাস

৩০২.৪.১৩.২ : মোহিতের ব্যক্তিজীবন ও নাট্যকার হয়ে ওঠা

৩০২.৪.১৩.৩ : 'রাজরক্ত'—কাহিনী বয়নে মুন্সিয়ানা

৩০২.৪.১৩.৪ : 'রাজরক্ত'—গঠন কৌশলের অভিনবত্ব

৩০২.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৩.১ : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক নাটকের ইতিহাস

ইংরেজদের বিনোদনের জন্য ইংল্যান্ডের থিয়েটারের আদলে কলকাতায় নাট্যমঞ্চ তৈরি করে নাটকের অভিনয় শুরু হয়। কিন্তু নিছকই আনন্দ উপভোগ করাই ছিল এ ধরণের নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য। নাটকের কলা কৌশল ও অভিনয় রীতির চাইতে ফুর্তি ও ক্ষণিকের আনন্দের জন্যই এইসব অভিনয়রীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু মজার জিনিস ঘটে এখানেই। কলকাতার থিয়েটারের আদলে অর্থাৎ বলা ভালো ইংল্যান্ডের থিয়েটারের আদলে জমিদাররা তাঁদের বাড়িতেও মঞ্চ বাঁধলেন। কিন্তু সেখানেও জমিদারের সখ শৌখিনতার উপরে নাটকের অভিনয় নির্ভর করত। এরপর ধনিক শ্রেণির মানুষের ভাবনা অনুসারে জমিদারের সখের থিয়েটার থেকে পেশাদারী থিয়েটারের যুগে আমরা প্রবেশ করলাম।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে এক বিশাল সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। যখন বিদেশে বিশেষত জার্মানী, গ্রীস, জাপান, ইতালিতে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বিদেশের মতো আমাদের দেশেও ইংরেজদের অত্যাচারে ভারতবাসীদের নাভিশ্বাস উঠেছে তখন অনেক বাঙালিই মনে মনে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সেসময় বাঙালিদেরও যুদ্ধের পরোক্ষ ফলাফল ভোগ করতে হয়েছে। সমাজে দেখা দিয়েছে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট, মনুষ্যত্বের অবমাননা। মনুষ্যসৃষ্ট মহামারী, দুর্ভিক্ষে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষেরা কালোবাজারী, মুনাফাখোর মজুরদারীদের চক্রান্তে সর্বস্ব হারিয়েছে। এসময় বলশেভিকদের বিজয়ী হওয়া বাঙালিদের অনুপ্রেরণা যোগায়। তারাও তখন বিভিন্ন সাম্যবাদী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। সাংস্কৃতিক কর্মীরাও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। নাচ-গান-নাটকের মাধ্যমে তারা মানুষের

দুঃখ কষ্টের কথা যেমন তুলে ধরেন, ঠিক তেমনি সম্মিলিত প্রতিবাদের জন্য গ্রামে গঞ্জে ছুটে গিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে অত্যাচারীর মুখোশ তুলে ধরতে লাগলেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। গণনাট্য সংঘ মূলতঃ মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র মানুষেরই সামনে তুলে ধরে তাদের মধ্যে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত করতে চেয়েছিল। শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু অচিরেই গণনাট্য সংঘের প্রধান অগ্রণী ব্যক্তিদের খবরদারি সুলভ মনোভাব, সুদূর প্রসারী সাংস্কৃতিক নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে গণনাট্য সংঘের উদাসীনতা, শিল্পীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষায় গণনাট্য সংঘ ভেঙে যায়। সংঘ ভেঙে তৈরি হয় ছোট ছোট গ্রুপ। যেমন বহুরূপী, এল.টি.জি., নান্দীকার ইত্যাদি।

গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে এসে শিল্পীরা স্বস্তি বোধ করলেন। তারা নাটককে আর গণসংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলতে চাইলেন না। বরং শিল্প হিসেবে নাটককে মঞ্চস্থ করতে চাইলেন। শুরু হলো নবনাট্য আন্দোলন। গণনাট্য আন্দোলনে মূল ঝোঁক ছিল 'গণ'র দিকে আর নবনাট্য আন্দোলনে 'নব' অর্থাৎ নতুনতর আঙ্গিকের দিকে। যাবতীয় ভাবনাচিন্তা শুরু হলো নাটককে নিয়ে। সবাই শিল্পের জন্য মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। ব্যক্তিগত হতাশা, ট্রাজেডি, সমাজের নানা অনুপুঙ্খ বিষয়কে শিল্পীরা মঞ্চে তুলে ধরলেন। কিন্তু শ্রেণিহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প গণনাট্য শিল্পীরা নিয়েছিলেন তা থেকে তারা দূরে সরে এলেন। নবনাট্য কর্মীরা মূলতঃ নাটকের বিষয়, মঞ্চসজ্জা, সেট-সেটিংস, প্রযোজনার খুঁটি নাটি, অভিনয় কৌশল ইত্যাদি কী করে আরও উচ্চমানের করে তোলা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করলেন যা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

নতুন উদ্যমে নতুন ভাবে পথচলা শুরু হলো। প্রধান দায়িত্ব নিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সহযোগী ভূমিকায় শম্ভু মিত্র, কলিম শরাফিরা। পরে একে একে এগিয়ে এলেন অশোক মজুমদার, অমর গাঙ্গুলী, তৃপ্তি মিত্ররা। আস্তানা গড়ে উঠল ১১/১ নাসিরুদ্দিন রোডের বাসগৃহে। পেশাদারীভাবে নাটক করে লভ্যাংশের টাকায় থিয়েটারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের পারিশ্রমিকও দেওয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হলো।

অশোক মজুমদার প্রযোজকের দায়িত্ব নিলেন এবং নাট্যদলটির নাম রাখা হলো 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়'। তারা রঙমহলে মঞ্চস্থ করল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি। এই নাটকটির প্রযোজনার সূত্রে আরও অনেকে নাট্যদলে যোগদান করলেন। যেমন রবীন মজুমদার, ঋত্বিক ঘটক, মুক্তি গোস্বামী, কালীশঙ্কর প্রমুখরা। তবে এই নাটকটির প্রযোজনায় সর্বদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শম্ভু মিত্র। কিন্তু 'নবান্ন' নাটকটির অভিনয়ের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ না দেখে দলের কর্মীরা স্থির করেন পেশাদারিত্বের পথ ছেড়ে দিয়ে তারা পরীক্ষামূলকতার পথ অবলম্বন করবেন। অনেক পরিমার্জনের পর তুলসী লাহিড়ীর লেখা 'পথিক' (রেলওয়ে ম্যানশন ইনিস্টিটিউট প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়, ১৯৪৯, ১৬ অক্টোবর) নাটকটির সফল প্রযোজনা 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' দলটিকে প্রতিষ্ঠা দিল। পরে দলটির নাম পাল্টে রাখা হয় 'বহুরূপী' (১৯৬০, ৬ মে বহুরূপীর জন্মদিন)। বহুরূপীর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের শুভ সূচনা বা সূত্রপাত ঘটল। কিন্তু প্রসঙ্গত ভুলে গেলে চলবে না যে বহুরূপী প্রতিষ্ঠার আগেই কিন্তু 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ' তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এও ঠিক তারা তখনও বাংলা থিয়েটারের সদস্য হয়নি। তারা বিদেশী নাট্যকারদের নাটকগুলির মূলতঃ ইংরেজি অভিনয় করত। ধীরে ধীরে অন্যান্য

দলগুলিও (গন্ধর্ব, শৌভনিক, রূপকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ) তাদের অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারকেই সমৃদ্ধ করতে লাগল।

গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। গণনাট্য সংঘের মঞ্চে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'সেতুবন্ধন' নাটক দুটিতে অভিনয় করেন। পরে তারই কঠিন পরিশ্রমের ফলে নান্দীকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নান্দীকার গড়ে ওঠে ১৯৬০ সালের ২৯শে জুন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বি.কে.পাল এভিনিউ-এর মামার বাড়িতে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, সত্যেন মিত্র, দীপেন সেনগুপ্ত, অজয় গাঙ্গুলী প্রমুখের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নান্দীকার গড়ে ওঠে।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার তৈরির সময় থেকে আমাদের মনে অনেক ভালো প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই বিতর্ক দানা বাঁধে। বিতর্কটা ছিল শিল্প বনাম রাজনীতির তথা গণনাট্য বনাম সৎনাট্যের। বহুরূপীই প্রথম সৎনাট্য কথাটা ব্যবহার করে। প্রথমদিকে ভালো নাটক ভালোভাবে করার মানসিকতা নিয়ে নান্দীকারের কয়েকটি রাজনৈতিক নাটক যেমন 'ব্যাপিকা বিদায়', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' অভিনীত হতে দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা শুধু ভালো নাটক করতে চাওয়ার জন্য সৎনাট্য থেকে অনেকটা দূরে সরে আসে। গণমানসে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে বহুরূপী প্রথমদিকে 'ছেঁড়া তার', 'পথিক', 'উলুখাগড়া' অভিনয় করলেও পরে শম্ভু মিত্র অনুভব করেন ব্যক্তিগত সমস্যা ব্যক্তির মনস্তত্ত্বকে নাটকে রূপ দেবার। তাই তারা মঞ্চস্থ করে 'দশচক্র' নাটকটি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং বিদেশী নাটকগুলিকেও তারা মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হন। এ উদ্যোগ নান্দীকারও নিয়েছিল। বহুরূপী বহুদিন ধরে শৃঙ্খলাপরায়ণতার সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করে থিয়েটারের জগতে এক যথার্থ মডেল তৈরি করতে পেরেছিল যা সত্যিই আশ্চর্যজনক। নাট্যপ্রয়াসে কুশলতার গুণে উৎপল দত্তের 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ'ও নব আদর্শ স্থাপন করে। নিজস্ব মঞ্চে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দর্শকদের সামনে নবতম আঙ্গিকে নাট্যোপস্থাপনা করেছিল 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ'।

গণনাট্য সংঘের ভাঙনের ফলে নতুন কয়েকটি দল তৈরি হলো। যেমন 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (বিজন ভট্টাচার্য), 'থিয়েটার ইউনিট' (শেখর চট্টোপাধ্যায়), 'দশরূপক' (পরেশ ধর) ইত্যাদি। গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার সময়ে যে প্রত্যাশা নাট্যপ্রেমী দর্শকদের মনে তৈরি হয়েছিল ধীরে ধীরে তা অন্য দিকে বাঁক নিতে শুরু করে।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে বিতর্ক শুধু রাজনীতি ও শিল্প নিয়েই নয়, বিতর্ক তৈরি হয়েছিল প্রসেনিয়াম মঞ্চ নিয়ে এবং অভিনয়ের প্রয়োজনে গ্রামে-গঞ্জে যাওয়া নিয়েও। প্রথমদিকে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা ও দর্শকদের সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নান্দীকারও গ্রামে গঞ্জে গিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে উৎসাহে ভাটা পড়ে। শুরু হয় বিতর্ক। কিন্তু সমস্যা উপলব্ধির মর্মমূলে প্রবেশ করলে দেখা যায় গ্রুপ থিয়েটারগুলির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী বা বেসরকারী অফিসে চাকরী করায় তাদের ছুটির দিন ছাড়া গ্রামে গিয়ে নাট্যমঞ্চস্থ করা প্রায় অসম্ভব কর্ম ছিল। এমনকি গ্রুপ থিয়েটারগুলি যে নাটক মঞ্চস্থ করবে বলে ঠিক করে সেগুলির সেটসেটিংস ব্যয়সাপেক্ষ ও বহনযোগ্য নয় বলে, এমনকি গ্রামে সেই অনুযায়ী মঞ্চ না থাকায় তা গ্রামে নিয়ে গিয়ে অভিনয় করা ছিল দুঃসাধ্য কর্ম। তাছাড়া প্রসেনিয়াম মঞ্চ ত্যাগ করে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় প্রদর্শন নিয়েও বিতর্ক দানা বাঁধলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলা থিয়েটারে অঙ্গনমঞ্চ ধারণার প্রবর্তক বাদল সরকার।

বাদল সরকার ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ (১৯৬৩) নাটকের বিষয়, প্রকরণ, চরিত্র, সংলাপে নতুনত্ব নিয়ে এলেন। এই সময়েই মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

৩০২.৪.১৩.২ : মোহিতের ব্যক্তিজীবন ও নাট্যকার হয়ে ওঠা

১৯৩৪ সালের পয়লা জুন পূর্ববঙ্গের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় (যদিও পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মোহিতবাবুর জন্ম ১ জুন ১৯৩৬)। তাঁর মা রেণুকা চট্টোপাধ্যায় ও বাবা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাদের বাসস্থান ছিল ফকিরবাড়ি রোডে।

১৯৪০ সালে তিনি বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছোটবেলায় মোহিত লাজুক, শীর্ণকায়, মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন। তাঁর মনের সাহস ছিল অপরিসীম। সারা দেশব্যাপী যখন সবাই স্বাধীনতা লাভের জন্য মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই উত্তাল সময়েই, অর্থাৎ ১৯৪৭-এর জুন মাস নাগাদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ফকিরবাড়ি থেকে সবাইকে নিয়ে কলকাতার দিকে যাত্রা শুরু করেন। এখানে এসে চিৎপুর অঞ্চলে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটে ‘ভাঙাচোরা বারোয়ারি দুর্গের’ মতো বাড়িতে ওঠেন। উত্তর কলকাতার সিটি কলেজে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এসময় তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, শিবশম্ভু পালের মতো এক ঝাঁক প্রতিভাবান তরুণ কবি। তাঁরা সবাই মিলে ক্লাসের পর চুটিয়ে আড্ডা দিতেন শ্যামবাজারের কফি হাউসে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোহিতের নিবিড় বন্ধুত্ব তাঁকে বাংলা কবিতার প্রতি আসক্ত করে তোলে। ১৯৫৩ সালে একদল তরুণ কবি ও গল্পকারের প্রচেষ্টায় কৃত্তিবাস পত্রিকার পথচলা শুরু হলে তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রধানতম কবি হয়ে ওঠেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এদিকে সিটি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর একদিকে মোহিত যেমন সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হন, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকুরির পাশাপাশি প্রাইভেটে এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া থেকে শুরু করে কৃত্তিবাস-সহ অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের জন্য কবিতা লেখাও সমানতালে চালিয়ে যান। ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্র নির্দেশিত বহুরূপী-র ‘রক্তকরবী’ নাটকের নাট্যাভিনয় এবং ২৬ অগস্ট ১৯৫৫ সালে বসুশ্রী-বীণাশ্রী সিনেমা হলে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘পথের পাঁচালী’ ছবি দেখে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষভাবে মোহিত ও উদ্দীপিত হন। ১৯৫৬ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্র দত্তের বিশেষ সহায়তায় ২৬টি কবিতা সম্বলিত, ৪৮ পৃষ্ঠার তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ ‘আষাঢ়ে শ্রাবণে’ প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর বাবাকে। ১৯৬১ সালে কৃত্তিবাস-এর পক্ষ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ প্রকাশ করেন। এবারে মোহিত গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর ‘মা’-কে। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অঙ্কন শিক্ষা’ পথম প্রকাশ করেন দেবকুমার বসু সম্ভবত ১৯৬০-৬১ সালে। তাঁর কবিতা লেখা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন

“শুরুতে কেবল কবিতা-ই লিখতাম। সময়টা ছিল ১৯৫০-এর দশক। তখন কবিতার মায়াবী প্রণয়ে আমরা আকণ্ঠ ডুবে আছি। কবিতা লেখা আর কবিতা পড়া-কী প্রবল টান ছিল তার। Then we have been eating poetry and ink ran from the corners of our mouth. গদ্য লেখায় মন চাইত না। ভেতরে

অহংকার Maugham-এর কণ্ঠস্বরে বলতে চাইত "The writer of prose can only step aside when the poet passes" (মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ', নাট্যচিন্তা, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বাস্তবতা, জানুয়ারি, ২০০৬)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিকৃতি সম্পর্কে লেখেন—

"কবিতা রচনার সময় সে ছিল সর্বাঙ্গীণ রোমান্টিক। তখন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দের কবিতা ছিল আমাদের মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতন, তার নিচে আমরা শিশুর মতন খেলা করতাম। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করে আমরা সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। মোহিত সেই পত্রিকার একজন প্রধান কবি ছিল। উঁচু গলার দিকে ঝোঁক, চমকানো শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা; মোহিতের কবিতা শান্ত, নিচু গলার, কিছুটা বেদনার্ত।" (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আবার কবিতায় ফিরবে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ, পুস্তক বিপণি, ভাদ্র ১৪০০)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাই প্রথমে কবি, পরে নাট্যকার। প্রথম জীবনে তিনি আকণ্ঠ কবিতাতেই ডুবে ছিলেন। মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখলেও নাটক লেখার কথা মাথাতেও আসেনি। দেশি-বিদেশী গ্রন্থপাঠে একসময় তিনি উপলব্ধি করলেন কবির কবিত্বশক্তিকে অনায়াসেই নাটকের অবয়বে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু সেসময় বাংলা নাটকে তিনি প্রথানুগত্যের বাড়াবাড়ি ও রিয়ালিজমের বাইরে বাংলা নাটকের অভাব বোধ করলেন। তিনি মনে করেন—

"থিয়েটার একটা আবিষ্কার, থিয়েটার যে নানামুখী, থিয়েটারের যে শত সহস্র পাঠ রয়েছে এবং কীভাবে একটা জীবন্ত অডিও ভিসুয়াল মিডিয়া ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন আবিষ্কারের জগৎকে নিয়ে আসে এইগুলো আমি আমাদের থিয়েটারে আছে বলে মনে করতাম।" (নাটক নিয়ে কথা, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, অনুস্টুপ, ১৪১১, পৃষ্ঠা - ৯৮)

কবিতা লেখার অভ্যেস তাঁকে কি করে নাটক রচনার তাগিদ জুগিয়েছে সে সম্পর্কে তিনি লেখেন—

"একজন কবির মনের মধ্যে যে কল্পনার জগৎ থাকে, একটা আলাদা কণ্ঠস্বর, আলাদা চোখ, আলাদা মন তৈরি হয়ে যায়, সেই মন, কণ্ঠস্বর যা কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি অর্জন করেছিলাম সেটাকেই পুঁজি করে নাটক লেখার চেষ্টা করলাম ও লিখে ফেললাম।" (নাটক নিয়ে কথা, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, অনুস্টুপ, ১৪১১, পৃষ্ঠা - ৯৮)

নাট্যকার সত্তা ও কবি সত্তা কিভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করেও বেঁচে থাকে সেই সংকটের বর্ণনা দিতে গিয়ে মোহিত লেখেন—

"আমার সংকটটা ভাবুন—আমি যদি কবিতাকে ছেড়ে যাই। যাওয়া কি সম্ভব? একজন ভীষণ ভালবাসার প্রেমিককে পেছনে ফেলে রেখে চলে যাওয়া খুব কঠিন। ... আমি তখন সেই ঘরবাড়ি খুঁজতে খুঁজতে কোথায় নিয়ে সেই প্রেমিকাকে রাখি, থাকা যায় করতে করতে দেখলাম এক ধারার নাটক আছে যেখানে একজন কবি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতে পারে। সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু কবিতার সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক রাখা যায়, তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তাকে আগের মতো করে দেখতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু হেসে হেসে কথা হতে পারে। ইঙ্গিতে, সংকেতে — হালকা ছোঁয়ায় গভীর মুহূর্ত একটা টংকার দিয়ে জেগে উঠতে পারে। আমি তখন নাটক লিখতে আরম্ভ করলাম।"(মোহিত চট্টোপাধ্যায়, আমার নাটক লেখা, রঙ্গপট নাট্যপত্র, ২০১২, পৃষ্ঠা — ৮১)

কবিতা রচনার পাশাপাশি চলতে থাকে নাটক নিয়ে প্রবন্ধ লেখা। অসীমকুমার বসু সম্পাদিত নাট্য ভাবনা নাট্যপত্রে অ্যাবসার্ড নাটক শিরোনামে যে নিবন্ধ লেখেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সেটিই তাঁর নাট্যবিষয়ক প্রথম নিবন্ধ রচনা। পরে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে বহুরূপী নাট্যপত্রিকার ১৫ সংখ্যায় 'মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' শিরোনামে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দ্বিতীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অশোক মুখোপাধ্যায়, নভেম্বর ১৯৯০ /২০০১ এ তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন—

"...সেটা বোধহয় একষট্টি সাল ১৯৬৩ একদিন শুনলাম মোহিত চট্টোপাধ্যায় নান্দীকারে আসবেন নাটক পড়তে। এদিক ওদিক একটু-আধটু শুনছিলাম অবশ্য যে কবি মোহিত মাঝে মধ্যে নাটক লিখছেন। তাদের নাকি সব অদ্ভুত নাম। নাটকগুলিও নাকি অদ্ভুত। জল্পনা-কল্পনার নিরসন ঘটিয়ে মোহিত নান্দীকারের শ্যামপুকুরের ঘরে এলেন ও পড়লেন দুটি ছোটো নাটক : কণ্ঠনালীতে সূর্য ও বৃত্ত। নাটক দুটির কথা আজ আর ভালো মনে নেই। কিন্তু সেই তরুণ নাটককারের হাস্যময় বুদ্ধিদীপ্ত মুখটি মনে আছে।..."

এই স্মৃতিকথায় সামান্য বিভ্রান্তি থাকলেও একথা সবারই জানা যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'কণ্ঠ নালীতে সূর্য' প্রথম প্রকাশিত হয় গন্ধর্ব পত্রিকার শারদ সংখ্যায় ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে। এই নাটকটি প্রসঙ্গে পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন—

"গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলার মতো, জীবনানন্দের কবিতার মতো, সুকুমার রায়ের ছড়ার মতো কিংবা আয়োনেস্কোর অসম্ভব সিচুয়েশন সৃষ্টির মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এই বাংলা নাটকটির রচয়িতা একজন কবি। গন্ধর্ব এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্বও দিয়েছেন আর একজন কবির ওপর। একটি ভালো কবিতার মতোই এই নাটকের পস্টারিটি। ইন্দনীল চট্টোপাধ্যায় গন্ধর্ব-র এই নতুন প্রযোজনায় পরস্পরবিরোধী মন্টাজ যোজনার মধ্য দিয়ে অভিনব প্রয়োগকল্পনার প্রস্তাব নিরূপণে ব্রতী।" (গন্ধর্ব, শারদ সংখ্যা, ১৯৬৩)

১৯৬৪ সালে 'উইল শেকসপিয়র : একটি কল্পনা' নামের এক অনবদ্য কাব্যনাট্য মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন ক্লিমেন্স ডেনের রচনার অনুসৃজনে। তিনি তখন মুর্শিদাবাদে জঙ্গিপুর কলেজের শিক্ষক। ইংল্যান্ড থেকে নীতীশ দত্তের পাঠানো ইংরেজি বইটির অসামান্য ভাষান্তর করেন মোহিত। পরে মোহিত লেখেন 'শেকসপিয়রের সিঁড়ি'। শ্যামল ঘোষ তাঁর 'স্মৃতিসত্তানাট্য'তে লিখেছেন—

"মোহিত তখন ভয়ংকর কবিতা লেখে। যেহেতু কাব্যনাটক ওউইল শেকসপিয়রপ্ল কবিতার সঙ্গে পুরো জিনিসটা একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল।...গন্ধর্ব আর নান্দীকার এক সঙ্গে মিলে কাজটা করা যায় কী না... খুব বড় টিমের দরকার ছিল। এই কাজটাই মোহিতকে কবিতা থেকে নাটকে আসবার জন্যে একটা সিঁড়ির কাজ করেছিল।" ('স্মৃতিসত্তানাট্য', শ্যামল ঘোষ)

১৯৬৪ সালে মোহিত আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক লিখে ফেলেন — 'মৃত্যুসংবাদ' ও 'নীল রঙের ঘোড়া'। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় 'নক্ষত্র' নাট্যগোষ্ঠী ১৯৬৫ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করে। এটিই মোহিতের নাটকের মধ্যে প্রথম থিয়েটারে মঞ্চস্থ হওয়া নাটক। শ্যামল ঘোষ লিখেছেন—

"পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সবাই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেন নবীন নাট্যকারকে। সেই শিরোপা মাথায় নিয়ে এভাবেই বাংলা থিয়েটারে কবি মোহিতের বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে দর্পিত পদক্ষেপ শুরু হল।" (বিমোহিত কথকথা, শ্যামল ঘোষ, আজকাল, ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৯)

শ্যামল ঘোষের প্রচেষ্টাতেই মোহিতের 'মৃত্যুসংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'সোনার চাবি', 'ক্যাপ্টেন হুর্রা', 'সোক্রাতেস' প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলা থিয়েটারে মঞ্চ, অভিনয় সবক্ষেত্রেই এক অদ্ভুত থিয়েটারি প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। বিষয়ের নতুনত্ব, চরিত্রের উদ্ভটত্ব, সংলাপের কাব্যিক মাধুর্য, নাগরিক বুদ্ধি ও কৌতুকে বাঙালি নাট্যামোদী দর্শকরা আপ্লুত হয়ে গেল।

নাটকের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসায় মোহিত লিখে চললেন একের পর এক অনুনাটক, কখনো পূর্ণাঙ্গ কখনো স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। কখনো মঞ্চের তাগিদেই লিখে ফেললেন একাঙ্ক নাটক। পাশাপাশি চলতে থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা। কয়েকটি উপন্যাস ও চিত্রনাট্যও তিনি লেখেন। নীচে তাঁর লিখিত বিভিন্ন নাটক, নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস ও চিত্রনাট্যের তালিকা দেওয়া হল —

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত নাটক

কণ্ঠনালীতে সূর্য (প্রথম নাটক রচনা ১৯৬৩/৬৬), মৃত্যুসংবাদ (১৯৬৪/৬৫/৬৯/২০১১), উইল শেকসপিয়র (অনুসৃজন ১৯৬৪/৭১/৭২/৭৬), নীল রঙের ঘোড়া (১৯৬৪/৬৬), বাইরের দরজা (১৯৬৫/৬৬), মেটামরফসিস (অনুসৃজন ১৯৬৫), রিঙ (একাঙ্ক ১৯৬৫), গন্ধরাজের হাততালি (১৯৬৬/৬৭), সোনার চাবি (১৯৬৬/৯০/২০০৮), চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড (১৯৬৬/৬৭/৭০/২০০৬), দ্বীপের রাজা (১৯৬৮/৬১), সিংহাসনের ক্ষয়রোগ (১৯৬৮), বৃত্ত (অনুসৃজন ১৯৬৮), পুষ্পকরথ (১৯৬৮/৬৯), নিষাদ (১৯৬৮/৬৯), বাঘবন্দী (১৯৬৯/৭১/৭৪), বাজপাখি (একাঙ্ক/১৯৬৯/২০০১),

ক্যাপ্টেন হুর্‌রা (১৯৭০/৭৫/৭৬/৭৭), গিনিপিগ (একাঙ্ক ১৯৭০/৭১-৭৪/৭৯), রাজরক্ত (১৯৭১/৭২/৭৩/৮১), শেকসপিয়র (অনুবাদ পুনর্লিখন ১৯৭২), আলিবাবা (পুনর্লিখন ১৯৭৩/৭৫/৮৮), স্বদেশি নক্সা (নাট্যরূপ ১৯৭৪/৭৯/৮৫/১০), বৃত্তের বাইরে (১৯৭৪। বর্ণবিপর্যয়), যাদুদণ্ড (১৯৭৪ নিষাদ), মৃচ্ছকটিক (সম্পাদনা ১৯৭৫/৯০), মহাকালীর বাচ্চা (১৯৭৭/৭৮/৭৯/৮৮), লাঠি (একাঙ্ক নাট্যরূপ ১৯৭৭/৮০/৯৩/৯৭/২০০৯), মাছি (একাঙ্ক ১৯৭৮/২০১১), গালিলেওর জীবন (অনুসৃজন ১৯৮০/১১), কানামাছি খেলা (১৯৮৩), তৃতীয় নয়ন (একাঙ্ক ১৯৮৪), নোনাজল (১৯৮৪/৮৭/৯২), ভূত (একাঙ্ক ১৯৮৪), ফিনিক্স (একাঙ্ক ১৯৮৪), যশোমতী (একাঙ্ক নাট্যরূপ ১৯৮৪), ঋগ্বেদিক নাটক (কাব্যনাট্য ১৯৮৫), তোতারাম (নাট্যরূপ ১৯৮৬/২০০৯), নাক (একাঙ্ক ১৯৮৯), মল্লভূমি (১৯৮৯), সোক্রাতেস (১৯৮৯/৯২), বমন (১৯৯১), সুন্দর (একাঙ্ক, পূর্ণাঙ্গ ১৯৯১), জোছনাকুমারী (নাট্যরূপ ১৯৯২), তখন বিকেল (অনুসৃজন ১৯৯২), লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (সম্পাদনা ১৯৯২), গুহাচিত্র (১৯৯৩/৯৪), মুষ্ঠিযোগ (১৯৯৩ ঢিসুম ঢিসুম), শমীবৃক্ষ (১৯৯৩), গজানন চরিতমানস (১৯৯৪), কানামাছি (১৯৯৪ একাঙ্ক), শাম ভী থী ধুঁয়া ধুঁয়া (হিন্দি তখন বিকেল ১৯৯৫), দূরবীন (গল্পসূত্র। ১৯৯৬), কাল বা পরও (অনুসৃজন। একাঙ্ক ১৯৯৭ / ৯৮ / ২০০০/০৯), জন্মদিন (অনুসৃজন ১৯৯৭), বিপন্ন বিস্ময় (রচনা সত্তর দশক ১৯৯৮), অক্টোপাস লিমিটেড (একাঙ্ক ১৯৯৮/২০০৯/১২), দর্পণ (একাঙ্ক ১৯৯৯/২০০১), হারুন-অল রশিদ (১৯৯৯/২০০৩/০৯), সিদ্ধিদাতা (১৯৯৯/২০০২), তুষাগ্নি (অনুসৃজন ২০০০ তুষের আগুন), কৌটো (একাঙ্ক ২০০১), মিস্টার রাইট (২০০১/০৩), জাম্বো (একাঙ্ক ২০০১/০৪), দিজ প্রোগ্রাম ইজ স্পন্সর্ড বাই (একাঙ্ক ২০০২), কারাদণ্ড (২০০৩), গণশত্রু (সম্পাদনা-পুনর্লিখন /২০০৩/০৫), ঘুম (২০০৩),

জুতো (একাঙ্ক ২০০৩), কালের যাত্রা (সম্পাদনা ২০০৩), বাণভট্ট (২০০৩/১২), কালো ব্যাগ (অণুনাটক ২০০৪/০৭/০৯), তুষের আগুন (অনুসৃজন পুনর্লিখন ২০০৪), মানময়ী গার্লস স্কুল (সম্পাদনা ২০০৪), মিসেস সোরিয়ানো (সম্পাদনা ২০০৪), শেষরক্ষা (সম্পাদনা ২০০৪), একটি মাথা দুটি ছাতা (অণুনাটক ২০০৫/১১), দাহ (২০০৫/২০০৯), পুনর্জন্ম (সম্পাদনা ২০০৫), ভালোমন্দ (একাঙ্ক ২০০৫), মেঘ (সম্পাদনা ২০০৫), যদুপতি (২০০৫), লাইসিসট্রাটা (অনুসৃজন ২০০৫ অসম্পূর্ণ), উড়ো মেঘ (অণুনাটক, ২০০৬), এই ঘুম (২০০৭ ঘুম), মৌমাছি (অণুনাটক ২০০৭), সমান্তরাল (একাঙ্ক ২০০৭), হীরামন (একাঙ্ক ২০০৮), সেলফোন (২০০৮/০৯ একাঙ্ক), আওরঙ্গজেব (পুনর্লিখন-সম্পাদনা ২০০৮), এবং সক্রেটিস (২০০৮), ট্রিপল 'ড' (একাঙ্ক ২০০৮), ফুলিশ (একাঙ্ক ২০০৮ তুষাগ্নি), বঙ্কুবাবু এলেন (২০০৮), ভেনিসের বণিক (অনুসৃজন ২০০৮/২০১১), গ্রহণ (একাঙ্ক ২০০৯), বর্ণ বিপর্যয় (একাঙ্ক ২০০৯), বিধাতা পুরুষ (একাঙ্ক/ পূর্ণাঙ্গ ২০০৯), ষোল পাতা (অণুনাটক ২০০৯), সরল অঙ্ক (একাঙ্ক ২০০৯), ভূতনাথ (২০১০), মায়ের মতো (২০১১), তথাগত (২০১১ শেষ রচনা), মুক্তিদীক্ষা (সম্পাদনা ২০১২), মুখ (অণুনাটক ২০১২), ছুটি (স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক), টাট্টু (একাঙ্ক। সত্তর দশকে লেখা), ঢিসুম ঢিসুম (একাঙ্ক, প্রকাশ 'গন্ধর্ব' মুষ্ঠিযোগ), তোতাকাহিনি (নাট্যরূপ। একাঙ্ক), দুঃস্বপ্ন (কাব্যনাট্য। সত্তর দশক), পদশব্দ (কাব্যনাট্য। সত্তর দশক), মহারাজ (কাব্যনাট্য। সত্তর দশক), রঙিন কাচ (কাব্যনাট্য। সত্তর দশক), রাক্ষস (-), রামায়ণ (পুতুলনাটক CPT), সীতা (পুতুলনাটক CPT)

চিত্রনাট্য

কোরাস (১৯৭৪ মৃণাল সেন), মৃগয়া (১৯৭৬ মৃণাল সেন), ওকাউরি কথা (১৯৭৭ পরিচালনা মৃণাল সেন), পরশুরাম (১৯৮০ মৃণাল সেন), মেঘের খেলা (চিত্রনাট্য-নির্দেশনা ১৯৮০), জেনেসিস (১৯৮৬ মৃণাল সেন), দামু (১৯৯৭ রাজা সেন), আদর্শ হিন্দু হোটেল, আরোগ্য নিকেতন, চেনা অচেনা, জ্যোতির্ময়ী দেবী (T.V. তথ্যচিত্র), শম্ভু মিত্র (T.V. তথ্যচিত্র), সহযাত্রী (টেলি প্লে), সুচিত্রা সেন (T.V. তথ্যচিত্র), সুবর্ণলতা, হেডমাস্টার (টেলি প্লে)

অন্যান্য রচনা

কাব্যগ্রন্থ

আষাঢ়ে শ্রাবণে (১৯৫৬ প্রথম কাব্যগ্রন্থ), গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১৯৬১), অঙ্কন শিক্ষা (১৯৬১), কবিতা সংগ্রহ (১৯৯৩ বারুইপুর), ভালোবাসা ভালোবাসা

উপন্যাস

জ্যোৎস্নায় নিদ্রিত ফুল (১৯৬৪ প্রথম উপন্যাস), চৈত্রের উড়ন্ত ফুল (১৯৬৫), বিমলেন্দুর জীবন (১৯৬৭), বৃত্ত

নাট্যগ্রন্থ

দুটি নাটক (১৯৬৫ বীক্ষণ), শবাধারে জ্যোৎস্না (১৯৬৫ দশটি একাঙ্ক), মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্য সংকলন (সমীক্ষণ ১৯৯০), পূর্ণাঙ্গ নাট্যসংগ্রহ (১৯৯১ পাঁচটি নাটক), নাটক সমগ্র-১ (২০০১ মিত্র ও ঘোষ) নাট্যসংকলন, নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (নাট্যচিন্তা ২০০৬), দশরূপক (২০০৯ কলাভৃৎ। দশটি একাঙ্ক)

নিবন্ধ

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে (বহুরূপী ১৯৬৩), অ্যাবসার্ড নাটক ও মৃত্যুসংবাদ (নক্ষত্র ১৯৬৫), নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি (অভিনয় দর্পণ ১৯৬৮), পঁচিশ বছর: নাট্যকারের চিন্তা (বহুরূপী ১৯৬৯), নাটকের বিরুদ্ধে (অভিনয় ১৯৭০), অ্যাবসার্ড নাটক (অভিনয় ১৯৭০), গঙ্গাপদ বসুর নাটক (স্মারকগ্রন্থ ১৯৭২), নাটক প্রসঙ্গে (এপিক থিয়েটার ১৯৭৪), 'অমিতাক্ষর' নাটকের আলোচনা (শূদ্রক ১৯৭৯), রাজনৈতিক থিয়েটার? (থিয়েটার বুলেটিন ১৯৭৯), বিষয়: নাট্যপত্র (থিয়েটার বুলেটিন ১৯৮০), গ্রুপ থিয়েটার ও তার ভবিষ্যৎ (নাট্যচিন্তা ১৯৮২), আমাদের থিয়েটার ও তার সমস্যা (নাট্যচিন্তা ১৯৮৫), ক্ষয় ধরেছে ষাটের দশক (নাট্যচিন্তা ১৯৯০), প্রসঙ্গ গ্রুপ থিয়েটার (সমীক্ষণ স্মারকপত্র ১৯৯০), শ্যামল (শোহন ১৯৯৫), একটি বিপদের প্রতিরোধে (নাট্যচিন্তা ১৯৯৬), শম্ভু মিত্র: শিল্পিত ইতিহাস (আজকাল ২১ মে ১৯৯৭), শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনা (নাট্যচিন্তা ১৯৯৭ শম্ভু মিত্র সংখ্যা), ব্রেখট সম্বন্ধে উপলব্ধি (নাট্যচিন্তা ১৯৯৮ ব্রেখট সংখ্যা), শম্ভু মিত্রের মৌলিক নাটক (গণনাট্য ২০০২), ভাঙা বাক্সে জগন্নাথ (একুশে সংসদ ২০০২), রবীন্দ্রনাট্য: উপেক্ষার সেই তিমিরে (নাট্যচিন্তা ২০০২ রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার), নাটক কি সাহিত্য? (স্যাস ২০০৩), থিয়েটার ও বাস্তবতা (২০০৫), উত্তর আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিক নাটক (২০০৮), নাটকের সংলাপ (পূর্ব পশ্চিম ২০০৯), অণুনাটকের বৈশিষ্ট্য... (অণুনাটক সমাচার ২০০৯ / ১০/১১), আমার নাটক লেখা (রঙ্গপট ২০১০), ছন্নছাড়া নাটক, লিয়েবেদেফের আগের কথা, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বাস্তবতা।

৩০২.৪.১৩.৩ : 'রাজরক্ত' — কাহিনী বয়নে মুন্সিয়ানা

মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন ১৯৭০-৭১ - এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশ্বব্যাপী দুর্বিসহ ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে। মোহিত গণতন্ত্রের ইতিবাচক রূপ খুঁজতেই 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন। মোহিত সমূলে আঘাত করতে চেয়েছেন তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয়।

'রাজরক্ত' নাটকটির দৃশ্য মাত্র দুটি— প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্য। এই দুটি দৃশ্যেই সমগ্র নাট্য কাহিনীর বিন্যাস। নাটকের চরিত্র সংখ্যা পাঁচটি — প্রথম, দ্বিতীয়, ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাস। নাটকটিতে তিনটি শ্রেণী বর্তমান। শাসক— প্রথম চরিত্র যার প্রতিনিধি, শাসকের অনুগত— দ্বিতীয় চরিত্রটি যার প্রতিনিধি, আর শাসিত ও সমগ্র সিস্টেমের বিরোধী— ছেলেটি মেয়েটি ও কোরাস যার প্রতিনিধি।

নাটকের দৃশ্যসজ্জা

প্রথম দৃশ্য জেলখানার চিত্র রাজাসাহেবরূপী প্রথম এবং শাসকের অনুগত দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে প্রথম এবং দ্বিতীয় ছেলেটি ও মেয়েটি ছাত্র-ছাত্রী রূপে অবতীর্ণ পুনরায় রাজাসাহেবরূপী প্রথম জেলখানার চিত্র প্রথম ব্যবসায়ী ও দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতারূপে অবতীর্ণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য জেলখানার চিত্র — দ্বিতীয় পুলিশরূপে অবতীর্ণ দ্বিতীয় বাবা ও ছেলেটি ও মেয়েটি প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে আবির্ভূত দ্বিতীয়ের বিজ্ঞাপনদাতারূপে আবির্ভাব বৃদ্ধের বেশে প্রথম রাজাসাহেবরূপী প্রথম সফিসটিকেটেডরূপে প্রথম, রাজাসাহেবের বেশ।

নাট্য উপস্থাপনা ও চরিত্রগুলির অবস্থান

প্রথম— রাজাসাহেব (শাসকের প্রতিনিধি)

অবস্থান— রাজাসাহেব শিক্ষকরূপে ব্যবসায়ীরূপে বৃদ্ধবেশে রাজাসাহেবরূপে ইন্টারভিউ অধিকর্তারূপে

দ্বিতীয়— রাজার অনুগত (শাসকের ভৃত্য)

অবস্থান— পুলিশ, পাহারাদার, সৈনিক বিজ্ঞাপনদাতারূপে সেপাইরূপে সংবাদপত্রের মালিকরূপে চিকিৎসকরূপে, মস্তিষ্ক ধোলাই বিজ্ঞানীরূপে মধ্যবিত্ত চরিত্ররূপে, পিতারূপে জনতার সঙ্গে বিপ্লবের অগ্রগামীরূপে

ছেলেটি ও মেয়েটি শাসিত শ্রেণীর প্রতিনিধি (বিদ্রোহের সুর)

অবস্থান— প্রেমিক-প্রেমিকা ব্যক্তিগত বিপ্লব থেকে সমষ্টিগত বিপ্লবে সামিল হওয়া

কোরাস (ছেলেটি + মেয়েটি + দ্বিতীয়) জনতা সমষ্টি বিপ্লবের প্রতিনিধি

প্রথমেই নাট্যকার নাটকটির যে মঞ্চনির্দেশ করেছেন সেদিকে নজর দিলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়—

মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে মঞ্চের মাঝখানে রাখা প্ল্যাটফর্ম ও তা থেকে নেমে আসা সিঁড়ি এটাই ইঙ্গিত করে যে শাসকরা সবসময় সাধারণ জনগণের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখে। শাসক ও শোষিতের তাই দ্বন্দ্ব অনিবার্য। তাদের পারস্পরিক লড়াইয়ের অন্ত নেই। কারণ শাসক ও শোষিতের রূপ যুগে যুগে বদলায়, কিন্তু সিস্টেমের পরিবর্তন হয় না।

কালো উঁচু দেওয়াল আসলে শোষণের অন্ধকার। বর্তমান সভ্যতায় ধনতন্ত্রের নখদন্ত সাধারণ মানুষকে যেমন পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে, ঠিক তেমনি ধনতন্ত্র তার ভোগ সুখের নেশায় ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য উঁচু দেয়াল তুলে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক জেলখানা হল সমগ্র ধনতান্ত্রিক কাঠামো, আর জানলা দিয়ে যে আলো প্রবেশ করবে তা আসলে বিপ্লবের ও মুক্তির আলো— যা জনসাধারণের দলবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে এসে প্রবেশ করবে।

'লাল বোর্ড' যেন নিয়ম ও নিষেধের সূচক। পুঁজিবাদী শোষণের করাল রূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে হুকে 'গলার ফাঁস' ঝুলিয়ে। আর প্রশাসনিক ক্ষমতার আস্ফালনের প্রতীক চিত্রায়িত হয়েছে 'পুলিশের টুপি'র ব্যবহারে।

শাসক বা রাজা সাহেবের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে উপরিউক্ত মঞ্চ নির্দেশের সূত্রে। কিন্তু রাজাসাহেবও হয়তো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কারাগারে বন্দী। তার ক্ষমতার মত্ততা বা আস্ফালনের বহিঃ প্রকাশ ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর হাতেও কোন কিছু করার থাকে না। তিনিও সিস্টেমের দাস। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নিরন্তর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাই অব্যাহত।

'গ্লোব'— আন্তর্জাতিক পরিধির সীমাসূচক। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষণের নোংরা ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিয়ে পুরো গ্লোবটাকেই হাতের মুঠোয় ধরবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

'সাদা টেলিফোন রিসিভার' এখানে বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতীক, আর 'লাল চেয়ার' বিপ্লবের প্রতীক। কিন্তু সেই বিপ্লবকে 'শেকল' পরিয়ে রেখেছে পুঁজিবাদ।

'চাবুক পালিশ করছে' দেহ থেকে চামড়া আলাদা করতে আর 'বন্দুক সাফ করছে' শরীর থেকে প্রাণ কেড়ে নিতে — এই দুই প্রতীকী অর্থই দ্যোতিত হয়েছে ব্যঞ্জনায়।

পর্দা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সামনে চাক্ষুস হয় এক জেলখানার চিত্র। রাজাসাহেবের সেই জেলখানায় বন্দী ছেলেটি ও মেয়েটি। এখানে শাসন যন্ত্রকে সচল রাখার চেষ্টায় ব্রতী প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি। রাজাসাহেব বেনিয়ম পছন্দ করেন না। তার চাবুক কথা বলে, ভেল্কি জানে। রাজাসাহেবের কুঠিতে কারো কিছু সরাবার হুকুম নেই, কোন কিছুই এলোমেলো করার নিয়ম নেই। চারিদিকে সজাগ চোখ সর্বদা সতর্ক। দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজাসাহেবের অনুগত, 'স্পাই'। সে সব খবরাখবর রাজাসাহেবকে পৌঁছে দেয়।

শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ বাস্তবে না পারলেও প্রতিমুহূর্তে শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজের স্বপ্ন সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে চায়— পাল্টে দিতে চায় সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে। অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষ তাদের স্বপ্নের জগতে যমের ঘরে পাঠাতে চাই শাসককে। এখানে তরুণ ছেলেটিও তার সেই একান্ত ব্যক্তিগত সেই স্বপ্নের দেশে রাজাসাহেবকে মেরে ফেলে—

"রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে।আমি, আমি রাজাসাহেবকে মেরেছি। এবার এই ঘরটার চেহারা পুরো বদলে ফেলব। আমি একটা বাজে লোক নই, আমার ঘেন্না আছে, রাগ আছে, ইচ্ছে আছে" [১]

নাটকটি ক্রমশ বিবিধ খেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। প্রত্যেকেই সে খেলায় সামিল হয়— এ এক রাজনৈতিক মারণ খেলা। এ খেলা ক্ষমতা দখলের খেলা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোর করে যেকোন কাজ করতেই সাধারণদের বাধ্য করে। মাঝে মাঝে সম্মিলিত জনতার প্রতিবাদের ঢিল রাজাসাহেবের ঘরে এসেও প্রবেশ করে। কিন্তু শাসক তাতে বিচলিত নয়। সে সুরই যেন রাজাসাহেবরূপী প্রথমের ন্ট্রে ধ্বনিত হয়—

"ওতো সব সময়ই হচ্ছে— তাই বলে ওই গোলমালটাই বা বেশি করে কানে যাবে কেন?....সেই প্রথম দিন থেকে ওরা একটা ঢিল ছুঁড়তে চাইছে— দীর্ঘ বছর পর একটা ঢিল এসে ঘরে পড়ল, বেচারা! একটু সান্ত্বনা তো ওদের চাই। ও ঠিক হয়ে যাবে, মন দিয়ে কাজ কর— সব ঠিক হয়ে যাবে।" [২]

জনগণের যেকোনো প্রতিবাদী সুরের কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রশক্তি দমিয়ে দেয় যেকোন উপায়ে। প্রতিবাদ তখন তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বলে ওঠে —

"বিপক্ষের অস্ত্রকে যত তুচ্ছ ভাবতে পারবে ততোই না তোমার মনোবল মানে কিনা অস্ত্রবল।" [৩]

এরপর নিকেল ফ্রেমের চশমা ও গলায় চাদর পরে প্রথম শিক্ষকের রূপ ধারণ করে। এটা আসলে রাজাসাহেবেরই অন্য আরেকটি রূপ। এখানে দ্বিতীয়, ছেলেটি ও মেয়েটি ছাত্র-ছাত্রীর রূপে অবতীর্ণ। দ্বিতীয়

শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র। আনুগত্যের পৌনঃপুনিক শিক্ষাদানে বারংবার 'স্যার' বলিয়ে নেওয়ার প্রতীকী সংলাপে সিস্টেমের ভয়ংকরতার ছবির মধ্যে Dramatic Conflict ঘটার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। অনুগত ছাত্রের মুখের মদের গন্ধকে বাহবা প্রদান, একান্তে বাড়িতে ডেকে মগজ ধোলাই করার ইচ্ছা — সবই সিস্টেমের সুচতুর কলাকৌশলের পরিচয়ক।

দ্বিতীয়ের ছাত্র হিসেবে নিজস্ব কোনো মতামত নেই। স্যারের কথায় তার কাছে বেদবাক্য। সে কেবল পরীক্ষার খাতায় উগরে দেয় তার পঠিত বিদ্যা। সে শিক্ষকের আদর্শ ছেলে। পরীক্ষায় সে ফার্স হয়, হাইয়েস্ট নম্বর পায়। মেয়েটি মুখস্থ করে লিখতে চায় না। সে অরিজিনাল লিখতে চায়। দ্বিতীয় জন অরিজিনাল আর মুখস্থ দুটোই অ্যাভয়েড করে। মেয়েটি তাই পরীক্ষায় কম নম্বর পায়। আর তখন দ্বিতীয় গর্বের সঙ্গে বলে—

"তুমি পারবে— প্রোগ্রেস করছ, তবে হ্যাঁ, মোটে দুষ্টুমি করবে না। যত বাধ্য থাকবে, দেখবে তত উন্নতি হচ্ছে। দেশ থেকে এই গুণটিই তো লোপ পেয়ে যাচ্ছে কিনা।"[৪]

- এ সংলাপ আত্মম্ভরিতার সংলাপ। সহজেই বোধগম্য যে শিক্ষকের সংস্পর্শে দ্বিতীয় জনের যথার্থ শিক্ষা হয়েছে। অন্যদিকে ছেলেটির কাছে 'এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ লাইফ।'[৫] সে যেকোনো বিষয়েই প্রশ্ন করতে পছন্দ করে। প্রশ্ন করে বিপক্ষকে ধরাশায়ী করে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে চায়। সবকিছুকেই সে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করতে চায়। তাই সে পরীক্ষায় কম নম্বর পায় এবং কপালে জোটে শিক্ষকের গঞ্জনা। শিক্ষকরূপী প্রথম তাকে শেখায়—

"আসলে পড়াশুনোটা কী জান— এক ধরণের অ্যাসেসমেন্ট। আমি যা শেখাচ্ছি সেটা কদ্দুর গ্রহণ করতে পারলে, সেটাই হল মূল কথা। প্রশ্ন করতে পার— আপনি কী শেখাচ্ছেন? উত্তর হল, আমি যা শিখেছি, তাই শেখাচ্ছি। তার মানেটা হল এই যে প্রথমে কেউ একটা কিছু শিখেছিল— তারই এক্সটেনশন হচ্ছে এডুকেশন।.এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ এডুকেশন— যার মানে হচ্ছে রিপিটেশন অফ রিপিটেশন। অর্থাৎ একটা জিনিসই মকসো করতে করতে এগিয়ে যাওয়া।"[৬]

বোঝা যায় এই শিক্ষার সাথে জীবনের কোনো যোগ নেই— চিন্তা চেতনার কোনো যোগ নেই। ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী। কোনো কিছু নতুন ভাবনা এই সিস্টেমে থেকে ভাবাও অকল্পনীয়। শুধু চর্বিত চর্বণ। শিক্ষা ব্যবস্থার এই অন্তঃসারশূন্যতা ও ধনতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার এক্সটেনশনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

এরপর রাজাসাহেবের ভয়ংকর রূপ পরিদৃশ্যমান হয়ে—

"আমার আঙ্গুলগুলো তোমার ঘাড়ে গলায় খেলা করছে— আঙুলগুলোও কথা বলে।.ভয় করছে। আঙুলগুলো আমার ধরে দেখো। যেমন শক্ত, তেমনি কমল। মিষ্টি করে ধরতে জানে, আবার দম বন্ধ করেও ধরতে জানে।"[৭]

অত্যাচারী শাসকের চিরাচরিত রূপ, সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি মেয়েটির কান্না ও আর্তনাদ বোঝায় শাসকের চোখ রাঙানির কাছে নারী কত অসহায়।

পুঁজিবাদী শোষণের নগ্ন রূপ চিত্রিত হতে দেখা যায়। মোহিত জানাতে ভোলেন না এরূপ দুর্বিষহ অবস্থায় দুটি রাস্তা খোলা থাকে— হয় সিস্টেমের দাস হয়ে থাকো, নয়তো তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গণআন্দোলন সংগঠিত করো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা আমাদের হৃদয়কে কিনে নেয়, কিনে নেয় আমাদের মেধাশ্রম ও দৈহিক শ্রমকে। আবেগ অনুভূতি হারিয়ে যায়, হৃদয়টাও যন্ত্রে পরিণত হয়। ছেলেটির সংলাপে এই হৃদয়বেদনাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়—

"আমার বুকের হাড় সরিয়ে হৃদয়টা চুরি করতে চায়। সবকটা আঙুলের শিরায় শিরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। আমি হাত মুঠো করতে পারি না, কিছু ধরতে পারি না। জান, দেয়ালে লাথি মারলে আমি আর শব্দ শুনতে পাই না।"[৮]

বস্তুত রাজাসাহেবের হাত থেকে কোনো কালে তাদের মুক্তি নেই। কারণ সারা পৃথিবীতেই গণতন্ত্রের জাল সুবিন্যস্ত এবং বিবিধ মুখোশে সারা পৃথিবীটাতেই খেলা করে বেড়ায় রাজাসাহেবের মতো শাসকগোষ্ঠীর দল।

এরপর দ্বিতীয় জনের বিজ্ঞাপনের কৌশল দেখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মগজকে সহজেই আকর্ষণ করবার শক্তি আছে এই ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞাপন সিস্টেমের। তা সহজেই ভালো-মন্দ, বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতাকে লুপ্ত করে সিস্টেমের অনুগত করে তোলে সাধারণকে।

নাট্যঘটনার পরবর্তীতে মেয়েটি যখন ব্যবসায়িক রাজসাহেবকে চিনতে পারে এবং ছেলেটি সগর্বে জানিয়ে দেয়, 'এবার আমরা দুজনে আবার মুখোমুখি হয়েছি।'[৯]— তখন বোঝা যায় বিদ্রোহের সুর একটু একটু করে ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। কোমর থেকে কাল্পনিক ছুরি বের করে ছেলেটি যখন প্রথমকে পেছন থেকে আঘাত করতে উদ্যত হয়, তখন প্রথম দ্রুত সে আঘাত প্রতিহত করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম পট পরিবর্তনে শাসকের চেহারা নিয়ে দ্বিতীয় নব সাজে ফিরে আসে বাবা হয়ে। যেকোনো অজুহাতেই না-পসন্দ ছেলেটির সঙ্গে মিশতে দিতে ও সিস্টেম থেকে বাইরে বেরোতে দিতে তিনি অনাগ্রহী। তার গলায়ও রাজাসাহেবের শাসানি —

"এ বাড়ীর যেখানে যা কিছু যেমন ভাবে আছে ঠিক তেমনি থাকবে। এভাবে চলে আসছে— তাতে আমাদের আভিজাত্য কিছু কমেনি।.এতদিন এই নিয়মেই বড় হয়েছ, হঠাৎ নিয়মটা নস্যাৎ করা যায় না— সেটা অকৃতজ্ঞতা হবে।"[১০]

নিরুপায় দুটি প্রাণ নিষ্ফল বেদনার কথা সকলকে জানাতে মিডিয়াকে খবর দেয়। কালো ঠুলি চশমা পরে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতারূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনদাতাও রাজাসাহেবেরই লোক। তাই নিরুপায় যুবক যুবতীর ব্যর্থতার ক্রন্দন ছাপাতে তারাও অনাগ্রহী। সেও শান্ত সুরে জানিয়ে দেয় —

"আমাদের খবরের কাগজটি বৃহৎ বিজ্ঞাপন-দাতাদের কৃপায় চলে। তাঁদের প্রয়োজনের বাইরে খবর ছেপে কাগজটিকে তো আর তুলে দিতে পারি না। আমার মতামত মানেই তাঁদের মতামত।"[১১]

অর্থাৎ মুক্তি নেই কোথাও। সবাই বৃহত্তর সিস্টেমের জেলখানায় বন্দী।

তবুও ছেলেটি ও মেয়েটিকে সাময়িক মুক্তি দিতে বৃদ্ধের বেশে হাজির হয় প্রথম। বৃদ্ধটি তাদের গারদের বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে ছেলেটির মনে হয়—

"গারদের বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কতো ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াব কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে— যখন পথ থাকে না তখনই তো জেলখানা! জান, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।" [১২]

বৃদ্ধ তাদের টাকা খরচ করে নগদে কিনেছে। সঙ্গে নিয়েছে ক্যাশমেমো। সে নগদে মানুষ কেনাবেচার কারবারী। বোঝা যায় প্রতিনিয়ত আমরা যেন ধনতন্ত্রের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছি। কেউ যেন অর্থের বিনিময়ে আমাদের কিনে নিচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাবার জন্য। ছেলেটি ও মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে যেতে রাজি না হলে বৃদ্ধ হুমকির সুরে শাসায়—

"দেখছি দু'টোতে মিলে ফণা তোলে! ওটি কর না— বিষদাঁত ভাঙার পাথর থাকে আমার সঙ্গে-" [১৩]

প্রয়োজনে সে 'চিকিচ্ছে' চালাতেও প্রস্তুত। এই 'চিকিচ্ছে' যেকোনো শাসকমাত্রই চালায়। এর হাত থেকে কারো রেহাই নেই—

"চলে যাবে। পথ কোথায়? রাস্তাগুলোও যে আমার নামে সব কিনে নিয়েছি। যখন কেউ হাঁটে, আমরা তার পায়ের শব্দ টেপ-রেকর্ডে তুলে রাখি। কী রকম শব্দ, কী তার মানে, পায়ের শব্দ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিলতে চায়, কাদের সঙ্গে এক তালে হাঁটে— সব নোট করে রাখা হয়।" [১৪]

বোঝা যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আমাদের গতাগতির সব খবরাখবরই রাখে। আমাদের সহজভাবে পথ চলার উপায় নেই। আমাদের মুক্তি নেই।

তবুও ছেলেটি ও মেয়েটি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে গারদের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। আর তখনই বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লাল দরজার সামনে নকশাকাটা পাঞ্জাবী, নাগরা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজাসাহেবরূপী প্রথম।

ছেলেটি ও মেয়েটিকে আলাদা করতে গোটাকতক 'স্পেল' দেওয়া হয়। মনে হয় এবারে আস্তে আস্তে অসন্তোষের মেঘ কেটে যাবে। ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চায় সবাই শান্ত সুরে যেন কাজে মন দেয়। চারিদিকে যেমন ভাবে সব গোছানো আছে তা যেন সেরকমই থাকে। তা এলোমেলো করতে নেই। কোনো কিছু ভুল করলেই উদ্যত খাড়া নেমে আসে। ছেলেটি ও মেয়েটিকে আলাদা করে দেওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয়কে রাজাসাহেবরূপী প্রথম জানিয়ে দেয়—

"তা দুজনকে আলাদা করলেই তো চলবে না। বাইরে যে মানুষগুলো দিনরাত চ্যাঁচায়, ওদের থেকে আলাদা করতে হবে যে।" [১৫]

শুধু অত্যাচার, শাস্তি প্রদান কিংবা গারদে বন্দী করে রাখাই নয়, বিপ্লবী কণ্ঠকে শান্ত করতে চাকরির টোপও দেয় শাসকগোষ্ঠী —

"উনি আসবেন— এসে ইন্টারভিউ নেবেন। তোমরা ঠিক পাস করে যাবে। আমার সার্টিফিকেট রইল, রেকমেন্ডেশন রইল— তার মানে আমি পাশে পাশে রইলাম।"[১৬]

দরজায় কড়া নড়ে। ছেলেটি ও মেয়েটি উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যে ছেলেটির চশমা, আংটি, জুতো খোঁজা ও মেয়েটির ঘড়ি, নেকলেস, হীরের দুল, সোফাসেট, রেডিওগ্রাম খোঁজার মধ্য দিয়ে নাট্যকার সুকৌশলে বুঝিয়ে দেন আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার অধিকারী মানুষেরা বেশিরভাগ সময়েই ভোগবাদীতাকে অস্বীকার করতে পারি না।

এরপর দ্বিতীয় জন ঘরে প্রবেশ করে— তার নিজের ঘরে। তার সব জিনিসপত্র, এমনকি স্ত্রী-ও চুরি গেছে। দ্বিতীয়ের সংলাপে অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ প্রকাশিত —

"হ্যাঁ, আমিও চাইসবাই চায়। শুধু চাওয়ার পথটা বলে দেয় কোনটাতে তৃপ্তি, কোনটাতে বিষ! আমি জানি, আপনাদের জিভে বিষ লেগে আছে। একটু একটু করে ভিতরে যাচ্ছেস্লো পয়জন। হ্যাঁ, এইভাবে, ঠিক এইভাবে এ-বাড়িতে একটি মেয়ে আজ আর বেঁচে নেই। ময়ূরের মত কোথাও উড়ছে আর সোনা দিয়ে বাঁধানো কতকগুল লোভী দাঁত একটা একটা করে তার পালক টেনে ছিঁড়ছে। রক্ত আর লিপস্টিক মিশে গেছে, জড়োয়া কঙ্কণ আর হাতের শেকল মিলে গেছে। এটা আমারও বাড়ি নয়। আমরা এসে পড়ি, কিংবা আরো সত্যি কথাআমাদের টেনে নিয়ে আসা হয়।"[১৭]

ছেলেটি ও মেয়েটি এ-কথার প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দেয় —

"মেয়েটি— কে যেন ধীরে ধীরে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।..

ছেলেটি— আমার নিজের ইচ্ছেয় আসিনি— বাধ্য হয়েছি। প্রতিবাদ করেছি, আমিআমি খুন করতে চেয়েছি পর্যন্ত।"[১৮]

এই অসহায়তার কথা শুনে নাট্যকার দ্বিতীয়ের মুখে উচ্চারণ করেন নাটকের সেই যুগান্তকারী সংলাপ — "একা একা যুদ্ধ হয় না। ধীরে ধীরে মরতে হয়, নাহলে এইখানে এসে একদিন হাজির হতে হয়।"[১৯]

বোঝা যায় নাট্যকার সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। সম্মিলিত গণ-আন্দোলনই একমাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারে। দ্বিতীয়ের সুরে সুর মিলিয়ে ছেলেটিও যখন বলে ওঠে — 'একা একা যুদ্ধ হয় না—লাভ নেই।'[২০] তখন বোঝা যায় শাসকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুর ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। এবারে হয়তো কাঙ্খিত মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

এরপর দামী খাকি শার্ট-প্যান্ট, পায়ে শু, মাথায় ফেল্টের টুপি পরে সফিস্টিকেটেড রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়। এখানে তার ক্রূঢ়তার চরমতম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রিয় কুকুর লুসি — যে, যেকোন কারো পদশব্দ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে চিনে নিতে পারে, যে শাসকের অবিডিয়েন্ট, যে দুষ্টু ছেলেদের কামড়ে রক্ত চুষে আত্মপরিতৃপ্তি খুঁজে পায়, তার খোঁজেই প্রথমের আবির্ভাব। যদিও ছেলেটি ও মেয়েটি সহজেই রাজাসাহেবকে চিনতে পারে তার মুখের আওড়ানো সংলাপে —

"এটি একটি মহৎ দায়িত্ব। দায়িত্বই ধর্ম, রেলিজিয়ান। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য মডার্ন সায়েন্স আমাকে অ্যাসিস্ট করছে, টপ ব্রেনস আমাকে কাউনসেল দিচ্ছে। এবং আমার গোটা মেশিনারি অসংখ্য

মানুষ মাথায় আছে। আই মাস্ট লাভ মাই সিলেকটেড নেবারস। প্রোটেকশনের জন্য রয়েছে গান, বুলেট, প্লেন, ওয়ারঅ্যাণ্ড হোয়াট নট।. হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড়। তেমন কস্টলিও নয় অথচ ভারি টেস্টফুল— অ্যাণ্ড দে লাইক ইট ভেরি মাচ।"[২১]

ছেলেটি ও মেয়েটির রক্ত পরীক্ষা করে রাজাসাহেব খুঁজে পেতে চান প্রতিবাদের মূল সূত্রটিকে। তিনি ভালো করেই জানেন কেউ কেউ সিস্টেমের বিরুদ্ধে ফোঁস করে উঠবেই। কিন্তু তাকে মেরে ফেললেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং তাকে ভাবতে হয়, খুঁজতে হয় তাদের ফোঁস করার কারণ কী? তাদের রক্তে কী আছে? রক্তের মধ্যে থেকে বিদ্রোহের বীজাণু খুঁজে বার করে তাকে সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে শেষ যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ছেলেটি গর্জে উঠে রাজাসাহেবকে নতুন একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। সে প্রতিবাদী স্ট্রে জানিয়ে দেয় —

"আমাদের রক্তের গভীরে আছে ঘৃণা আর প্রতিরোধ। একদিন তার মুখোমুখি আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। আর হয়ত এই এক্সপেরিমেন্ট সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকেই এগিয়ে আনবে।"[২২]

শেষমেষ তাই ঘটে। রাজাসাহেবের মুখে উচ্চারিত হয় অসহায়িতের সংলাপ—

"প্রথম।। ব্লাড! বডড কম ছিল রক্ত দুটো শরীর অথচ এত কম রক্ত না! লুসিটারও পেট ভরে না! আপনারা ব্লাড রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এবারও আমি আপনাদের সুখী করতে পারলাম না। সমস্ত রক্ত ঘেঁটে-ঘুটেও খুঁজে পেলাম না কোথায় ওদের রোগের বীজাণুগুলো লুকিয়ে আছে ওদের রক্ত এতো চালাক, ধূর্ত, এতো পিছল ! আমার আঙুল ধরতে পারে না, মাইক্রোস্কোপে ছায়া পড়ে না। একটু নাড়লে বাটির মধ্যে রক্তটা কিরকম খলখল করে হাসে। আমার শেষ যুদ্ধ ওদের এই ভয়ঙ্কর রক্তকণাগুলোর সঙ্গে। আমাকে জিততেই হবে, জিততেই হবে। বাটিটার রক্তে আমার ছায়া পড়েছে— কী সুন্দর মুকুট। (বাটিটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে) একী! আমার মুকটটার গায়ে অসংখ্য পোকা! রক্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আমার মুকুটে! আমার মুকুট! (দু'হাতে মাথার অদশ্য মুকুটটা চেপে ধরতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা মাটিতে আছড়ে পড়ে। মাথাটা চেপে ঐ দিকে ভয়ার্ত তাকায়, লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়) রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাকে তাড়া করছে, (প্রায় কান্নার মত গলায়, মাথাটা দু'হাতে চেপে শরীরটা বাঁকিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ভয়ার্ত সরে যেতে যেতে) গড়িয়ে গড়িয়ে রক্তটা আমাকে তাড়া করছে! লুসি! লুসি! সেভ মি! লুসি! (হঠাৎ যেন কাল্পনিক লুসিকে দেখতে পায়, স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু তবুও আতঙ্কিত গলায়) লুসি, মাই লুসি— ড্রিঙ্ক, লুসি ড্রিঙ্ক! (লুসিকে আদর করে) লুসি, মাই হানি! হ্যাঁ সবটুকু খেতে হবে, সবটুকু। (হঠাৎ কী দেখে যেন আর্তনাদ করে ওঠে) লুসি, গেট আপ। রান অন। লুসি, রান অন— রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে— পালা, লুসি পালা! রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে, পলা!"[২৩]

সমবেত জনতা বেশিদিন শাসকের রক্ত চক্ষুর চোখরাঙানি সহ্য করেনা। তাই তারা গড়ে তোলে সম্মিলিত প্রতিবাদ। কোরাসের কণ্ঠে শোনা যায় — 'এ খেলার শেষ — যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।'[২৪] ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন ঘটে —

"ছেলেটি।। এস, অনুষ্ঠান শুরু হোক। আঘাত কর বর্বর স্পর্দাকে ইতিহাসের জন্য আঘাত কর।

মেয়েটি।। আঘাত কর সিংহাসনের শোষণে— মর্যাদার জন্য আঘাত কর।

দ্বিতীয়।। আঘাত কর শৃঙ্খলে স্বাধীনতার জন্য আঘাত কর।

কোরাস।। আঘাত কর জীবনের জন্যে আঘাত কর— আঘাত কর।"[২৫]

এইভাবে দেখা যায় বস্তুত আমরা সবাই যেন এক শাসন যন্ত্রের কারাগারে বন্দী। এই কারাগারেই নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন খেলা চলতে থাকে, যেমন উন্নয়নের খেলা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের খেলা, সুকৌশলী চিন্তায় মানুষের ইজ্জত কিনে নেওয়ার সস্তা অথচ অনতিক্রম্য এক পলিটিক্সের খেলা।

৩০২.৪.১৩.৪ : 'রাজরক্ত' — গঠন কৌশলের অভিনবত্ব

মোহিত চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে 'রাজরক্ত' ও 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটক দুটি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ধারণা ব্যক্ত করেন—

"'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' ও 'রাজরক্ত' নাটকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও এক বিরুদ্ধ অপশক্তির সঙ্গে আমাদের একটা লড়াই চলছে। আমি রাজনীতিকে যেভাবে দেখেছি একটা বিরুদ্ধ অপশক্তি বা মানুষকে বিভিন্নভাবে খর্ব করে, পঙ্গু করে, বিধ্বস্ত করে। সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার প্রতিবাদও আছে, প্রতিরোধও আছে। সেটাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। তাই আমি এক টুকরো বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনাকে নিয়ে নাটক লিখিনি। এই সমস্ত ঘটনা ঘটার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটাকেই আমি নাটকে আনবার চেষ্টা করেছি।" (মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎকার, নাটক নিয়ে কথা, অনুস্টুপ, ১৪১৯)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন ১৯৭০-৭১ - এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশ্বব্যাপী দুর্বিসহ ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। ঐ বছরই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার দ্বারা যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটে। পরে ১৯৬৯ সালে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করলেও তার পতন ঘটে। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতা দখল করে। এ সময় উগ্রবাদীদের ক্ষমতার আস্ফালন এবং পুলিশের বর্বর আচরণ ও দমননীতির বলি হতে হয় অসংখ্য তরতাজা প্রাণকে। মোহিত তাই গণতন্ত্রের ইতিবাচক রূপ খুঁজতেই 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন। মোহিত সমূলে আঘাত করতে চেয়েছেন তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয়। শাসক গোষ্ঠীর সযত্ন লালিত স্বপ্নের সুউচ্চ মিনারে সজোরে আঘাত করে মোহিত দেখাতে চেয়েছেন গণজাগরণের উত্থানের শক্তির কাছে শাসকের সবই ঠুনকো, ভঙ্গুর। তাসের ঘরের মতো শাসন যন্ত্রের মিনার ভূলুণ্ঠিত হয়। সাধারণরা পৌঁছে যায় তথাকথিত রাজার শয়ন কক্ষে।

বস্তুত আমরা সবাই যেন এক শাসন যন্ত্রের কারাগারে বন্দী। এই কারাগারেই নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন খেলা চলতে থাকে, যেমন উন্নয়নের খেলা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের খেলা, সুকৌশলী চিন্তায় মানুষের ইজ্জত কিনে নেওয়ার সস্তা অথচ অনতিক্রম্য এক পলিটিক্সের খেলা।

এই নাটকে রাজা সাহেব জালের আড়ালে থাকেন না। তিনি সর্বসমক্ষেই তার গোপন খেলা খেলে যান। বিজ্ঞানীরা যেমন পরীক্ষাগারে গিনিপিগকে নানাবিধ পরীক্ষার বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেন, ঠিক তেমনি এখানে সেই পরীক্ষাগারের বস্তু হিসেবে নির্বাচিত হয় সাধারণ মানুষেরা। কিন্তু কিছু তরুণ থাকে যারা শাসকের শাসানিকে অগ্রাহ্য করে। তারা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধতা করে, কখনও হাতে তুলে নেয় ধারালো অস্ত্র। তারা শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে এবং রাজরক্ত চায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই হয়তো বিভাস চক্রবর্তী 'গিনিপিগ' নামকরণ পরিবর্তন করে 'রাজরক্ত' নামকরণ করেন। এখন আমরা 'রাজরক্ত' নাটকটির গঠন কৌশল সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

'রাজরক্ত' নাটকটির দৃশ্য মাত্র দুটি— প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্য। এই দুটি দৃশ্যেই সমগ্র নাট্য কাহিনীর বিন্যাস। যদিও এই দুটি দৃশ্যের মধ্যে আমরা কয়েকবার নাটকের পট পরিবর্তন হতে দেখি। বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একই দৃশ্যের মধ্যে নাটকের পট পরিবর্তনকে চাক্ষুস করি। নাটকের চরিত্র সংখ্যা পাঁচটি — প্রথম, দ্বিতীয়, ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাস। নাটকটিতে তিনটি শ্রেণী বর্তমান। শাসক— প্রথম চরিত্র যার প্রতিনিধি, শাসকের অনুগত— দ্বিতীয় চরিত্রটি যার প্রতিনিধি, আর শাসিত ও সমগ্র সিস্টেমের বিরোধী— ছেলেটি মেয়েটি ও কোরাস যার প্রতিনিধি।

পর্দা উঠলে মঞ্চে তিনজন পুরুষকে দেখা যায়। প্রথম ব্যক্তি মঞ্চের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একটি বড় হলুদ ঝাড়ন দিয়ে চামড়ার চাবুক পালিশ করছে। পরনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, সাদা ধুতি, পায়ে সাদার ওপর জরির কাজ করা নাগরা। মঞ্চের ডানদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি আরেকটি ঝাড়ন দিয়ে একটি বন্দুক সাফ করছে। পরনে চকরাবকরা শার্ট ও জিনস। প্ল্যাটফর্মের সিড়িতে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুজে ঝুঁকে বসে আছে একটি ছেলে। পরনে গাঢ় লাল পাঞ্জাবী ও সাদা পায়জামা।

পর্দা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সামনে চাক্ষুস হয় এক জেলখানার চিত্র। রাজাসাহেবের সেই জেলখানায় বন্দী ছেলেটি ও মেয়েটি। এখানে শাসন যন্ত্রকে সচল রাখার চেষ্টায় ব্রতী প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি। রাজাসাহেব বেনিয়ম পছন্দ করেন না। তার চাবুক কথা বলে, ভেল্কি জানে। রাজাসাহেবের কুঠিতে কারো কিছু সরাবার হুকুম নেই, কোন কিছুই এলোমেলো করার নিয়ম নেই। চারিদিকে সজাগ চোখ সর্বদা সতর্ক। দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজাসাহেবের অনুগত, 'স্পাই'। সে সব খবরাখবর রাজাসাহেবকে পৌঁছে দেয়। নাটকের শুরুতে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির কথোপকথনে নাট্যবিষয়ের উপস্থাপনা নাটকের গতিবিধিকে নির্দেশ করেছে—

"দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের পাঠশালায় অগ্নিসংযোগ।

প্রথম।। শান্তি সেনানীর প্রহরায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট।

প্রথম।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে লক-আউট।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ক্ষেত-খামার জবর দখল।

প্রথম।। জবর দখল নিবারক জব্বর আইন চালু।।..

প্রথম।। রাজাসাহেবের রাজ্যে নারীপুরুষ হত্যা।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্য আজ রক্তাক্ত।

প্রথম।। রাজাসাহেবের হাত আজ রক্তাক্ত।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্যে উত্তাল গণবিক্ষোভ।

দ্বিতীয়।। জনতার দাবি, রাজাসাহেবের রক্ত চাই।

প্রথম।। রাজাসাহেব আজও জীবিত।"[২৬]

আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সবকিছুই নিয়মতান্ত্রিক। কেউ সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধাচারণ করলেই তার উপর আঘাত নেমে আসে। তবে উপরিউক্ত সংলাপে স্পষ্ট হয় যে চতুর্দিকে ক্রমে বিপ্লব ঘনীভূত হচ্ছে — গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়াস চলছে। আর সেই গণ-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করবার জন্য শাসক শ্রেণীও নিশ্চুপে বসে নেই। তারাও সর্বতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমগ্র সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য। তাই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠছে।

শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ বাস্তবে না পারলেও প্রতিমুহূর্তে শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজের স্বপ্ন সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে চায়— পাল্টে দিতে চায় সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে। অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষ তাদের স্বপ্নের জগতে যমের ঘরে পাঠাতে চাই শাসককে। এখানে তরুণ ছেলেটিও তার সেই একান্ত ব্যক্তিগত সেই স্বপ্নের দেশে রাজাসাহেবকে মেরে ফেলে—

"রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে।আমি, আমি রাজাসাহেবকে মেরেছি। এবার এই ঘরটার চেহারা পুরো বদলে ফেলব। আমি একটা বাজে লোক নই, আমার ঘেন্না আছে, রাগ আছে, ইচ্ছে আছে"[২৭]

নাটকটি ক্রমশ বিবিধ খেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। প্রত্যেকেই সে খেলায় সামিল হয়— এ এক রাজনৈতিক মারণ খেলা। এ খেলা ক্ষমতা দখলের খেলা। বিচিত্র শব্দ তরঙ্গ ধ্বনিত হলে লাল দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলে ওঠে— আবার নিভে যায়। আবার জ্বলে— আবার নেভে। তার মধ্যেই রাজাসাহেবের পোশাকে প্রথমজন অবতীর্ণ হয়। তার মাথায় জমকালো টুপি, কোর্টের বাটনহোলে লাল গোলাপ। ছেলেটি তখন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাটিতে বসে রাজাসাহেবের জুতো পালিশ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ দেখা যায় নাটকের প্রথম দৃশ্যের মধ্যেই পট পরিবর্তন ঘটল এই প্রথমবার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোর করে যেকোন কাজ করতেই সাধারণদের বাধ্য করে। মাঝে মাঝে সম্মিলিত জনতার প্রতিবাদের ঢিল রাজাসাহেবের ঘরে এসেও প্রবেশ করে। কিন্তু শাসক তাতে বিচলিত নয়। সে সুরই যেন রাজাসাহেবরূপী প্রথমের ন্ট্রে ধ্বনিত হয়—

"ওতো সব সময়ই হচ্ছে— তাই বলে ওই গোলমালটাই বা বেশি করে কানে যাবে কেন?....সেই প্রথম দিন থেকে ওরা একটা ঢিল ছুঁড়তে চাইছে— দীর্ঘ বছর পর একটা ঢিল এসে ঘরে পড়ল, বেচারা! একটু সান্ত্বনা তো ওদের চাই। ও ঠিক হয়ে যাবে, মন দিয়ে কাজ কর— সব ঠিক হয়ে যাবে।"[২৮]

'দীর্ঘ বছর' ও 'বেচারা' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ শাসকের বিপক্ষে যারা প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত করে, তারা 'বেচারা'ই। কারণ শাসকরাও জানে এই বেচারারা হাতেগোনা কতিপয় সাধারণ নগণ্য মানুষ। তাদের

সম্মিলিত হতেও দীর্ঘ সময় লেগে যায়। আর তাদের আন্দোলন কিভাবে স্তব্ধ করে দিতে হবে তার কৌশলও তাদের করায়ত্ত। তারা ভালোভাবেই জানে 'ও ঠিক হয়ে যাবে'। অর্থাৎ আন্দোলন দমে যাবেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার এটাই নিয়ম। তাই সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে রাজাসাহেব ছেলেটিকে বাধ্য করে বলতে যে সে সুখী — 'স্বীকার কর — তুমি সুখী।' আর সবাইকে বুলেট বন্দনা অর্থাৎ ধনতন্ত্রের জয়গানের ছড়া আওড়াতে বলে—

"দ্বিতীয়।। (প্ল্যাটফর্মের নিচে ডানদিকে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গীতে) ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি।। যে কোন অশান্তির একমাত্র মহৌষধ।

ছেলেটি।। একবার মাত্র ব্যবহারেই কাজ হয়।

দ্বিতীয়।। ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি।। যে কোন অশান্তির চিরস্থায়ী আরাম।

ছেলেটি।। অত্যন্ত সস্তা, অথচ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয়।। (কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে) জানটি আপনার গেল কোথায়, একি তাজ্জব বাত, রাজাসাহেবের বুলেটে হয়েছেন কাৎ।

মেয়েটি।। আঃ বুলেট!

ছেলেটি।। আঃ বুলেট! (বুকে হাত দেয়)

মেয়েটি।। ট্রেডমার্ক লক্ষ করিবেন, টুং টাং! (রেডিও কমার্শিয়াল)

প্রথম।। সাধু! সাধু!"[২৯]

জনগণের যেকোনো প্রতিবাদী সুরের কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রশক্তি দমিয়ে দেয় যেকোন উপায়ে। প্রতিবাদ তখন তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বলে ওঠে —

"সে তোমাকে বোঝাতে হবে না, ওগুলোকে ঢিল ভাবতে শেখ। বিপক্ষের অস্ত্রকে যত তুচ্ছ ভাবতে পারবে ততোই না তোমার মনোবল মানে কিনা অস্ত্রবল।"[৩০]

রাজার কথা বলে কথা! না মানলে উপায় কী? তাই দ্বিতীয়ের ন্ট্রেও শোনা যায় — 'সে হালকা ঢিল ছুটছে স্যার।'[৩১]

এরপর নাটকের প্রথম দৃশ্যের মধ্যে দ্বিতীয় পট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের সামনের অংশের পাটাতন তুলে সেটি বোর্ডের মতো খাড়া করে দেয়। ঠিক যেন কালো ব্ল্যাকবোর্ড। বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা "$(a + b)^2$ আমরা সুখী"। প্রথম কোট ও টুপি খুলে চোখে দেয় নিকেল ফ্রেমের চশমা ও গলায় পরে নেয় চাদর। প্রথম শিক্ষকের রূপ ধারণ করে। এটা আসলে রাজাসাহেবেরই অন্য আরেকটি রূপ। এখানে দ্বিতীয়, ছেলেটি ও মেয়েটি ছাত্র-ছাত্রীর রূপে অবতীর্ণ। দ্বিতীয় শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র। আনুগত্যের পৌনঃপুনিক শিক্ষাদানে বারংবার 'স্যার' বলিয়ে নেওয়ার প্রতীকী সংলাপে সিস্টেমের ভয়ংকরতার ছবির মধ্যে Dramatic Conflict ঘটার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। অনুগত ছাত্রের মুখের মদের

গন্ধকে বাহবা প্রদান, একান্তে বাড়িতে ডেকে মগজ ধোলাই করার ইচ্ছা — সবই সিস্টেমের সুচতুর কলাকৌশলের পরিচয়ক।

দ্বিতীয়ের ছাত্র হিসেবে নিজস্ব কোনো মতামত নেই। স্যারের কথায় তার কাছে বেদবাক্য। সে কেবল পরীক্ষার খাতায় উগরে দেয় তার পঠিত বিদ্যা। সে শিক্ষকের আদর্শ ছেলে। পরীক্ষায় সে ফার্স হয়, হাইয়েস্ট নম্বর পায়। মেয়েটি মুখস্থ করে লিখতে চায় না। সে অরিজিনাল লিখতে চায়। দ্বিতীয় জন অরিজিনাল আর মুখস্থ দুটোই অ্যাভয়েড করে। মেয়েটি তাই পরীক্ষায় কম নম্বর পায়। আর তখন দ্বিতীয় গর্বের সঙ্গে বলে—

"তুমি পারবে— প্রোগ্রেস করছ, তবে হ্যাঁ, মোটে দুষ্টুমি করবে না। যত বাধ্য থাকবে, দেখবে তত উন্নতি হচ্ছে। দেশ থেকে এই গুণটিই তো লোপ পেয়ে যাচ্ছে কিনা।"[৩২]

- এ সংলাপ আত্মম্ভরিতার সংলাপ। সহজেই বোধগম্য যে শিক্ষকের সংস্পর্শে দ্বিতীয় জনের যথার্থ শিক্ষা হয়েছে। অন্যদিকে ছেলেটির কাছে 'এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ লাইফ।'[৩৩] সে যেকোনো বিষয়েই প্রশ্ন করতে পছন্দ করে। প্রশ্ন করে বিপক্ষকে ধরাশায়ী করে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে চায়। সবকিছুকেই সে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করতে চায়। তাই সে পরীক্ষায় কম নম্বর পায় এবং কপালে জোটে শিক্ষকের গঞ্জনা। শিক্ষকরূপী প্রথম তাকে শেখায়—

"আসলে পড়াশুনোটা কী জান— এক ধরণের অ্যাসেসমেন্ট। আমি যা শেখাচ্ছি সেটা কদ্দুর গ্রহণ করতে পারলে, সেটাই হল মূল কথা। প্রশ্ন করতে পার— আপনি কী শেখাচ্ছেন? উত্তর হল, আমি যা শিখেছি, তাই শেখাচ্ছি। তার মানেটা হল এই যে প্রথমে কেউ একটা কিছু শিখেছিল— তারই এক্সটেনশন হচ্ছে এডুকেশন।.এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ এডুকেশন— যার মানে হচ্ছে রিপিটেশন অফ রিপিটেশন। অর্থাৎ একটা জিনিসই মকসো করতে করতে এগিয়ে যাওয়া।"[৩৪]

বোঝা যায় এই শিক্ষার সাথে জীবনের কোনো যোগ নেই— চিন্তা চেতনার কোনো যোগ নেই। ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী। কোনো কিছু নতুন ভাবনা এই সিস্টেমে থেকে ভাবাও অকল্পনীয়। শুধু চর্বিত চর্বণ। শিক্ষা ব্যবস্থার এই অন্ত:সারশূন্যতা ও ধনতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার এক্সটেনশনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম ব্যক্তি যখন চাদর ও চশমা খুলে ফেলে আবার রাজাসাহেবের বেশ ধারণ করে, তখন প্রথম দৃশ্যের তৃতীয় পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজাসাহেবের ভয়ংকর রূপ এখানে পরিদৃশ্যমান—

"আমার আঙ্গুলগুলো তোমার ঘাড়ে গলায় খেলা করছে— আঙুলগুলোও কথা বলে।.ভয় করছে। আঙুলগুলো আমার ধরে দেখো। যেমন শক্ত, তেমনি কমল। মিষ্টি করে ধরতে জানে, আবার দম বন্ধ করেও ধরতে জানে।"[৩৫]

অত্যাচারী শাসকের চিরাচরিত রূপ, সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি মেয়েটির কান্না ও আর্তনাদ বোঝায় শাসকের চোখ রাঙানির কাছে নারী কত অসহায়।

তীব্র যান্ত্রিক শব্দ, দরজার মাথায় লাল সংকেতের জ্বলা-নেভা, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ধ্বনি, বিক্ষুব্ধ মানুষের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে প্রথম দৃশ্যের চতুর্থ পটপরিবর্তন ঘটে। ছেলেটি মাথা নিচু করে এক কোণে বসে থাকে, মেয়েটি সিঁড়িতে বসে ও প্রথম চেয়ারে বসে। আর দ্বিতীয়জন পায়চারী করতে থাকে। তার মাথায় পুলিশের টুপি আর নেই, সেটা তখন বোর্ডে শোভা পেতে থাকে।

পুঁজিবাদী শোষণের নগ্ন রূপ এখানে চিত্রিত হতে দেখি। মোহিত জানাতে ভোলেন না এরূপ দুর্বিষহ অবস্থায় দুটি রাস্তা খোলা থাকে— হয় সিস্টেমের দাস হয়ে থাকো, নয়তো তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গণআন্দোলন সংগঠিত করো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা আমাদের হৃদয়কে কিনে নেয়, কিনে নেয় আমাদের মেধাশ্রম ও দৈহিক শ্রমকে। আবেগ অনুভূতি হারিয়ে যায়, হৃদয়টাও যন্ত্রে পরিণত হয়। ছেলেটির সংলাপে এই হৃদয়বেদনাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়—

"আমার বুকের হাড় সরিয়ে হৃদয়টা চুরি করতে চায়। সবকটা আঙুলের শিরায় শিরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। আমি হাত মুঠো করতে পারি না, কিছু ধরতে পারি না। জান, দেয়ালে লাথি মারলে আমি আর শব্দ শুনতে পাই না।"[৩৬]

মেয়েটি ব্যাঙ্গের খোঁচায় বিদ্ধ করে ছেলেটির অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলতে চায়। তারা রাজাসাহেবের ঘর ছেড়ে চলে আসে। কিন্তু রাজাসাহেবের ছায়া তাদের পিছু ছাড়ে না। যেন রাজাসাহেবের হাত থেকে কোনো কালে তাদের মুক্তি নেই। কারণ সারা পৃথিবীতেই গণতন্ত্রের জাল সুবিন্যস্ত এবং বিবিধ মুখোশে সারা পৃথিবীটাতেই খেলা করে বেড়ায় রাজাসাহেবের মতো শাসকগোষ্ঠীর দল।

ছেলেটি ও মেয়েটি মঞ্চের দুকোনে গিয়ে দাঁড়ালে যখন মনোহারি যন্ত্রসংগীতের ছন্দে তালে তালে পা ফেলে প্রথম অভিজাত মূল্যবান পোশাক ও বাইনোকুলার চোখে ব্যবসায়ীর বেশে এবং দ্বিতীয় ঘুঙুর পায়ে ফেরিওয়ালার সস্তা রঙচঙে পোশাকে হরেক রকম চিজ নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতা হিসেবে মঞ্চে প্রবেশ করে তখন প্রথম দৃশ্যের পঞ্চম পটপরিবর্তন সূচিত হয়। দ্বিতীয় জনের বিজ্ঞাপনের কৌশল দেখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মগজকে সহজেই আকর্ষণ করবার শক্তি আছে এই ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞাপন সিস্টেমের। তা সহজেই ভালো-মন্দ, বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতাকে লুপ্ত করে সিস্টেমের অনুগত করে তোলে সাধারণকে। বিজ্ঞাপনের প্রচারে আবেগময় সংলাপ, কবিত্ব এবং বক্তৃতার ঢং ব্যবহার করে মোহিত যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

মেয়েটি যখন ব্যবসায়িক রাজসাহেবকে চিনতে পারে এবং ছেলেটি সগর্বে জানিয়ে দেয়, 'এবার আমরা দুজনে আবার মুখোমুখি হয়েছি।'[৩৭]— তখন বোঝা যায় বিদ্রোহের সুর একটু একটু করে ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। কোমর থেকে কাল্পনিক ছুরি বের করে ছেলেটি যখন প্রথমকে পেছন থেকে আঘাত করতে উদ্যত হয়, তখন প্রথম দ্রুত সে আঘাত প্রতিহত করে। আবার শুরু হয় যান্ত্রিক শব্দ, ক্রিং ক্রিং ধ্বনি, আলোর জ্বলা-নেভা। তারপর মঞ্চের উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় ছেলেটি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। ছেলেটির আকুল প্রার্থনাঢ় ('ধর্মাবতার, এবারেও আমি খুন করতে পারিনি। আমাকে শাস্তি দিন।'[৩৮]) মধ্যে প্রথম দৃশ্যের যবনিকা পতন ঘটে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায় আবার সেই জেলখানার কালো গরাদ। দ্বিতীয় বন্দুক কাঁধে নিয়ে টুপি মাথায় টহল দিচ্ছে। দুটো সেলে বন্দী আছে ছেলেটি ও মেয়েটি। তাদের মাঝখানে অদৃশ্য এক দেওয়াল। তারা জেলখানা থেকে বেরোবার বৃথা চেষ্টা করে। দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম পট পরিবর্তনে শাসকের চেহারা নিয়ে দ্বিতীয় নব সাজে ফিরে আসে বাবা হয়ে। যেকোনো অজুহাতেই না-পসন্দ ছেলেটির সঙ্গে মিশতে দিতে ও সিস্টেম থেকে বাইরে বেরোতে দিতে তিনি অনাগ্রহী। তার গলায়ও রাজাসাহেবের শাসানি—

"এ বাড়ীর যেখানে যা কিছু যেমন ভাবে আছে ঠিক তেমনি থাকবে। এভাবে চলে আসছে— তাতে আমাদের আভিজাত্য কিছু কমেনি।.এতদিন এই নিয়মেই বড় হয়েছ, হঠাৎ নিয়মটা নস্যাৎ করা যায় না— সেটা অকৃতজ্ঞতা হবে।"[৩৯]

নিরুপায় দুটি প্রাণ নিষ্ফল বেদনার কথা সকলকে জানাতে মিডিয়াকে খবর দেয়। কালো ঠুলি চশমা পরে দ্বিতীয় যখন বিজ্ঞাপনদাতারূপে আবির্ভূত হয়, তখন দ্বিতীয় দৃশ্যের দ্বিতীয় পট পরিবর্তন সূচিত হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনদাতাও রাজাসাহেবেরই লোক। তাই নিরুপায় যুবক যুবতীর ব্যর্থতার ক্রন্দন ছাপাতে তারাও অনাগ্রহী। সেও শান্ত সুরে জানিয়ে দেয় —

"আমাদের খবরের কাগজটি বৃহৎ বিজ্ঞাপন-দাতাদের কৃপায় চলে। তাঁদের প্রয়োজনের বাইরে খবর ছেপে কাগজটিকে তো আর তুলে দিতে পারি না। আমার মতামত মানেই তাঁদের মতামত।"[৪০]

অর্থাৎ মুক্তি নেই কোথাও। সবাই বৃহত্তর সিস্টেমের জেলখানায় বন্দী।

তবুও ছেলেটি ও মেয়েটিকে সাময়িক মুক্তি দিতে বৃদ্ধের বেশে যখন হাজির হয় প্রথম, তখন দ্বিতীয় দৃশ্যের তৃতীয় পট পরিবর্তন ঘটে। তার মাথার চুল সাদা, মাথায় রয়েছে সুতোয় বোনা টুপি। সে কুঁজো হয়ে হাঁটে। বৃদ্ধটি তাদের গারদের বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে ছেলেটির মনে হয়—

"গারদের বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কতো ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াব কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে— যখন পথ থাকে না তখনই তো জেলখানা! জান, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।"[৪১]

বৃদ্ধ তাদের টাকা খরচ করে নগদে কিনেছে। সঙ্গে নিয়েছে ক্যাশমেমো। সে নগদে মানুষ কেনাবেচার কারবারী। বোঝা যায় প্রতিনিয়ত আমরা যেন ধনতন্ত্রের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছি। কেউ যেন অর্থের বিনিময়ে আমাদের কিনে নিচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাবার জন্য। ছেলেটি ও মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে যেতে রাজি না হলে বৃদ্ধ হুমকির সুরে শাসায়—

"দেখছি দু'টোতে মিলে ফণা তোলে! ওটি কর না— বিষদাঁত ভাঙার পাথর থাকে আমার সঙ্গে-"[৪২]

প্রয়োজনে সে 'চিকিচ্ছে' চালাতেও প্রস্তুত। এই 'চিকিচ্ছে' যেকোনো শাসকমাত্রই চালায়। এর হাত থেকে কারো রেহাই নেই—

"চলে যাবে। পথ কোথায়? রাস্তাগুলোও যে আমার নামে সব কিনে নিয়েছি। যখন কেউ হাঁটে, আমরা তার পায়ের শব্দ টেপ-রেকর্ডে তুলে রাখি। কী রকম শব্দ, কী তার মানে, পায়ের শব্দ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিলতে চায়, কাদের সঙ্গে এক তালে হাঁটে— সব নোট করে রাখা হয়।"[৪৩]

বোঝা যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আমাদের গতাগতির সব খবরাখবরই রাখে। আমাদের সহজভাবে পথ চলার উপায় নেই। আমাদের মুক্তি নেই।

তবুও ছেলেটি ও মেয়েটি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে গরাদের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। আর তখনই বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লাল দরজার সামনে নকশাকাটা পাঞ্জাবী, নাগরা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজাসাহেবরূপী প্রথম। দ্বিতীয় দৃশ্যের চতুর্থ পট পরিবর্তন ঘটে যায়।

ছেলেটি ও মেয়েটিকে আলাদা করতে গোটাকতক 'স্পেল' দেওয়া হয়। মনে হয় এবারে আস্তে আস্তে অসন্তোষের মেঘ কেটে যাবে। ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চায় সবাই শান্ত সুরে যেন কাজে মন দেয়। চারিদিকে

যেমন ভাবে সব গোছানো আছে তা যেন সেরকমই থাকে। তা এলোমেলো করতে নেই। কোনো কিছু ভুল করলেই উদ্যত খাড়া নেমে আসে। ছেলেটি ও মেয়েটিকে আলাদা করে দেওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয়কে রাজাসাহেবরূপী প্রথম জানিয়ে দেয়—

"তা দুজনকে আলাদা করলেই তো চলবে না। বাইরে যে মানুষগুলো দিনরাত চ্যাঁচায়, ওদের থেকে আলাদা করতে হবে যে।"[৪৪]

শুধু অত্যাচার, শাস্তি প্রদান কিংবা গারদে বন্দী করে রাখাই নয়, বিপ্লবী কণ্ঠকে শান্ত করতে চাকরির টোপও দেয় শাসকগোষ্ঠী —

"উনি আসবেন— এসে ইন্টারভিউ নেবেন। তোমরা ঠিক পাস করে যাবে। আমার সার্টিফিকেট রইল, রেকমেন্ডেশন রইল— তার মানে আমি পাশে পাশে রইলাম।"[৪৫]

দরজায় কড়া নড়ে। ছেলেটি ও মেয়েটি উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যে ছেলেটির চশমা, আংটি, জুতো খোঁজা ও মেয়েটির ঘড়ি, নেকলেস, হীরের দুল, সোফাসেট, রেডিওগ্রাম খোঁজার মধ্য দিয়ে নাট্যকার সুকৌশলে বুঝিয়ে দেন আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার অধিকারী মানুষেরা বেশিরভাগ সময়েই ভোগবাদীতাকে অস্বীকার করতে পারি না।

এরপর দ্বিতীয় জন ঘরে প্রবেশ করে— তার নিজের ঘরে। তার সব জিনিসপত্র, এমনকি স্ত্রী-ও চুরি গেছে। দ্বিতীয় সংলাপে অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ প্রকাশিত —

"হ্যা, আমিও চাইসবাই চায়। শুধু চাওয়ার পথটা বলে দেয় কোনটাতে তৃপ্তি, কোনটাতে বিষ! আমি জানি, আপনাদের জিভে বিষ লেগে আছে। একটু একটু করে ভিতরে যাচ্ছেস্লো পয়জন। হ্যাঁ, এইভাবে, ঠিক এইভাবে এ-বাড়িতে একটি মেয়ে আজ আর বেঁচে নেই। ময়ূরের মত কোথাও উড়ছে আর সোনা দিয়ে বাঁধানো কতকগুল লোভী দাঁত একটা একটা করে তার পালক টেনে ছিঁড়ছে। রক্ত আর লিপস্টিক মিশে গেছে, জড়োয়া কঙ্কণ আর হাতের শেকল মিলে গেছে। এটা আমারও বাড়ি নয়। আমরা এসে পড়ি, কিংবা আরো সত্যি কথাআমাদের টেনে নিয়ে আসা হয়।"[৪৬]

ছেলেটি ও মেয়েটি এ-কথার প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দেয় —

"মেয়েটি— কে যেন ধীরে ধীরে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।..

ছেলেটি— আমার নিজের ইচ্ছেয় আসিনি— বাধ্য হয়েছি। প্রতিবাদ করেছি, আমিআমি খুন করতে চেয়েছি পর্যন্ত।"[৪৭]

এই অসহায়তার কথা শুনে নাট্যকার দ্বিতীয়ের মুখে উচ্চারণ করেন নাটকের সেই যুগান্তকারী সংলাপ—

"একা একা যুদ্ধ হয় না। ধীরে ধীরে মরতে হয়, নাহলে এইখানে এসে একদিন হাজির হতে হয়।"[৪৮]

বোঝা যায় নাট্যকার সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। সম্মিলিত গণ-আন্দোলনই একমাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারে। দ্বিতীয়ের সুরে সুর মিলিয়ে ছেলেটিও যখন বলে ওঠে — 'একা একা যুদ্ধ হয় না—লাভ নেই।'[৪৯] তখন বোঝা যায় শাসকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুর ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। এবারে হয়তো কাঙ্খিত মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় দৃশ্যের পঞ্চম পট পরিবর্তনের পথ ধরে দামী খাকি শার্ট-প্যান্ট, পায়ে শু, মাথায় ফেল্টের টুপি পরে সফিস্টিকেটেড রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়। এখানে তার ক্রূঢ়তার চরমতম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রিয় কুকুর লুসি — যে, যেকোন কারো পদশব্দ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে চিনে নিতে পারে, যে শাসকের অবিডিয়েন্ট, যে দুষ্টু ছেলেদের কামড়ে রক্ত চুষে আত্মপরিতৃপ্তি খুঁজে পায়, তার খোঁজেই প্রথমের আবির্ভাব। যদিও ছেলেটি ও মেয়েটি সহজেই রাজাসাহেবকে চিনতে পারে তার মুখের আওড়ানো সংলাপে—

"এটি একটি মহৎ দায়িত্ব। দায়িত্বই ধর্ম, রেলিজিয়ান। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য মডার্ন সায়েন্স আমাকে অ্যাসিস্ট করছে, টপ ব্রেনস আমাকে কাউনসেল দিচ্ছে। এবং আমার গোটা মেশিনারি অসংখ্য মানুষ মাথায় আছে। আই মাস্ট লাভ মাই সিলেকটেড নেবারস। প্রোটেকশনের জন্য রয়েছে গান, বুলেট, প্লেন, ওয়ারঅ্যাণ্ড হোয়াট নট।. হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড়। তেমন কস্টলিও নয় অথচ ভারি টেস্টফুল— অ্যাণ্ড দে লাইক ইট ভেরি মাচ। এখন, আমার লুসিটা পুরো একবাটি রক্ত চুকচুক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নেবে। রক্তটা যদি বাচ্চাদের হয়ওর আরও আনন্দ। লুসিটা এলে দেখবে, এখন ও আমার কোলে উঠে সারা গায়ে মুখ ঘষবে, চাটতে থাকবে, আর গব-গব করে গলায় মিষ্টি আওয়াজ করবে-মাই প্রিটি নটি লুসি! শী ইজ আ জেম অফ আ ডগ.আরে, ও কি যাকে পাবে তাকে কামড়াবে নাকি? ও যদি বুঝতে পারে, তুমি আমার বেশ ওবিডিয়েন্ট—তোমার কিচ্ছুটি করবে না। পায়ের কাছে শুয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে তোমাকে আদর করবে। আর তুমি যদি অবাধ্য হওঘরের এটা সরাও, ওটা নাড়াও, এটা ভাঙো, ওটা ছুঁড়ে দাও-লুসি একেবারে খ্যাঁক করে তোমার ঘাড়ে চাপবে। যেমনটি আছ ঠিক তেমনি থাকওর মত ভাল আর তা না।"[৫০]

ছেলেটি ও মেয়েটির রক্ত পরীক্ষা করে রাজাসাহেব খুঁজে পেতে চান প্রতিবাদের মূল সূত্রটিকে। তিনি ভালো করেই জানেন কেউ কেউ সিস্টেমের বিরুদ্ধে ফোঁস করে উঠবেই। কিন্তু তাকে মেরে ফেললেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং তাকে ভাবতে হয়, খুঁজতে হয় তাদের ফোঁস করার কারণ কী? তাদের রক্তে কী আছে? রক্তের মধ্যে থেকে বিদ্রোহের বীজাণু খুঁজে বার করে তাকে সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে শেষ যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ছেলেটি গর্জে উঠে রাজাসাহেবকে নতুন একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। সে প্রতিবাদী ন্ট্রে জানিয়ে দেয় —

"আমাদের রক্তের গভীরে আছে ঘৃণা আর প্রতিরোধ। একদিন তার মুখোমুখি আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। আর হয়ত এই এক্সপেরিমেন্ট সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকেই এগিয়ে আনবে।"[৫১]

শেষমেষ তাই ঘটে। রাজাসাহেবের মুখে উচ্চারিত হয় অসহায়িতের সংলাপ—

"প্রথম।। ব্লাড! বডড কম ছিল রক্ত দুটো শরীর অথচ এত কম রক্ত না! লুসিটারও পেট ভরে না! আপনারা ব্লাড রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এবারও আমি আপনাদের সুখী করতে পারলাম না। সমস্ত রক্ত ঘেঁটে-ঘুটেও খুঁজে পেলাম না কোথায় ওদের রোগের বীজাণুগুলো লুকিয়ে আছে ওদের রক্ত এতো চালাক, ধূর্ত, এতো পিছল ! আমার আঙুল ধরতে পারে না, মাইক্রোস্কোপে ছায়া পড়ে না। একটু নাড়লে বাটির মধ্যে রক্তটা কিরকম খলখল করে হাসে। আমার শেষ যুদ্ধ ওদের এই ভয়ঙ্কর রক্তকণাগুলোর সঙ্গে। আমাকে জিততেই হবে, জিততেই হবে। বাটিটার রক্তে আমার ছায়া পড়েছে— কী সুন্দর মুকুট। (বাটিটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে) একী! আমার মুকটটার গায়ে অসংখ্য পোকা! রক্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আমার মুকুটে! আমার মুকুত! (দু'হাতে মাথার অদশ্য মুকুটটা চেপে

ধরতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা মাটিতে আছড়ে পড়ে। মাথাটা চেপে ঐ দিকে ভয়ার্ত তাকায়, লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়) রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাকে তাড়া করছে, (প্রায় কান্নার মত গলায়, মাথাটা দু'হাতে চেপে শরীরটা বাঁকিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ভয়ার্ত সরে যেতে যেতে) গড়িয়ে গড়িয়ে রক্তটা আমাকে তাড়া করছে! লুসি! লুসি! সেভ মি! লুসি! (হঠাৎ যেন কাল্পনিক লুসিকে দেখতে পায়, স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু তবুও আতঙ্কিত গলায়) লুসি, মাই লুসি— ড্রিঙ্ক, লুসি ড্রিঙ্ক! (লুসিকে আদর করে) লুসি, মাই হানি! হ্যাঁ সবটুকু খেতে হবে, সবটুকু। (হঠাৎ কী দেখে যেন আর্তনাদ করে ওঠে) লুসি, গেট আপ। রান অন। লুসি, রান অন— রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে— পালা, লুসি পালা! রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে, পলা!"[৫২]

সমবেত জনতা বেশিদিন শাসকের রক্ত চক্ষুর চোখরাঙানি সহ্য করেনা। তাই তারা গড়ে তোলে সম্মিলিত প্রতিবাদ। কোরাসের কণ্ঠে শোনা যায় — 'এ খেলার শেষ — যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।'[৫৩] ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন ঘটে —

"ছেলেটি।। এস, অনুষ্ঠান শুরু হোক। আঘাত কর বর্বর স্পর্দাকে ইতিহাসের জন্য আঘাত কর।

মেয়েটি।। আঘাত কর সিংহাসনের শোষণে— মর্যাদার জন্য আঘাত কর।

দ্বিতীয়।। আঘাত কর শৃঙ্খলে স্বাধীনতার জন্য আঘাত কর।

কোরাস।। আঘাত কর জীবনের জন্যে আঘাত কর— আঘাত কর।"[৫৪]

এইভাবে দেখা যায় নাটকটিতে —

দৃশ্য — ২টি, চরিত্র — ৫টি — প্রথম, দ্বিতীয়, ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাস

নাটকে তিনটি শ্রেণী — শাসক — প্রথম চরিত্র যার প্রতিনিধি, শাসকের অনুগত — দ্বিতীয় চরিত্র যার প্রতিনিধি, শাসিত ও সমগ্র সিস্টেম বিরোধী — ছেলেটি, মেয়েটি ও কোরাস যার প্রতিনিধি।

নাটকের দৃশ্যসজ্জা

প্রথম দৃশ্য

জেলখানার চিত্র

↓

রাজাসাহেবরূপী প্রথম এবং শাসকের অনুগত দ্বিতীয়

শিক্ষকরূপে প্রথম এবং দ্বিতীয় ছেলেটি ও মেয়েটি ছাত্র-ছাত্রী রূপে অবতীর্ণ

↓

পুনরায় রাজাসাহেবরূপী প্রথম

↓

জেলখানার চিত্র

↓

প্রথম ব্যবসায়ী ও দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতারূপে অবতীর্ণ

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেলখানার চিত্র — দ্বিতীয় পুলিশরূপে অবতীর্ণ

↓

দ্বিতীয় বাবা ও ছেলেটি ও মেয়েটি প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে আবির্ভূত

↓

দ্বিতীয়ের বিজ্ঞাপনদাতারূপে আবির্ভাব

↓

বৃদ্ধের বেশে প্রথম

↓

রাজাসাহেবরূপী প্রথম

↓

সফিসটিকেটেডরূপে প্রথম, রাজাসাহেবের বেশ

নাট্য উপস্থাপনা ও চরিত্রগুলির অবস্থান

প্রথম	দ্বিতীয়	ছেলেটি ও মেয়েটি	কোরাস (ছেলেটি + মেয়েটি + দ্বিতীয়) জনতা
↓	↓	↓	↓
রাজাসাহেব (শাসকের প্রতিনিধি)	রাজার অনুগত (শাসকের ভৃত্য)	শাসিত শ্রেণীর প্রতিনিধি (বিদ্রোহের সুর)	সমষ্টি বিপ্লবের প্রতিনিধি
অবস্থান—	অবস্থান—	অবস্থান —	
↓	↓	↓	
রাজাসাহেব পুলিশ,	পাহারাদার,সৈনিক	প্রেমিক-প্রেমিকা	
↓	↓	↓	
শিক্ষকরূপে	বিজ্ঞাপনদাতারূপে	ব্যক্তিগত বিপ্লব থেকে সমষ্টিগত বিপ্লবে সামিল হওয়া	
↓	↓		
ব্যবসায়ীরূপে	সেপাইরূপে		
↓	↓		
বৃদ্ধবেশে	সংবাদপত্রের মালিকরূপে		
↓	↓		
রাজাসাহেবরূপে	চিকিৎসকরূপে, মস্তিষ্ক ধোলাই বিজ্ঞানীরূপে		
↓	↓		
ইন্টারভিউ	মধ্যবিত্ত চরিত্ররূপে, পিতারূপে		
অধিকর্তারূপে	↓		
	জনতার সঙ্গে বিপ্লবের অগ্রগামীরূপে		

এইভাবে দেখা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'রাজরক্ত' নাটকের অবয়বে বাস্তব জগতের ঊর্ধে উঠে একটা ফ্যান্টাসির জগত তুলে ধরতে চেয়েছেন। মাত্র দুটি দৃশ্যে চরিত্রদের বারংবার পোশাক পরিচ্ছদের পরিবর্তনে দৃশ্যের মধ্যে পট পরিবর্তন ঘটিয়ে বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনে মনোযোগী হয়েছেন। নাটকের গঠনশৈলীর অভিনবত্ব নাটকের বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনে সহায়ক হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৩০২.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে 'রাজরক্ত' নাটকটির মূল্যায়ন করো।

২। 'রাজরক্ত' নাটকটির গঠনকৌশল সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করো।

একক - ১৪

অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে সার্থকতা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৪.১ : 'রাজরক্ত' — অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে সার্থকতা

৩০২.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৪.১ : 'রাজরক্ত' — অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে সার্থকতা

লাতিন শব্দ Absurdus থেকে Absurd শব্দটি এসেছে, যার অর্থ out of tune। Absurd শব্দের অর্থ Compact Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে completely illogical or ridiculous। যুক্তিহীন পারম্পর্য অ্যাবসার্ড নাটকে লক্ষ্য করা যায়। অপার শূন্যতা, বিশ্বাসহীনতা, মূল্যবোধহীনতা, জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, পরিণতিতে অনাস্থা এই ধরণের নাটকের বৈশিষ্ট্য। অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের কাছে জীবন ও জগত উদ্ভট, অস্তিত্বহীন, অলীক মায়াময়।

অ্যালবেয়ার কামু তাঁর 'দি মীথ অফ সিসিফাস' গ্রন্থে বলেছেন "A world that can be explained through reasoning– however faulty is a familiar world. But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light– man feels a stranger. It is an irremidiable exile– because he deprived of memories of a lost homeland as much as he lacks the hope of a promised land to come. The divorce between man and his life– the actor and his setting truly constitutes the feeling of absurdity."

মার্টিন এসলিন অ্যাবসার্ড নাটকের প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন "The Theatre of the absurd is involved in relatively few problems that remain- life deal isolation and communication and it can be its nature only communicate one poets most intimate and personal intuition of the human situation has sense of being– his individual version of the world."

আয়ানেস্কোর মতে "The Absurd is not the meaningless. The Absurd is a positive assertion– impossible to formulate in any terms besides its own..... it is the meaning of an unmeaning– it is the starting point of a new perception of world."

এই রীতির নাটকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে হল-

১. অ্যাবসার্ড নাটকে স্থান কাল এবং পাত্র কোন নির্দিষ্ট প্রথাগত সময়ক্রমের অধীন থাকে না। অর্থাৎ নাটকের ত্রি ঐক্য (Unity of time– space and action) লক্ষিত হয় না।

২. এই নাটকে কাহিনি, চরিত্রের পারম্পর্যকে অস্বীকার করা হয়। বিবর্তনধর্মী চরিত্র চিত্রণ অ্যাবসার্ড নাটকে লক্ষ্য করা যায় না। প্রচলিত নায়ক বা নায়িকা চরিত্রের প্রাধান্য বা গুরুত্ব এই জাতীয় নাটকে থাকে না।

৩. অদ্ভুত বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটা মূল অবয়ব গড়ে তোলা হয়।

৪. সুনির্দিষ্ট নাট্যগঠন দেখা যায় না। কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না। নাটকের আঙ্গিক পরিকাঠামো কোনো চরিত্রের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে ওঠে না। চরিত্র নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করতে থাকে কোনো একটি কেন্দ্রীয় ভাবনাকে ঘিরে প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। তাই, নাট্যগঠন কাব্যধর্মী।

৫. ভাষার দুর্বোধ্যতা এই ধরণের নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে অর্থপূর্ণ ভাষার ভূমিকা অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা অস্বীকার করেন। সংলাপকে অ্যাবসার্ড নাটকের উপযোগী করে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হয়।

৬. এক প্রবল সর্বব্যাপী অর্থহীনতার ধারণা তৈরির মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন ঘটে। এই ধরনের নাটকে চরিত্রের আচার-আচরণ সঙ্গতিহীন, জীবন অর্থহীন, শূন্যতাই যেন জীবনের শেষ কথা। নেতিতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। এই ধরণের নাটকে আকস্মিক সূচনা এবং পরিণামহীন উপসংহার দেখা যায়। নাটকে কোনো climax থাকে না।

৭. নাটকের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে মঞ্চে ব্যবহৃত উপকরণের একটা অদ্ভুত সম্পর্ক এই ধরণের নাটকে লক্ষ্য করা যায়।

৮. প্রথাগত মূল্যবোধকে অস্বীকার হয়। অ্যাবসার্ড নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব অনেকাংশেই অনুপস্থিত।

৯. নিষ্ক্রিয়, হতোদ্যম, বৃন্তচ্যুত মানুষের ছবি অ্যাবসার্ড নাটকে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

প্রথাগত নাটকের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় —

১. স্থান আর কালের সীমা প্রথাগত নাটকে নির্দিষ্ট, কিন্তু যুক্তিনির্ভর নির্দিষ্টতাকে অ্যাবসার্ড নাটকে অস্বীকার করা হয়।

২. প্রথাগত নাটকে নির্দিষ্ট অর্থ বহনকারী শব্দ প্রয়োগে সংলাপ লিখিত হয়। কিন্তু সামাজিক অর্থকে অস্বীকার করে অ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপ লিখিত হয়।

৩. প্রথাগত নাটকে নাট্যগতি দ্রুততার সঙ্গে সমাপ্তির অভিমুখে ধাবিত হয়, কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে এই শর্ত লঙ্ঘিত হয়।

৪. প্রথাগত নাটকে প্রতিটি ঘটনা সুনির্দিষ্ট ভাবে ক্রমপরম্পরায় ঘটে যায় এবং নাটক তার পরিণতিতে পৌঁছোয়। যুক্তির এই শৃঙ্খলা অ্যাবসার্ড নাটকে লক্ষিত হয় না।

৫. প্রথাগত নাটকের সূচনা, বিকাশ এবং পরিণতি আছে, কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে কোনও ভাবেই সুসংবদ্ধ নয়। অ্যাবসার্ড নাটকে সূচনা ও বিকাশ থাকলেও কোনও সুনির্দিষ্ট পরিণতিতে এই

নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে না।

এবারে এইসব শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটকটিকে অ্যাবসার্ড নাটকের কোঠায় ফেলা যাবে কিনা তা বিচার করা যেতে পারে।

'রাজরক্ত' নাটকটির দৃশ্য মাত্র দুটি— প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্য। এই দুটি দৃশ্যেই সমগ্র নাট্য কাহিনীর বিন্যাস। নাটকের চরিত্র সংখ্যা পাঁচটি — প্রথম, দ্বিতীয়, ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাস। নাটকটিতে তিনটি শ্রেণী বর্তমান। শাসক— প্রথম চরিত্র যার প্রতিনিধি, শাসকের অনুগত— দ্বিতীয় চরিত্রটি যার প্রতিনিধি, আর শাসিত ও সমগ্র সিস্টেমের বিরোধী— ছেলেটি মেয়েটি ও কোরাস যার প্রতিনিধি।

প্রথমেই নাট্যকার নাটকটির যে মঞ্চনির্দেশ করেছেন তা থেকে কয়েকটি সূত্র লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে—

(১) 'পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের মাঝ বরাবর একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে এসেছে।'[৫৫]— মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে মঞ্চের মাঝখানে রাখা প্ল্যাটফর্ম ও তা থেকে নেমে আসা সিঁড়ি এটাই ইঙ্গিত করে যে শাসকরা সবসময় সাধারণ জনগণের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখে। শাসক ও শোসিতের তাই দ্বন্দ্ব অনিবার্য। তাদের পারস্পরিক লড়াইয়ের অন্ত নেই। কারণ শাসক ও শোসিতের রূপ যুগে যুগে বদলায়, কিন্তু সিস্টেমের পরিবর্তন হয় না।

(২) 'প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে দুটি কালো উচু দেওয়াল।'[৫৬]— কালো উঁচু দেওয়াল আসলে শোষণের অন্ধকার। বর্তমান সভ্যতায় ধনতন্ত্রের নখদন্ত সাধারণ মানুষকে যেমন পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে, ঠিক তেমনি ধনতন্ত্র তার ভোগ সুখের নেশায় ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য উঁচু দেয়াল তুলে দিয়েছে।

(৩) 'দুটি দেওয়ালেরই উপরিভাগে একটি করে ছোট জানালা, যেমন জেলখানায় থাকে।'[৫৭]— এখানে আন্তর্জাতিক জেলখানা হল সমগ্র ধনতান্ত্রিক কাঠামো, আর জানলা দিয়ে যে আলো প্রবেশ করবে তা আসলে বিপ্লবের ও মুক্তির আলো— যা জনসাধারণের দলবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে এসে প্রবেশ করবে।

(৪) 'বাঁদিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি লাল বোর্ড ঝুলছে, বোর্ডের মাথায় কয়েকটি হুক লাগানো। হুকগুলিতে ঝুলছে একটি সাদা কোট, গলার ফাঁস ও একটি পুলিশের টুপি।'[৫৮] — 'লাল বোর্ড' যেন নিয়ম ও নিষেধের সূচক। পুঁজিবাদী শোষণের করাল রূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে হুকে 'গলার ফাঁস' ঝুলিয়ে। আর প্রশাসনিক ক্ষমতার আস্ফালনের প্রতীক চিত্রায়িত হয়েছে 'পুলিশের টুপি'র ব্যবহারে।

(৫) 'ডান দিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি লাল দরজা, দরজার মাথায় একটি লালা আলো।'[৫৯]—শাসক বা রাজা সাহেবের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে উপরিউক্ত মঞ্চ নির্দেশের সূত্রে। কিন্তু রাজাসাহেবও হয়তো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কারাগারে বন্দী। তার ক্ষমতার মত্ততা বা আস্ফালনের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর হাতেও কোন কিছু করার থাকে

না। তিনিও সিস্টেমের দাস। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নিরন্তর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাই অব্যাহত।

(৬) 'মঞ্চের একেবারে সামনে বাঁদিকের কোণে একটি স্ট্যাণ্ডে লাগানো একটি গ্লোব। গ্রোবের সঙ্গে লাগানো একটি বিরাট কালো নোংরা হাত গ্লোবটার ঠিক ওপরে ঝুলে আছে, দেখে মনে হয় যেন পুরো গ্লোবটাকে মুঠোয় ধরতে চাইছ।'[৬০]— এখানে 'গ্লোব'— আন্তর্জাতিক পরিধির সীমাসূচক। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষণের নোংরা ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিয়ে পুরো গ্লোবটাকেই হাতের মুঠোয় ধরবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

(৭) 'গ্লোবের ঠিক ওপরে হাতের থাবার নিচে একটা সাদা টেলিফোন রিসিভার। মঞ্চের আরও সামনে দু'কোণে দুটি লাল চেয়ার। চেয়ার দুটির সঙ্গে লাগানো অনেকগুলি শেকল ঝুলছে।'[৬১] — 'সাদা টেলিফোন রিসিভার' এখানে বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতীক, আর 'লাল চেয়ার' বিপ্লবের প্রতীক। কিন্তু সেই বিপ্লবকে 'শেকল' পরিয়ে রেখেছে পুঁজিবাদ।

(৮) 'প্রথম ব্যক্তি মঞ্চের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একটি বড় হলুদ ঝাড়ন দিয়ে চামড়ার চাবুক পালিশ করছে। মঞ্চের ডানদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি আরেকটি ঝাড়ন দিয়ে একটি বন্দুক সাফ করছে।'[৬২] — এখানে 'চাবুক পালিশ করছে' দেহ থেকে চামড়া আলাদা করতে আর 'বন্দুক সাফ করছে' শরীর থেকে প্রাণ কেড়ে নিতে — এই দুই প্রতীকী অর্থই দ্যোতিত হয়েছে ব্যঞ্জনায়।

পর্দা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সামনে চাক্ষুস হয় এক জেলখানার চিত্র। রাজাসাহেবের সেই জেলখানায় বন্দী ছেলেটি ও মেয়েটি। এখানে শাসন যন্ত্রকে সচল রাখার চেষ্টায় ব্রতী প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি। রাজাসাহেব বেনিয়ম পছন্দ করেন না। তার চাবুক কথা বলে, ভেল্কি জানে। রাজাসাহেবের কুঠিতে কারো কিছু সরাবার হুকুম নেই, কোন কিছুই এলোমেলো করার নিয়ম নেই। চারিদিকে সজাগ চোখ সর্বদা সতর্ক। দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজাসাহেবের অনুগত, 'স্পাই'। সে সব খবরাখবর রাজাসাহেবকে পৌঁছে দেয়।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সবকিছুই নিয়মতান্ত্রিক। কেউ সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধাচারণ করলেই তার উপর আঘাত নেমে আসে। তবুও গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়াস চলে। আর সেই গণ-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করবার জন্য শাসক শ্রেণীও নিশ্চুপে বসে নেই। তারাও সর্বতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমগ্র সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য। তাই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠছে।

শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ বাস্তবে না পারলেও প্রতিমুহূর্তে শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজের স্বপ্ন সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে চায়— পাল্টে দিতে চায় সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে। অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষ তাদের স্বপ্নের জগতে যমের ঘরে পাঠাতে চাই শাসককে। এখানে তরুণ ছেলেটিও তার সেই একান্ত ব্যক্তিগত সেই স্বপ্নের দেশে রাজাসাহেবকে মেরে ফেলে—

"রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে।আমি, আমি রাজাসাহেবকে মেরেছি। এবার এই ঘরটার চেহারা পুরো বদলে ফেলব। আমি একটা বাজে লোক নই, আমার ঘেন্না আছে, রাগ আছে, ইচ্ছে আছে"[৬৩]

নাটকটি ক্রমশ বিবিধ খেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। প্রত্যেকেই সে খেলায় সামিল হয়— এ এক রাজনৈতিক মারণ খেলা। এ খেলা ক্ষমতা দখলের খেলা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোর করে যেকোন কাজ করতেই সাধারণদের বাধ্য করে। মাঝে মাঝে সম্মিলিত জনতার প্রতিবাদের ঢিল রাজাসাহেবের ঘরে

এসেও প্রবেশ করে। কিন্তু শাসক তাতে বিচলিত নয়। সে সুরই যেন রাজাসাহেবরূপী প্রথমের ন্ট্রে ধ্বনিত হয়—

"ওতো সব সময়ই হচ্ছে— তাই বলে ওই গোলমালটাই বা বেশি করে কানে যাবে কেন?....সেই প্রথম দিন থেকে ওরা একটা ঢিল ছুঁড়তে চাইছে— দীর্ঘ বছর পর একটা ঢিল এসে ঘরে পড়ল, বেচারা! একটু সান্ত্বনা তো ওদের চাই। ও ঠিক হয়ে যাবে, মন দিয়ে কাজ কর— সব ঠিক হয়ে যাবে।"[৬৪]

জনগণের যেকোনো প্রতিবাদী সুরের কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রশক্তি দমিয়ে দেয় যেকোন উপায়ে। প্রতিবাদ তখন তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বলে ওঠে —

"বিপক্ষের অস্ত্রকে যত তুচ্ছ ভাবতে পারবে ততোই না তোমার মনোবল মানে কিনা অস্ত্রবল।"৬৫

এরপর নিকেল ফ্রেমের চশমা ও গলায় পরে চাদর পরে প্রথম শিক্ষকের রূপ ধারণ করে। এটা আসলে রাজাসাহেবেরই অন্য আরেকটি রূপ। এখানে দ্বিতীয়, ছেলেটি ও মেয়েটি ছাত্র-ছাত্রীর রূপে অবতীর্ণ। দ্বিতীয় শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র। আনুগত্যের পৌনঃপুনিক শিক্ষাদানে বারংবার 'স্যার' বলিয়ে নেওয়ার প্রতীকী সংলাপে সিস্টেমের ভয়ংকরতার ছবির মধ্যে Dramatic Conflict ঘটার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। অনুগত ছাত্রের মুখের মদের গন্ধকে বাহবা প্রদান, একান্তে বাড়িতে ডেকে মগজ ধোলাই করার ইচ্ছা — সবই সিস্টেমের সুচতুর কলাকৌশলের পরিচয়ক।

ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী। কোনো কিছু নতুন ভাবনা এই সিস্টেমে থেকে ভাবাও অকল্পনীয়। শুধু চর্বিত চর্বণ। শিক্ষা ব্যবস্থার এই অন্ত:সারশূন্যতা ও ধনতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার এক্সটেনশনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

রাজাসাহেবের ভয়ংকর রূপ পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে যখন তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—

"আমার আঙ্গুলগুলো তোমার ঘাড়ে গলায় খেলা করছে— আঙুলগুলোও কথা বলে।.ভয় করছে। আঙুলগুলো আমার ধরে দেখো। যেমন শক্ত, তেমনি কমল। মিষ্টি করে ধরতে জানে, আবার দম বন্ধ করেও ধরতে জানে।"[৬৬]

অত্যাচারী শাসকের চিরাচরিত রূপ, সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি মেয়েটির কান্না ও আর্তনাদ বোঝায় শাসকের চোখ রাঙানির কাছে নারী কত অসহায়।

পুঁজিবাদী শোষণের নগ্ন রূপ চিত্রিত হতে দেখা যায়। মোহিত জানাতে ভোলেন না এরূপ দুর্বিষহ অবস্থায় দুটি রাস্তা খোলা থাকে— হয় সিস্টেমের দাস হয়ে থাকো, নয়তো তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গণআন্দোলন সংগঠিত করো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা আমাদের হৃদয়কে কিনে নেয়, কিনে নেয় আমাদের মেধাশ্রম ও দৈহিক শ্রমকে। আবেগ অনুভূতি হারিয়ে যায়, হৃদয়টাও যন্ত্রে পরিণত হয়। ছেলেটির সংলাপে এই হৃদয়বেদনাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়—

"আমার বুকের হাড় সরিয়ে হৃদয়টা চুরি করতে চায়। সবকটা আঙুলের শিরায় শিরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। আমি হাত মুঠো করতে পারি না, কিছু ধরতে পারি না। জান, দেয়ালে লাথি মারলে আমি আর শব্দ শুনতে পাই না।"[৬৭]

বস্তুত রাজাসাহেবের হাত থেকে কোনো কালে তাদের মুক্তি নেই। কারণ সারা পৃথিবীতেই গণতন্ত্রের জাল সুবিন্যস্ত এবং বিবিধ মুখোশে সারা পৃথিবীটাতেই খেলা করে বেড়ায় রাজাসাহেবের মতো

শাসকগোষ্ঠীর দল।

এরপর দ্বিতীয় জনের বিজ্ঞাপনের কৌশল দেখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মগজকে সহজেই আকর্ষণ করবার শক্তি আছে এই ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞাপন সিস্টেমের। তা সহজেই ভালো-মন্দ, বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতাকে লুপ্ত করে সিস্টেমের অনুগত করে তোলে সাধারণকে।

নাট্যঘটনার পরবর্তীতে মেয়েটি যখন ব্যবসায়িক রাজসাহেবকে চিনতে পারে এবং ছেলেটি সগর্বে জানিয়ে দেয়, 'এবার আমরা দুজনে আবার মুখোমুখি হয়েছি।'[৬৮]— তখন বোঝা যায় বিদ্রোহের সুর একটু একটু করে ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। কোমর থেকে কাল্পনিক ছুরি বের করে ছেলেটি যখন প্রথমকে পেছন থেকে আঘাত করতে উদ্যত হয়, তখন প্রথম দ্রুত সে আঘাত প্রতিহত করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম পট পরিবর্তনে শাসকের চেহারা নিয়ে দ্বিতীয় নব সাজে ফিরে আসে বাবা হয়ে। যেকোনো অজুহাতেই না-পসন্দ ছেলেটির সঙ্গে মিশতে দিতে ও সিস্টেম থেকে বাইরে বেরোতে দিতে তিনি অনাগ্রহী। তার গলায়ও রাজাসাহেবের শাসানি —

"এ বাড়ীর যেখানে যা কিছু যেমন ভাবে আছে ঠিক তেমনি থাকবে। এভাবে চলে আসছে— তাতে আমাদের আভিজাত্য কিছু কমেনি।.এতদিন এই নিয়মেই বড় হয়েছ, হঠাৎ নিয়মটা নস্যাৎ করা যায় না— সেটা অকৃতজ্ঞতা হবে।"[৬৯]

নিরুপায় দুটি প্রাণ নিষ্ফল বেদনার কথা সকলকে জানাতে মিডিয়াকে খবর দেয়। কালো ঠুলি চশমা পরে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতারূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনদাতাও রাজাসাহেবেরই লোক। তাই নিরুপায় যুবক যুবতীর ব্যর্থতার ক্রন্দন ছাপাতে তারাও অনাগ্রহী। মুক্তি নেই কোথাও। সবাই বৃহত্তর সিস্টেমের জেলখানায় বন্দী।

তবুও ছেলেটি ও মেয়েটিকে সাময়িক মুক্তি দিতে বৃদ্ধের বেশে হাজির হয় প্রথম। বৃদ্ধটি তাদের গারদের বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে ছেলেটির মনে হয়—

"গারদের বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কতো ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াব কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে— যখন পথ থাকে না তখনই তো জেলখানা! জান, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।"[৭০]

বৃদ্ধ তাদের টাকা খরচ করে নগদে কিনেছে। সঙ্গে নিয়েছে ক্যাশমেমো। সে নগদে মানুষ কেনাবেচার কারবারী। বোঝা যায় প্রতিনিয়ত আমরা যেন ধনতন্ত্রের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছি। কেউ যেন অর্থের বিনিময়ে আমাদের কিনে নিচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাবার জন্য। ছেলেটি ও মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে যেতে রাজি না হলে বৃদ্ধ হুমকির সুরে শাসায়—

"দেখছি দু'টোতে মিলে ফণা তোলে! ওটি কর না— বিষদাঁত ভাঙার পাথর থাকে আমার সঙ্গে-"[৭১]

প্রয়োজনে সে 'চিকিচ্ছে' চালাতেও প্রস্তুত। এই 'চিকিচ্ছে' যেকোনো শাসকমাত্রই চালায়। এর হাত থেকে কারো রেহাই নেই—

"চলে যাবে। পথ কোথায়? রাস্তাগুলোও যে আমার নামে সব কিনে নিয়েছি। যখন কেউ হাঁটে, আমরা তার পায়ের শব্দ টেপ-রেকর্ডে তুলে রাখি। কী রকম শব্দ, কী তার মানে, পায়ের শব্দ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিলতে চায়, কাদের সঙ্গে এক তালে হাঁটে— সব নোট করে রাখা হয়।"[৭২]

বোঝা যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আমাদের গতাগতির সব খবরাখবরই রাখে। আমাদের সহজভাবে পথ চলার উপায় নেই। আমাদের মুক্তি নেই।

তবুও ছেলেটি ও মেয়েটি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে গরাদের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। আর তখনই বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লাল দরজার সামনে নকশাকাটা পাঞ্জাবী, নাগরা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজাসাহেবরূপী প্রথম।

ছেলেটি ও মেয়েটিকে আলাদা করতে গোটাকতক 'স্পেল' দেওয়া হয়। মনে হয় এবারে আস্তে আস্তে অসন্তোষের মেঘ কেটে যাবে। ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চায় সবাই শান্ত সুরে যেন কাজে মন দেয়। চারিদিকে যেমন ভাবে সব গোছানো আছে তা যেন সেরকমই থাকে। তা এলোমেলো করতে নেই। কোনো কিছু ভুল করলেই উদ্যত খাড়া নেমে আসে। ছেলেটি ও মেয়েটিকে আলাদা করে দেওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয়কে রাজাসাহেবরূপী প্রথম জানিয়ে দেয়—

"তা দুজনকে আলাদা করলেই তো চলবে না। বাইরে যে মানুষগুলো দিনরাত চ্যাঁচায়, ওদের থেকে আলাদা করতে হবে যে।"[৭৩]

শুধু অত্যাচার, শাস্তি প্রদান কিংবা গারদে বন্দী করে রাখাই নয়, বিপ্লবী কণ্ঠকে শান্ত করতে চাকরির টোপও দেয় শাসকগোষ্ঠী।

নাট্যকার সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। সম্মিলিত গণ-আন্দোলনই একমাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারে। দ্বিতীয়ের সুরে সুর মিলিয়ে ছেলেটিও যখন বলে ওঠে — 'একা একা যুদ্ধ হয় না—লাভ নেই।'[৭৪] তখন বোঝা যায় শাসকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুর ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। এবারে হয়তো কাঙ্খিত মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

এরপর দামী খাকি শার্ট-প্যান্ট, পায়ে শু, মাথায় ফেল্টের টুপি পরে সফিস্টিকেটেড রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়। এখানে তার ক্রূঢ়তার চরমতম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রিয় কুকুর লুসি — যে, যেকোন কারো পদশব্দ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে চিনে নিতে পারে, যে শাসকের অবিডিয়েন্ট, যে দুষ্টু ছেলেদের কামড়ে রক্ত চুষে আত্মপরিতৃপ্তি খুঁজে পায়, তার খোঁজেই প্রথমের আবির্ভাব। যদিও ছেলেটি ও মেয়েটি সহজেই রাজাসাহেবকে চিনতে পারে তার মুখের আওড়ানো সংলাপে——

"এটি একটি মহৎ দায়িত্ব। দায়িত্বই ধর্ম, রেলিজিয়ান। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য মডার্ন সায়েন্স আমাকে অ্যাসিস্ট করছে, টপ ব্রেনস আমাকে কাউনসেল দিচ্ছে। এবং আমার গোটা মেশিনারি অসংখ্য মানুষ মাথায় আছে। আই মাস্ট লাভ মাই সিলেকটেড নেবারস। প্রোটেকশনের জন্য রয়েছে গান, বুলেট, প্লেন, ওয়ারঅ্যাণ্ড হোয়াট নট।. হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড়। তেমন কস্টলিও নয় অথচ ভারি টেস্টফুল— অ্যাণ্ড দে লাইক ইট ভেরি মাচ।"[৭৫]

ছেলেটি ও মেয়েটির রক্ত পরীক্ষা করে রাজাসাহেব খুঁজে পেতে চান প্রতিবাদের মূল সূত্রটিকে। তিনি ভালো করেই জানেন কেউ কেউ সিস্টেমের বিরুদ্ধে ফোঁস করে উঠবেই। কিন্তু তাকে মেরে ফেললেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং তাকে ভাবতে হয়, খুঁজতে হয় তাদের ফোঁস করার কারণ কী? তাদের রক্তে কী আছে? রক্তের মধ্যে থেকে বিদ্রোহের বীজাণু খুঁজে বার করে তাকে সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে শেষ যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ছেলেটি গর্জে উঠে রাজাসাহেবকে নতুন একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। সে প্রতিবাদী স্ট্রে জানিয়ে দেয় —

"আমাদের রক্তের গভীরে আছে ঘৃণা আর প্রতিরোধ। একদিন তার মুখোমুখি আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। আর হয়ত এই এক্সপেরিমেন্ট সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকেই এগিয়ে আনবে।"[৭৬]

শেষমেষ তাই ঘটে। রাজাসাহেবের মুখে উচ্চারিত হয় অসহায়িতের সংলাপ—

"প্রথম।। ব্লাড! বডড কম ছিল রক্ত দুটো শরীর অথচ এত কম রক্ত না! লুসিটারও পেট ভরে না! আপনারা ব্লাড রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এবারও আমি আপনাদের সুখী করতে পারলাম না। সমস্ত রক্ত ঘেঁটে-ঘুটেও খুঁজে পেলাম না কোথায় ওদের রোগের বীজাণুগুলো লুকিয়ে আছে ওদের রক্ত এতো চালাক, ধূর্ত, এতো পিছল ! আমার আঙুল ধরতে পারে না, মাইক্রোস্কোপে ছায়া পড়ে না। একটু নাড়লে বাটির মধ্যে রক্তটা কিরকম খলখল করে হাসে। আমার শেষ যুদ্ধ ওদের এই ভয়ঙ্কর রক্তকণাগুলোর সঙ্গে। আমাকে জিততেই হবে, জিততেই হবে। বাটিটার রক্তে আমার ছায়া পড়েছে— কী সুন্দর মুকুট। (বাটিটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে) একী! আমার মুকটটার গায়ে অসংখ্য পোকা! রক্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আমার মুকুটে! আমার মুকুত! (দু'হাতে মাথার অদশ্য মুকুটটা চেপে ধরতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা মাটিতে আছড়ে পড়ে। মাথাটা চেপে ঐ দিকে ভয়ার্ত তাকায়, লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়) রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাকে তাড়া করছে, (প্রায় কান্নার মত গলায়, মাথাটা দু'হাতে চেপে শরীরটা বাঁকিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ভয়ার্ত সরে যেতে যেতে) গড়িয়ে গড়িয়ে রক্তটা আমাকে তাড়া করছে! লুসি! লুসি! সেভ মি! লুসি! (হঠাৎ যেন কাল্পনিক লুসিকে দেখতে পায়, স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু তবুও আতঙ্কিত গলায়) লুসি, মাই লুসি— ড্রিঙ্ক, লুসি ড্রিঙ্ক! (লুসিকে আদর করে) লুসি, মাই হানি! হ্যাঁ সবটুকু খেতে হবে, সবটুকু। (হঠাৎ কী দেখে যেন আর্তনাদ করে ওঠে) লুসি, গেট আপ। রান অন। লুসি, রান অন— রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে— পালা, লুসি পালা! রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে, পলা!"[৭৭]

সমবেত জনতা বেশিদিন শাসকের রক্ত চক্ষুর চোখরাঙানি সহ্য করেনা। তাই তারা গড়ে তোলে সম্মিলিত প্রতিবাদ। কোরাসের কণ্ঠে শোনা যায় — 'এ খেলার শেষ — যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।'[৭৮] ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন ঘটে —

"ছেলেটি।। এস, অনুষ্ঠান শুরু হোক। আঘাত কর বর্বর স্পর্দাকে ইতিহাসের জন্য আঘাত কর।

মেয়েটি।। আঘাত কর সিংহাসনের শোষণে— মর্যাদার জন্য আঘাত কর।

দ্বিতীয়।। আঘাত কর শৃঙ্খলে স্বাধীনতার জন্য আঘাত কর।

কোরাস।। আঘাত কর জীবনের জন্যে আঘাত কর— আঘাত কর।"[৭৯]

এইভাবে দেখা যায় বস্তুত আমরা সবাই যেন এক শাসন যন্ত্রের কারাগারে বন্দী। এই কারাগারেই নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন খেলা চলতে থাকে, যেমন উন্নয়নের খেলা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের খেলা, সুকৌশলী চিন্তায় মানুষের ইজ্জত কিনে নেওয়ার সস্তা অথচ অনতিক্রম্য এক পলিটিক্সের খেলা।

এই নাটকে রাজা সাহেব জালের আড়ালে থাকেন না। তিনি সর্বসমক্ষেই তার গোপন খেলা খেলে যান। বিজ্ঞানীরা যেমন পরীক্ষাগারে গিনিপিগকে নানাবিধ পরীক্ষার বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেন, ঠিক তেমনি এখানে সেই পরীক্ষাগারের বস্তু হিসেবে নির্বাচিত হয় সাধারণ মানুষেরা। কিন্তু কিছু তরুণ থাকে

যারা শাসকের শাসানিকে অগ্রাহ্য করে। তারা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধতা করে, কখনও হাতে তুলে নেয় ধারালো অস্ত্র। তারা শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে এবং রাজরক্ত চায়।

১৯৭০-৭১ - এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশ্বব্যাপী দুর্বিসহ ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন। গণতন্ত্রের ইতিবাচক রূপ খুঁজতেই 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন নাট্যকার। মোহিত সমূলে আঘাত করতে চেয়েছেন তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয়। শাসক গোষ্ঠীর সযত্ন লালিত স্বপ্নের সুউচ্চ মিনারে সজোরে আঘাত করে মোহিত দেখাতে চেয়েছেন গণজাগরণের উত্থানের শক্তির কাছে শাসকের সবই ঠুনকো, ভঙ্গুর। তাসের ঘরের মতো শাসন যন্ত্রের মিনার ভূলুণ্ঠিত হয়। সাধারণরা পৌঁছে যায় তথাকথিত রাজার শয়ন কক্ষে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় —

১. 'রাজরক্ত' নাটকে নাটকের ত্রি ঐক্য (Unity of time– space and action) লক্ষিত হয় না।

২. অ্যাবসার্ড নাটকের মতো এই নাটকে কাহিনি, চরিত্রের পারম্পর্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। বিবর্তনধর্মী চরিত্র চিত্রণ এই নাটকে লক্ষ্য করা যায় না। প্রচলিত নায়ক বা নায়িকা চরিত্রের প্রাধান্য বা গুরুত্ব এখানেও লক্ষ্য করা যায় না।

৩. অদ্ভুত বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের মূল অবয়ব গড়ে তোলা হয়েছে।

৪. সুনির্দিষ্ট নাট্যগঠন এখানে দেখা যায় না। কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও লক্ষিত হয় না। নাটকের আঙ্গিক পরিকাঠামো কোনো চরিত্রের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। চরিত্র নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করতে থাকে কোনো একটি কেন্দ্রীয় ভাবনাকে ঘিরে প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। তাই, নাট্যগঠন কাব্যধর্মী। যেমন —

"দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের পাঠশালায় অগ্নিসংযোগ।

প্রথম।। শান্তি সেনানীর প্রহরায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট।

প্রথম।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে লক-আউট।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ক্ষেত-খামার জবর দখল।

প্রথম।। জবর দখল নিবারক জব্বর আইন চালু।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের দপ্তরে দপ্তরে কর্মবিরতি।

প্রথম।। রাজাসাহেবের বিদ্রোহী কর্মীদের ছাঁটাই।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের গ্রামে-গঞ্জে ঝাণ্ডা আর ঝাণ্ডা।

প্রথম।। সবার ওপরে রাজাসাহেবের ডাণ্ডা আর ঠাণ্ডাঘর।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজপথে ছুরি, বোমা।

প্রথম।। রাজাসাহেবের হাতে টিয়ার গ্যাস গুলি।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্যে রাজপুরুষ হত্যা।

প্রথম।। রাজাসাহেবের রাজ্যে নারীপুরুষ হত্যা।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্য আজ রক্তাক্ত।

প্রথম।। রাজাসাহেবের হাত আজ রক্তাক্ত।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্যে উত্তাল গণবিক্ষোভ।

প্রথম।। কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজাসাহেবের কমিশন নিয়োগ।

দ্বিতীয়।। কমিশনের চেয়ারম্যান রাজাসাহেব।।

প্রথম।। প্রথম সদস্য রাজাসাহেব।

দ্বিতীয়।। দ্বিতীয় সদস্য রাজাসাহেব।

প্রথম।। রাজাসাহেব দীর্ঘজীবী হউন।

দ্বিতীয়।। জনতার দাবি, রাজাসাহেবের রক্ত চাই।

প্রথম।। রাজাসাহেব আজও জীবিত।"[৮০]

৫. সংলাপকে এখানে অ্যাবসার্ড নাটকের উপযোগী করে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন—

"প্রথম।। কী হল?

মেয়েটি।। ঢিল পড়ছে। ঘরে ঢিল পড়ছে। বাইরে থেকে ওরা ছুঁড়ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

প্রথম।। তাই নাকি? ছড়াটা বল তও? বল, ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বল, সকলে মিলে বল।

মেয়েটি।। (প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে) বুলেট বন্দনা রাজাসাহেব বিরচিত।

দ্বিতীয়।। (প্ল্যাটফর্মের নিচে ডানদিকে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গীতে) ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি।। যে কোন অশান্তির একমাত্র মহৌষধ।

ছেলেটি।। একবার মাত্র ব্যবহারেই কাজ হয়।

দ্বিতীয়।। ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি।। যে কোন অশান্তির চিরস্থায়ী আরাম।

ছেলেটি।। অত্যন্ত সস্তা, অথচ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয়।। (কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে) জানটি আপনার গেল কোথায়, একি তাজ্জব বাত, রাজাসাহেবের বুলেটে হয়েছেন কাৎ।

মেয়েটি।। আঃ বুলেট!

ছেলেটি।। আঃ বুলেট! (বুকে হাত দেয়)

মেয়েটি।। ট্রেডমার্ক লক্ষ করিবেন, টুং টাং! (রেডিও কমার্শিয়াল)

প্রথম।। সাধু! সাধু!"[৮১]

৬. এক প্রবল সর্বব্যাপী অর্থহীনতার ধারণা তৈরির মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন ঘটে। এই নাটকের চরিত্রের আচার-আচরণ সঙ্গতিহীন, জীবন অর্থহীন, শূন্যতাই যেন জীবনের শেষ কথা। নেতিতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। নাটকের আকস্মিক সূচনা এবং পরিণামহীন উপসংহার অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়বাহী।

৭. নাটকের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে মঞ্চে ব্যবহৃত উপকরণের একটা অদ্ভুত সম্পর্ক এই নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। মাত্র দুটি দৃশ্যে চরিত্রদের বারংবার পোশাক পরিচ্ছদের পরিবর্তনে দৃশ্যের মধ্যে পট পরিবর্তন ঘটিয়ে বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনে মনোযোগী হয়েছেন নাট্যকার।

৮. প্রথাগত মূল্যবোধকে অস্বীকার হয়েছে এই নাটকে।

৯. নিষ্ক্রিয়, হতোদ্যম, বৃন্তচ্যুত মানুষের ছবি অন্যান্য অ্যাবসার্ড নাটকের মতো এই নাটকেও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের সূত্রে একথা বলায় যায় যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটকটি একটি সার্থক অ্যাবসার্ড নাটক।

৩০২.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রাজরক্ত' নাটকটি কোন শ্রেণীর নাটক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। 'রাজরক্ত' নাটকটির অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে সার্থকতা আলোচনা করো।

একক - ১৫

চরিত্র চিত্রণে ও সংলাপ সৃজনে শিল্পকুশলতা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৫.১ : 'রাজরক্ত' — চরিত্র চিত্রণে কৃতিত্ব

৩০২.৪.১৫.২ : 'রাজরক্ত' — সংলাপ সৃজনে শিল্পকুশলতা

৩০২.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৫.১ : 'রাজরক্ত' — চরিত্র চিত্রণে কৃতিত্ব

'রাজরক্ত' নাটকটির দৃশ্য মাত্র দুটি— প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্য। এই দুটি দৃশ্যেই সমগ্র নাট্য কাহিনীর বিন্যাস। নাটকের চরিত্র সংখ্যা পাঁচটি — প্রথম, দ্বিতীয়, ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাস। নাটকটিতে তিনটি শ্রেণী বর্তমান। শাসক— প্রথম চরিত্র যার প্রতিনিধি, শাসকের অনুগত— দ্বিতীয় চরিত্রটি যার প্রতিনিধি, আর শাসিত ও সমগ্র সিস্টেমের বিরোধী— ছেলেটি মেয়েটি ও কোরাস যার প্রতিনিধি।

নাট্য উপস্থাপনা ও চরিত্রগুলির অবস্থান

প্রথম	দ্বিতীয়	ছেলেটি ও মেয়েটি	কোরাস (ছেলেটি + মেয়েটি + দ্বিতীয়) জনতা
↓	↓	↓	↓
প্রথম	দ্বিতীয়	ছেলেটি ও মেয়েটি	কোরাস (ছেলেটি + মেয়েটি + দ্বিতীয়) জনতা
↓	↓	↓	↓
রাজাসাহেব (শাসকের প্রতিনিধি)	রাজার অনুগত (শাসকের ভৃত্য)	শাসিত শ্রেণীর প্রতিনিধি (বিদ্রোহের সুর)	সমষ্টি বিপ্লবের প্রতিনিধি
অবস্থান—	অবস্থান—	অবস্থান —	
↓	↓	↓	
রাজাসাহেব	পুলিশ, পাহারাদার, সৈনিক	প্রেমিক-প্রেমিকা	
↓	↓	↓	
শিক্ষকরূপে	বিজ্ঞাপনদাতারূপে	ব্যক্তিগত বিপ্লব থেকে সমষ্টিগত বিপ্লবে সামিল হওয়া	
↓	↓		

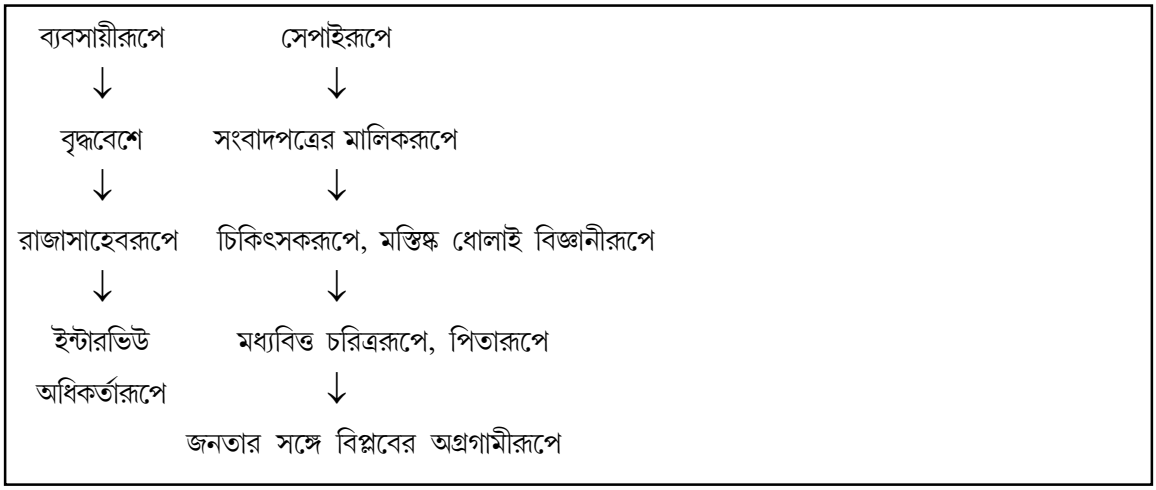

রাজাসাহেবের জেলখানায় বন্দী ছেলেটি ও মেয়েটি। এখানে শাসন যন্ত্রকে সচল রাখার চেষ্টায় ব্রতী প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি। রাজাসাহেব বেনিয়ম পছন্দ করেন না। তার চাবুক কথা বলে, ভেল্কি জানে। রাজাসাহেবের কুঠিতে কারো কিছু সরাবার হুকুম নেই, কোন কিছুই এলোমেলো করার নিয়ম নেই। চারিদিকে সজাগ চোখ সর্বদা সতর্ক। দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজাসাহেবের অনুগত, 'স্পাই'। সে সব খবরাখবর রাজাসাহেবকে পৌঁছে দেয়।

শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ বাস্তবে না পারলেও প্রতিমুহূর্তে শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজের স্বপ্ন সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে চায়— পাল্টে দিতে চায় সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে। অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষ তাদের স্বপ্নের জগতে যমের ঘরে পাঠাতে চাই শাসককে। এখানে তরুণ ছেলেটিও তার সেই একান্ত ব্যক্তিগত সেই স্বপ্নের দেশে রাজাসাহেবকে মেরে ফেলে—

"রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে।আমি, আমি রাজাসাহেবকে মেরেছি। এবার এই ঘরটার চেহারা পুরো বদলে ফেলব। আমি একটা বাজে লোক নই, আমার ঘেন্না আছে, রাগ আছে, ইচ্ছে আছে"[৮২]

এক রাজনৈতিক মারণ খেলা, ক্ষমতা দখলের খেলায় সবাই মেতে ওঠে। যদিও মাঝে মাঝে সম্মিলিত জনতার প্রতিবাদের ঢিল রাজাসাহেবের ঘরে এসেও প্রবেশ করে। কিন্তু শাসক তাতে বিচলিত নয়। সে সুরই যেন রাজাসাহেবরূপী প্রথমের ন্ট্রে ধ্বনিত হয়—

"ওতো সব সময়ই হচ্ছে— তাই বলে ওই গোলমালটাই বা বেশি করে কানে যাবে কেন?....সেই প্রথম দিন থেকে ওরা একটা ঢিল ছুঁড়তে চাইছে— দীর্ঘ বছর পর একটা ঢিল এসে ঘরে পড়ল, বেচারা! একটু সান্ত্বনা তো ওদের চাই। ও ঠিক হয়ে যাবে, মন দিয়ে কাজ কর— সব ঠিক হয়ে যাবে।"[৮৩]

জনগণের যেকোনো প্রতিবাদী সুরের কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রশক্তি দমিয়ে দেয় যেকোন উপায়ে। প্রতিবাদ তখন তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বলে ওঠে —

"বিপক্ষের অস্ত্রকে যত তুচ্ছ ভাবতে পারবে ততোই না তোমার মনোবল মানে কিনা অস্ত্রবল।"[৮৪]

নিকেল ফ্রেমের চশমা ও গলায় পরে চাদর পরে প্রথম শিক্ষকের রূপ ধারণ করলে বোঝা যায় এটা আসলে রাজাসাহেবেরই অন্য আরেকটি রূপ। এখানে দ্বিতীয়, ছেলেটি ও মেয়েটি ছাত্র-ছাত্রীর রূপে অবতীর্ণ। দ্বিতীয় শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র। আনুগত্যের পৌনঃপুনিক শিক্ষাদানে বারংবার 'স্যার' বলিয়ে নেওয়ার প্রতীকী সংলাপে সিস্টেমের ভয়ংকরতার ছবির মধ্যে Dramatic Conflict ঘটার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ের ছাত্র হিসেবে নিজস্ব কোনো মতামত নেই। স্যারের কথায় তার কাছে বেদবাক্য। সে কেবল পরীক্ষার খাতায় উগরে দেয় তার পঠিত বিদ্যা। সে শিক্ষকের আদর্শ ছেলে। পরীক্ষায় সে ফার্স হয়, হাইয়েস্ট নম্বর পায়। মেয়েটি মুখস্থ করে লিখতে চায় না। সে অরিজিনাল লিখতে চায়। দ্বিতীয় জন অরিজিনাল আর মুখস্থ দুটোই অ্যাভয়েড করে। মেয়েটি তাই পরীক্ষায় কম নম্বর পায়। আর তখন দ্বিতীয় গর্বের সঙ্গে বলে—

"তুমি পারবে— প্রোগ্রেস করছ, তবে হ্যাঁ, মোটে দুষ্টুমি করবে না। যত বাধ্য থাকবে, দেখবে তত উন্নতি হচ্ছে। দেশ থেকে এই গুণটিই তো লোপ পেয়ে যাচ্ছে কিনা।"[৮৫]

- এ সংলাপ আত্মম্ভরিতার সংলাপ। সহজেই বোধগম্য যে শিক্ষকের সংস্পর্শে দ্বিতীয় জনের যথার্থ শিক্ষা হয়েছে। অন্যদিকে ছেলেটির কাছে 'এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ লাইফ।'[৮৬] সে যেকোনো বিষয়েই প্রশ্ন করতে পছন্দ করে। প্রশ্ন করে বিপক্ষকে ধরাশায়ী করে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে চায়। সবকিছুকেই সে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করতে চায়। তাই সে পরীক্ষায় কম নম্বর পায় এবং কপালে জোটে শিক্ষকের গঞ্জনা। শিক্ষকরূপী প্রথম তাকে শেখায়—

"আসলে পড়াশুনোটা কী জান— এক ধরণের অ্যাসেসমেন্ট। আমি যা শেখাচ্ছি সেটা কদ্দুর গ্রহণ করতে পারলে, সেটাই হল মূল কথা। প্রশ্ন করতে পার— আপনি কী শেখাচ্ছেন? উত্তর হল, আমি যা শিখেছি, তাই শেখাচ্ছি। তার মানেটা হল এই যে প্রথমে কেউ একটা কিছু শিখেছিল— তারই এক্সটেনশন হচ্ছে এডুকেশন।.এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ এডুকেশন— যার মানে হচ্ছে রিপিটেশন অফ রিপিটেশন। অর্থাৎ একটা জিনিসই মকসো করতে করতে এগিয়ে যাওয়া।"[৮৭]

বোঝা যায় এই শিক্ষার সাথে জীবনের কোনো যোগ নেই— চিন্তা চেতনার কোনো যোগ নেই। ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী।

এরপর রাজাসাহেবের ভয়ংকর রূপ পরিদৃশ্যমান হয়ে—

"আমার আঙ্গুলগুলো তোমার ঘাড়ে গলায় খেলা করছে— আঙুলগুলোও কথা বলে।.ভয় করছে। আঙুলগুলো আমার ধরে দেখো। যেমন শক্ত, তেমনি কমল। মিষ্টি করে ধরতে জানে, আবার দম বন্ধ করেও ধরতে জানে।"[৮৮]

অত্যাচারী শাসকের চিরাচরিত রূপ, সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা আমাদের হৃদয়কে কিনে নেয়, কিনে নেয় আমাদের মেধাশ্রম ও দৈহিক শ্রমকে। আবেগ অনুভূতি হারিয়ে যায়, হৃদয়টাও যন্ত্রে পরিণত হয়। ছেলেটির সংলাপে এই হৃদয়বেদনাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়—

"আমার বুকের হাড় সরিয়ে হৃদয়টা চুরি করতে চায়। সবকটা আঙুলের শিরায় শিরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। আমি হাত মুঠো করতে পারি না, কিছু ধরতে পারি না। জান, দেয়ালে লাথি মারলে আমি আর শব্দ শুনতে পাই না।"[৮৯]

বস্তুত রাজাসাহেবের হাত থেকে কোনো কালে তাদের মুক্তি নেই। কারণ সারা পৃথিবীতেই গণতন্ত্রের জাল সুবিন্যস্ত এবং বিবিধ মুখোশে সারা পৃথিবীটাতেই খেলা করে বেড়ায় রাজাসাহেবের মতো শাসকগোষ্ঠীর দল। তবুও ছেলেটি ও মেয়েটিকে সাময়িক মুক্তি দিতে বৃদ্ধের বেশে হাজির হয় প্রথম। বৃদ্ধটি তাদের গারদের বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে ছেলেটির মনে হয়—

"গারদের বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কতো ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াব কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে— যখন পথ থাকে না তখনই তো জেলখানা! জান, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।"[৯০]

ছেলেটি ও মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে যেতে রাজি না হলে বৃদ্ধ হুমকির সুরে শাসায়—

"দেখছি দু'টোতে মিলে ফণা তোলে! ওটি কর না— বিষদাঁত ভাঙার পাথর থাকে আমার সঙ্গে-"[৯১]

তবুও ছেলেটি ও মেয়েটি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে গরাদের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। আর তখনই বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লাল দরজার সামনে নকশাকাটা পাঞ্জাবী, নাগরা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজাসাহেবরূপী প্রথম।

নাট্যকার সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। সম্মিলিত গণ-আন্দোলনই একমাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারে। দ্বিতীয়ের সুরে সুর মিলিয়ে ছেলেটিও যখন বলে ওঠে — 'একা একা যুদ্ধ হয় না—লাভ নেই।'[৯২] তখন বোঝা যায় শাসকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুর ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। এবারে হয়তো কাঙ্খিত মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

এরপর দামী খাকি শার্ট-প্যান্ট, পায়ে শু, মাথায় ফেল্টের টুপি পরে সফিস্টিকেটেড রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়। এখানে তার ক্রূঢ়তার চরমতম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রিয় কুকুর লুসি — যে, যেকোন কারো পদশব্দ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে চিনে নিতে পারে, যে শাসকের অবিডিয়েন্ট, যে দুষ্টু ছেলেদের কামড়ে রক্ত চুষে আত্মপরিতৃপ্তি খুঁজে পায়, তার খোঁজেই প্রথমের আবির্ভাব।

ছেলেটি ও মেয়েটির রক্ত পরীক্ষা করে রাজাসাহেব খুঁজে পেতে চান প্রতিবাদের মূল সূত্রটিকে। তিনি ভালো করেই জানেন কেউ কেউ সিস্টেমের বিরুদ্ধে ফোঁস করে উঠবেই। কিন্তু তাকে মেরে ফেললেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং তাকে ভাবতে হয়, খুঁজতে হয় তাদের ফোঁস করার কারণ কী? তাদের রক্তে কী আছে? রক্তের মধ্যে থেকে বিদ্রোহের বীজাণু খুঁজে বার করে তাকে সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে শেষ যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ছেলেটি গর্জে উঠে রাজাসাহেবকে নতুন একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। সে প্রতিবাদী স্ট্রে জানিয়ে দেয় —

"আমাদের রক্তের গভীরে আছে ঘৃণা আর প্রতিরোধ। একদিন তার মুখোমুখি আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। আর হয়ত এই এক্সপেরিমেন্ট সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকেই এগিয়ে আনবে।"[৯৩]

সমবেত জনতা বেশিদিন শাসকের রক্ত চক্ষুর চোখরাঙানি সহ্য করেনা। তাই তারা গড়ে তোলে সম্মিলিত প্রতিবাদ। কোরাসের কণ্ঠে শোনা যায় — 'এ খেলার শেষ — যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের

লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।'[৯৪] ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এইভাবে দেখা যায় 'রাজরক্ত' নাটকটিতে সব চরিত্ররাই প্রতীকধর্মী। মোহিত সচেতনভাবেই চরিত্রদের নামকরণ করেছেন প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্যক্তি, ছেলেটি, মেয়েটি নামে। লক্ষ্য করবার বিষয় মোহিত তাদের ব্যক্তিনাম ব্যবহার করেননি। তারা তাদের ব্যক্তি আইডেনটিটির পরিবর্তে সংখ্যায় চিহ্নিত। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র মতো। এখানেও আড়ালে থেকে সামগ্রিক সিস্টেমকে সচল রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ব্যক্তি রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তারই আজ্ঞাবহ দাস। ছেলেটি ও মেয়েটি সিস্টেমের জালে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে তারা জাল ছিঁড়ে বাইরে বেরোবার চেষ্টা করলেও তারা দেখে তারা আসলে মুক্তি পায়নি, বরং বৃহৎ এক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তবু মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে। তাই কখনো কখনো প্রতিবাদের ঢিল এসে পড়ে শাসকের অন্দরমহলে। শাসক বিচলিত হয়, যদিও সুকৌশলে উত্তপ্ত অবস্থাকে ঠাণ্ডা করে নিজেদের স্বার্থ প্রতিপত্তির ক্ষমতা দখলের খেলায় তারা পুনরায় আত্মনিয়োগ করে। এই খেলা চলতেই থাকে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজসাধ্য নয়। তবুও মুক্তিপিয়াসী মানুষের প্রতিবাদে গর্জে উঠে চেষ্টা চালিয়েই যেতে হবে, যতদিন না তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে তারা পৌঁছাতে পারছে। এই ভাবনায় ভাবিত হয়েই মোহিত যথার্থ রূপেই চরিত্রগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরেছেন। চরিত্রের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে তাঁর কৃতিত্ব তাই সমধিক।

৩০২.৪.১৫.২ : 'রাজরক্ত' — সংলাপ সৃজনে শিল্পকুশলতা

ট্র্যাজেডির আলোচনা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল নাটকের উপাদানগুলির মধ্যে প্লটের গুরুত্বকে সর্বাধিক বলে মনে করলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য নাট্য-ব্যক্তিত্বগণ প্লট অপেক্ষা চরিত্রকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে করেন। Luigi Pirandello বলেছেন "Every action (and every idea it contains) needs a free human personality if it is to appear live and breathing before us*f* It weeds something that will function as its motor characters in other words." বিশ শতকে এসে নাট্য সমালোচক নিকল বলেন, 'Dialogue is the soul of the Drama'. অর্থাৎ সংলাপকেই তিনি বলতে চেয়েছেন 'নাটকের আত্মা'। আচার্য ভরতও তাঁর নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে নাট্যসংলাপে দ্বন্দ্বের ব্যবহার ও পদ্য সংলাপের ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রোল্লেখিত চার প্রকার রীতির অন্যতম সাত্বতী রীতির চারটি ভাগের অন্যতম হল সংলাপ। সেখানে সংলাপের সংজ্ঞা বলা হয়েছে— "সংলাপঃ স্যাদ গভীরোক্তির্ণানাভাব সমাশ্রয়" অর্থাৎ ব্যঞ্জনাপূর্ণ বিচিত্র ভাবসম্বলিত গভীর উক্তিই হল সংলাপ। নাটকের আত্মা বলতে নানা মুনির নানা মত। পণ্ডিতদের কারও কাছে নাটকের আত্মা প্লট, কারও কাছে চরিত্র, বার কারও কাছে সংলাপ। তবু স্ব বিতর্ক ছাড়িয়ে একথা নির্দধিায় বলা যায় যে সংলাপ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নাটকের বিষয় ও চরিত্রকে সংলাপের মাধ্যমেই পরিস্ফুট করে তোলা হয়; প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপই তাদের ব্যক্তিত্বের বাহক। সংলাপের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই নাট্যকাহিনি গতিশীলতার মাধ্যমে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। সংলাপ না থাকলে নাট্য ঘটনা যেমন অগ্রসর হতে পারতো না, ঠিক তেমনি মূক পাত্রপাত্রীর ক্রিয়াকর্মও একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট হয়ে নাটকের সলিল সমাধি ঘটাতো। তাই নাট্য আলোচনায় সংলাপ বিশেষভাবেই আলোচ্য। প্রত্যেক নাটকের সংলাপের কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য থাকে। নাট্যকার কাহিনী অনুযায়ী

সংলাপ রচনা করেন। ঘটনানুসারে কখনো সংলাপের আয়তন সংক্ষিপ্ত করেন, চরিত্রের স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সংলাপ ব্যবহার করে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবসত্তাকে জীবন্ত করে তুলে ধরেন। নাট্যকারকে সরবদা খেয়াল রাখতে হয় যাতে সংলাপ কোনও অবস্থাতেই কৃত্রিম না হয়ে যায়। মনে রাখা উচিত সংলাপ নাট্য ঘটনার গতিকে যাতে বাড়িয়ে দেয়। না হলে নাট্যগতি শ্লথ হয়ে নাট্যকার্যে বাঁধার সৃষ্টি করবে। সংলাপে বাক্যের সুরগত উত্থান পতন, ধ্বনির যথোচিত বৈচিত্র্যসাধন, শব্দ প্রয়োগে সতর্কতা, অলংকার সৃষ্টি, রূপকল্প সৃষ্টি, নাট্য শ্লেষের প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্যঘটনা ও চরিত্রের যথাযথ রূপদান সম্ভবপর হয়ে ওঠে। নাট্য সংলাপের এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটকটির সংলাপ আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সবকিছুই নিয়মতান্ত্রিক। কেউ সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধাচারণ করলেই তার উপর আঘাত নেমে আসে। তবুও গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়াস চলে। আর সেই গণ-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করবার জন্য শাসক শ্রেণীও নিশ্চুপে বসে নেই। তারাও সর্বতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমগ্র সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য। তাই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠছে।

শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ বাস্তবে না পারলেও প্রতিমুহূর্তে শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজের স্বপ্ন সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে চায়— পাল্টে দিতে চায় সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে। রাজাসাহেবের জেলখানায় বন্দী ছেলেটি ও মেয়েটি দম বন্ধ পরিবেশ থেকে পালাতে চায়, মুক্ত আকাশে বুক ভরে শ্বাস নিতে চায়। কিন্তু শাসন যন্ত্রকে সচল রাখার চেষ্টায় ব্রতী শাসকের পারিষদবর্গ। কারণ রাজাসাহেব বেনিয়ম পছন্দ করেন না। তার চাবুক কথা বলে, তার কুঠিতে কারো কিছু সরাবার হুকুম নেই, চারিদিকে তার সজাগ চোখ সর্বদা সতর্ক। যদিও অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষ তাদের স্বপ্নের জগতে যমের ঘরে পাঠাতে চাই শাসককে। তরুণ ছেলেটির সংলাপে সেই আর্তিই যেন প্রকাশিত —

"রক্ত! রক্ত! ছুরিটা থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে! রাজাসাহেবের রক্ত! যেন সিঁদুরে মেঘটা গলে গলে পড়ছে।।আমি, আমি রাজাসাহেবকে মেরেছি। এবার এই ঘরটার চেহারা পুরো বদলে ফেলব। আমি একটা বাজে লোক নই, আমার ঘেন্না আছে, রাগ আছে, ইচ্ছে আছে"[৯৫]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোর করে যেকোন কাজ করতেই সাধারণদের বাধ্য করে। মাঝে মাঝে সম্মিলিত জনতার প্রতিবাদের ঢিল রাজাসাহেবের ঘরে এসেও প্রবেশ করে। কিন্তু শাসকের অবিচলিত মানসিকতার সুর শোনা যায় রাজাসাহেবরূপী প্রথমের সংলাপে—

"ওতো সব সময়ই হচ্ছে— তাই বলে ওই গোলমালটাই বা বেশি করে কানে যাবে কেন?....সেই প্রথম দিন থেকে ওরা একটা ঢিল ছুঁড়তে চাইছে— দীর্ঘ বছর পর একটা ঢিল এসে ঘরে পড়ল, বেচারা! একটু সান্ত্বনা তো ওদের চাই। ও ঠিক হয়ে যাবে, মন দিয়ে কাজ কর— সব ঠিক হয়ে যাবে।"[৯৬]

জনগণের যেকোনো প্রতিবাদী সুরের কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রশক্তি দমিয়ে দিয়ে প্রতিবাদকে তুচ্ছ করে তোলে। সেই সুরই শোনা যায় প্রথমের কণ্ঠে —

"বিপক্ষের অস্ত্রকে যত তুচ্ছ ভাবতে পারবে ততোই না তোমার মনোবল মানে কিনা অস্ত্রবল।"[৯৭]

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ত:সারশূন্যতা ও ধনতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার এক্সটেনশনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথমের সংলাপে—

"আসলে পড়াশুনোটা কী জান— এক ধরণের অ্যাসেসমেন্ট। আমি যা শেখাচ্ছি সেটা কদ্দুর গ্রহণ করতে পারলে, সেটাই হল মূল কথা। প্রশ্ন করতে পার— আপনি কী শেখাচ্ছেন? উত্তর হল, আমি যা শিখেছি, তাই শেখাচ্ছি। তার মানেটা হল এই যে প্রথমে কেউ একটা কিছু শিখেছিল— তারই এক্সটেনশন হচ্ছে এডুকেশন।.এডুকেশন হচ্ছে এক্সটেনশন অফ এডুকেশন— যার মানে হচ্ছে রিপিটেশন অফ রিপিটেশন। অর্থাৎ একটা জিনিসই মকসো করতে করতে এগিয়ে যাওয়া।"[৯৮]

অত্যাচারী শাসকের চিরাচরিত রূপ এবং পুঁজিবাদী শোষণের নগ্ন রূপ চিত্রিত হতে দেখি রাজাসাহেবেরূপী প্রথমের ভয়ঙ্কর সংলাপের মধ্য দিয়ে —

"আমার আঙ্গুলগুলো তোমার ঘাড়ে গলায় খেলা করছে— আঙুলগুলোও কথা বলে।.ভয় করছে। আঙুলগুলো আমার ধরে দেখো। যেমন শক্ত, তেমনি কমল। মিষ্টি করে ধরতে জানে, আবার দম বন্ধ করেও ধরতে জানে।"[৯৯]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা আমাদের হৃদয়কে কিনে নেয়, কিনে নেয় আমাদের মেধাশ্রম ও দৈহিক শ্রমকে। আবেগ অনুভূতি হারিয়ে যায়, হৃদয়টাও যন্ত্রে পরিণত হয়। ছেলেটির সংলাপে এই হৃদয়বেদনাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়—

"আমার বুকের হাড় সরিয়ে হৃদয়টা চুরি করতে চায়। সবকটা আঙুলের শিরায় শিরায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। আমি হাত মুঠো করতে পারি না, কিছু ধরতে পারি না। জান, দেয়ালে লাথি মারলে আমি আর শব্দ শুনতে পাই না।"[১০০]

ছেলেটির শুধু মনে হয়—

"গারদের বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কতো ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াব কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে— যখন পথ থাকে না তখনই তো জেলখানা! জান, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।"[১০১]

ছেলেটি ও মেয়েটির রক্ত পরীক্ষা করে রাজাসাহেব খুঁজে পেতে চান প্রতিবাদের মূল সূত্রটিকে। তিনি ভালো করেই জানেন কেউ কেউ সিস্টেমের বিরুদ্ধে ফোঁস করে উঠবেই। কিন্তু তাকে মেরে ফেললেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং তাকে ভাবতে হয়, খুঁজতে হয় তাদের ফোঁস করার কারণ কী? তাদের রক্তে কী আছে? রক্তের মধ্যে থেকে বিদ্রোহের বীজাণু খুঁজে বার করে তাকে সমূলে উৎপাটন না করতে পারলে শেষ যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ছেলেটি গর্জে উঠে রাজাসাহেবকে নতুন একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। সে প্রতিবাদী ন্ট্রে জানিয়ে দেয় —

"আমাদের রক্তের গভীরে আছে ঘৃণা আর প্রতিরোধ। একদিন তার মুখোমুখি আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। আর হয়ত এই এক্সপেরিমেন্ট সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকেই এগিয়ে আনবে।"[১০২]

শেষমেষ তাই ঘটে। রাজাসাহেবের মুখে উচ্চারিত হয় অসহায়িতের সংলাপ—

"প্রথম।। ব্লাড! বডড কম ছিল রক্ত দুটো শরীর অথচ এত কম রক্ত না! লুসিটারও পেট ভরে না! আপনারা ব্লাড রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এবারও আমি আপনাদের সুখী করতে পারলাম না। সমস্ত রক্ত ঘেঁটে-ঘুটেও খুঁজে পেলাম না কোথায় ওদের রোগের বীজাণুগুলো লুকিয়ে আছে ওদের রক্ত এতো চালাক, ধূর্ত, এতো পিছল ! আমার আঙুল ধরতে পারে না, মাইক্রোস্কোপে ছায়া পড়ে না।

একটু নাড়লে বাটির মধ্যে রক্তটা কিরকম খলখল করে হাসে। আমার শেষ যুদ্ধ ওদের এই ভয়ঙ্কর রক্তকণাগুলোর সঙ্গে। আমাকে জিততেই হবে, জিততেই হবে। বাটিটার রক্তে আমার ছায়া পড়েছে— কী সুন্দর মুকুট। (বাটিটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদের স্বরে) একী! আমার মুকটটার গায়ে অসংখ্য পোকা! রক্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আমার মুকুটে! আমার মুকুত! (দু'হাতে মাথার অদশ্য মুকুটটা চেপে ধরতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা মাটিতে আছড়ে পড়ে। মাথাটা চেপে ঐ দিকে ভয়ার্ত তাকায়, লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়) রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাকে তাড়া করছে, (প্রায় কান্নার মত গলায়, মাথাটা দু'হাতে চেপে শরীরটা বাঁকিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ভয়ার্ত সরে যেতে যেতে) গড়িয়ে গড়িয়ে রক্তটা আমাকে তাড়া করছে! লুসি! লুসি! সেভ মি! লুসি! (হঠাৎ যেন কাল্পনিক লুসিকে দেখতে পায়, স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু তবুও আতঙ্কিত গলায়) লুসি, মাই লুসি— ড্রিঙ্ক, লুসি ড্রিঙ্ক! (লুসিকে আদর করে) লুসি, মাই হানি! হ্যাঁ সবটুকু খেতে হবে, সবটুকু। (হঠাৎ কী দেখে যেন আর্তনাদ করে ওঠে) লুসি, গেট আপ। রান অন। লুসি, রান অন— রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে— পালা, লুসি পালা! রক্তটা তোকেও তাড়া করেছে, পলা!"[১০৩]

সমবেত জনতা বেশিদিন শাসকের রক্ত চক্ষুর চোখরাঙানি সহ্য করেনা। তাই তারা গড়ে তোলে সম্মিলিত প্রতিবাদ। কোরাসের কণ্ঠে শোনা যায় — 'এ খেলার শেষ — যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে। মিলিত মানুষের লড়াই, একটা দরকার। দরকার একটা শেষ লড়াই-এর।'[১০৪] ছেলেটি, মেয়েটি এবং কোরাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন ঘটে —

"ছেলেটি।। এস, অনুষ্ঠান শুরু হোক। আঘাত কর বর্বর স্পর্দাকে ইতিহাসের জন্য আঘাত কর।

মেয়েটি।। আঘাত কর সিংহাসনের শোষণে— মর্যাদার জন্য আঘাত কর।

দ্বিতীয়।। আঘাত কর শৃঙ্খলে স্বাধীনতার জন্য আঘাত কর।

কোরাস।। আঘাত কর জীবনের জন্যে আঘাত কর— আঘাত কর।"[১০৫]

'রাজরক্তে' মোহিত কাব্যধর্মী সংলাপের ব্যবহার করে নাট্যঘটনাকে পরিণামী ব্যঞ্জনার দিকে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেমন —

"দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের পাঠশালায় অগ্নিসংযোগ।

প্রথম।। শান্তি সেনানীর প্রহরায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট।

প্রথম।। রাজাসাহেবের ফ্যাক্টরিতে লক-আউট।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের ক্ষেত-খামার জবর দখল।

প্রথম।। জবর দখল নিবারক জব্বর আইন চালু।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের দপ্তরে দপ্তরে কর্মবিরতি।

প্রথম।। রাজাসাহেবের বিদ্রোহী কর্মীদের ছাঁটাই।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের গ্রামে-গঞ্জে ঝাণ্ডা আর ঝাণ্ডা।

প্রথম।। সবার ওপরে রাজাসাহেবের ডাণ্ডা আর ঠাণ্ডাঘর।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজপথে ছুরি, বোমা।

প্রথম।। রাজাসাহেবের হাতে টিয়ার গ্যাস গুলি।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্যে রাজপুরুষ হত্যা।

প্রথম।। রাজাসাহেবের রাজ্যে নারীপুরুষ হত্যা।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্য আজ রক্তাক্ত।

প্রথম।। রাজাসাহেবের হাত আজ রক্তাক্ত।

দ্বিতীয়।। রাজাসাহেবের রাজ্যে উত্তাল গণবিক্ষোভ।

প্রথম।। কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজাসাহেবের কমিশন নিয়োগ।

দ্বিতীয়।। কমিশনের চেয়ারম্যান রাজাসাহেব।।

প্রথম।। প্রথম সদস্য রাজাসাহেব।

দ্বিতীয়।। দ্বিতীয় সদস্য রাজাসাহেব।

প্রথম।। রাজাসাহেব দীর্ঘজীবী হউন।

দ্বিতীয়।। জনতার দাবি, রাজাসাহেবের রক্ত চাই।

প্রথম।। রাজাসাহেব আজও জীবিত।"[১০৬]

মোহিত কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংলাপকে অ্যাবসার্ড নাটকের উপযোগী করে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন—

"প্রথম।। কী হল?

মেয়েটি।। ঢিল পড়ছে। ঘরে ঢিল পড়ছে। বাইরে থেকে ওরা ছুঁড়ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

প্রথম।। তাই নাকি? ছড়াটা বল তও? বল, ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বল, সকলে মিলে বল।

মেয়েটি।। (প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে) বুলেট বন্দনা রাজাসাহেব বিরচিত।

দ্বিতীয়।। (প্ল্যাটফর্মের নিচে ডানদিকে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গীতে) ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি।। যে কোন অশান্তির একমাত্র মহৌষধ।

ছেলেটি।। একবার মাত্র ব্যবহারেই কাজ হয়।

দ্বিতীয়।। ঢ্যাক, ঢ্যাক, ঢ্যাক।

বুলেট! বুলেট! বুলেট!

মেয়েটি।। যে কোন অশান্তির চিরস্থায়ী আরাম।

ছেলেটি।। অত্যন্ত সস্তা, অথচ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয়।। (কোমর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে) জানটি আপনার গেল কোথায়, একি তাজ্জব বাত, রাজাসাহেবের বুলেটে হয়েছেন কাৎ।

মেয়েটি।। আঃ বুলেট!

ছেলেটি।। আঃ বুলেট! (বুকে হাত দেয়)

মেয়েটি।। ট্রেডমার্ক লক্ষ করিবেন, টুং টাং! (রেডিও কমার্শিয়াল)

প্রথম।। সাধু! সাধু!"[১০৭]

দ্বিতীয়ের সংলাপেও অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ প্রকাশিত —

"হ্যাঁ, আমিও চাইসবাই চায়। শুধু চাওয়ার পথটা বলে দেয় কোনটাতে তৃপ্তি, কোনটাতে বিষ! আমি জানি, আপনাদের জিভে বিষ লেগে আছে। একটু একটু করে ভিতরে যাচ্ছেস্লো পয়জন। হ্যাঁ, এইভাবে, ঠিক এইভাবে এ-বাড়িতে একটি মেয়ে আজ আর বেঁচে নেই। ময়ূরের মত কোথাও উড়ছে আর সোনা দিয়ে বাঁধানো কতকগুল লোভী দাঁত একটা একটা করে তার পালক টেনে ছিঁড়ছে। রক্ত আর লিপস্টিক মিশে গেছে, জড়োয়া কঙ্কণ আর হাতের শেকল মিলে গেছে। এটা আমারও বাড়ি নয়। আমরা এসে পড়ি, কিংবা আরো সত্যি কথাআমাদের টেনে নিয়ে আসা হয়।"[১০৮]

এইভাবে দেখা যায় 'রাজরক্ত' নাটকের সংলাপে যেমন প্রতীকী ব্যঞ্জনা আছে, ঠিক তেমনি আছে গভীরতর ব্যাপ্তি। খেলার ছলে ইঙ্গিতধর্মী সংলাপে নাটকের বক্তব্য বিষয়কে নাট্যকার তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রই তাদের নিজস্ব সংলাপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ এখানে ভাব প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম। আর তাই একথা স্বীকার করতেই হয় শুধু নাট্যবিষয়ের উপস্থাপনা নয়, বরং সামগ্রিক অর্থেই এই নাটকের শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় সংলাপ রচনা করে মোহিত যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

৩০২.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রাজরক্ত' নাটকের সংলাপ কিভাবে নাট্যকাহিনীর সহায়ক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করে সংলাপ রচনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বিচার করো।

২। 'রাজরক্ত' নাটকের চরিত্রগুলি নাট্যকারের বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনের সহায়ক — তোমার মতের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দাও।

৩। 'রাজরক্ত' নাটকটির চরিত্রগুলির নামকরণে নাট্যকারের কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল কী? — তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৪। "গারদের বাইরে বেরিয়ে মনে হচ্ছে আরো বড় একটা কয়েদখানায় আটকে যাচ্ছি। ভেবে দেখো, কতো ইচ্ছে আমাদের। কিন্তু যেই সেদিকে পা বাড়াব কারা যেন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে— যখন পথ থাকে না তখনই তো জেলখানা! জান, আমরা আসলে ছাড়া পাইনি।" — কার উক্তি? চরিত্রটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করো।

একক - ১৬

রাজরক্ত নাটকের নামকরণ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৬.১ : 'রাজরক্ত' — নামকরণ

৩০২.৪.১৬.২ : 'রাজরক্ত' — মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন

৩০২.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.৪.১৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৬.১ : 'রাজরক্ত' — নামকরণ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটকটির প্রথমে নাট্যকারকৃত নামকরণ ছিল 'গিনিপিগ'। 'রাজরক্ত', নাটকটি 'গিনিপিগ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বহুরূপী' পত্রিকায় ১৯৭১ - এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। এই 'গিনিপিগ' নাটকটি বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যদলটি মঞ্চস্থ করে। নাটক মঞ্চস্থ করার সময় বিভাস চক্রবর্তীর সুপরামর্শে নাটকটির শেষাংশের কিছু পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'রাজরক্ত'। এই নাটকটি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য রচনার মধ্যে প্রথম স্পষ্টতর রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করেছিল।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে 'রাজরক্ত' ও 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটক দুটি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ধারণা ব্যক্ত করেন—

"'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' ও 'রাজরক্ত' নাটকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও এক বিরুদ্ধ অপশক্তির সঙ্গে আমাদের একটা লড়াই চলছে। আমি রাজনীতিকে যেভাবে দেখেছি একটা বিরুদ্ধ অপশক্তি বা মানুষকে বিভিন্নভাবে খর্ব করে, পঙ্গু করে, বিধ্বস্ত করে। সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার প্রতিবাদও আছে, প্রতিরোধও আছে। সেটাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। তাই আমি এক টুকরো বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনাকে নিয়ে নাটক লিখিনি। এই সমস্ত ঘটনা ঘটার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটাকেই আমি নাটকে আনবার চেষ্টা করেছি।" (মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎকার, নাটক নিয়ে কথা, অনুস্টুপ, ১৪১৯)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন ১৯৭০-৭১ - এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশ্বব্যাপী দুর্বিসহ ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। ঐ বছরই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার দ্বারা যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটে। পরে ১৯৬৯ সালে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করলেও তার পতন ঘটে। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতা দখল করে। এ সময় উগ্রবাদীদের ক্ষমতার আস্ফালন এবং পুলিশের বর্বর আচরণ ও দমননীতির

বলি হতে হয় অসংখ্য তরতাজা প্রাণকে। মোহিত তাই গণতন্ত্রের ইতিবাচক রূপ খুঁজতেই 'রাজরক্ত' নাটকটি লেখেন। মোহিত সমূলে আঘাত করতে চেয়েছেন তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয়। শাসক গোষ্ঠীর সযত্ন লালিত স্বপ্নের সুউচ্চ মিনারে সজোরে আঘাত করে মোহিত দেখাতে চেয়েছেন গণজাগরণের উত্থানের শক্তির কাছে শাসকের সবই ঠুনকো, ভঙ্গুর। তাসের ঘরের মতো শাসন যন্ত্রের মিনার ভূলুণ্ঠিত হয়। সাধারণরা পৌঁছে যায় তথাকথিত রাজার শয়ন কক্ষে।

বস্তুত আমরা সবাই যেন এক শাসন যন্ত্রের কারাগারে বন্দী। এই কারাগারেই নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন খেলা চলতে থাকে, যেমন উন্নয়নের খেলা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের খেলা, সুকৌশলী চিন্তায় মানুষের ইজ্জত কিনে নেওয়ার সস্তা অথচ অনতিক্রম্য এক পলিটিক্সের খেলা।

এই নাটকে রাজা সাহেব জালের আড়ালে থাকেন না। তিনি সর্বসমক্ষেই তার গোপন খেলা খেলে যান। বিজ্ঞানীরা যেমন পরীক্ষাগারে গিনিপিগকে নানাবিধ পরীক্ষার বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেন, ঠিক তেমনি এখানে সেই পরীক্ষাগারের বস্তু হিসেবে নির্বাচিত হয় সাধারণ মানুষেরা। কিন্তু কিছু তরুণ থাকে যারা শাসকের শাসানিকে অগ্রাহ্য করে। তারা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধতা করে, কখনও হাতে তুলে নেয় ধারালো অস্ত্র। তারা শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে এবং রাজরক্ত চায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই হয়তো বিভাস চক্রবর্তী 'গিনিপিগ' নামকরণ পরিবর্তন করে 'রাজরক্ত' নামকরণ করেন।

সমালোচক যথার্থই লিখেছেন —

"রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর নাটকে সাংকেতিকতায়, রূপকে রাজনীতি এসেছে। সমসাময়িক সময়ের হিংস্র-উগ্র মারণ রাজনীতির চাপে একজন সৃষ্টিশীল নাট্যকারের অন্তরে যে আর্তির উন্মেষ হয়, তাকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় কখনোই অস্বীকার করেননি।" (বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ, নাট্য ব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, কোরক, ২০১৩, পৃষ্ঠা — ২৩৫)

নাটকটি সম্পর্কে বিভাস চক্রবর্তী লেখেন—

"অথচ সময় চাইছিল এক নতুন মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে, তাঁর নিজস্ব গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য সবকিছু নিয়েই। দিক পরিবর্তনের খানিকটা আভাস আমরা লক্ষ্য করলাম ক্যাপ্টেন হুরবাতে। কিন্তু শ্যামলবাবুর মঞ্চায়নে সেই পরিবর্তন তেমনভাবে চোখে পড়ল না। এর পরেই ১৯৭০-এর শারদ সংখ্যা বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশ পেল গিনিপিগ। থিয়েটার ওয়ার্কশপের সহযোগী অশোক মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় পড়েই ফেললাম সে নাটক। স্থির হলো আমরা এই নাটকটি করব। তখন পাশে নেই সেইসব গুণী বন্ধুরা-অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, নিমাই ঘোষরা। তাই এককভাবে নির্দেশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হল আমার ওপর। তখন কেউই জানতাম না যে, যৎসামান্য হলেও অন্তত দু'এক পৃষ্ঠার একটা ইতিহাস সৃষ্টি হতে চলেছে— মোহিত প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছেন একজন সর্বজনমান্য আধুনিক নাট্যকার হিসেবে, থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নাট্য দল হিসেবে এবং আমি সামান্য পরিচিতি পেয়ে যাব একজন নির্দেশক রূপে।" (মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রাজরক্ত কাহিনী, বিভাস চক্রবর্তী, বহুরূপী, পৃষ্ঠা-২২০)

'রাজরক্ত' নামের মধ্যে আছে প্রতীকী ভাবনার ব্যঞ্জনা। 'রাজরক্ত' নাটকটি রূপকধর্মী নাটক। দিক পরিবর্তনের আভাস সূচিত করে নাটকটি রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। সমসাময়িক পরিস্থিতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ভাবনাচিন্তার প্রেক্ষিতেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর গিনিপিগ নাটকটি রচনা করেন। আর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চারে গর্জে উঠতেই নাটকটি মঞ্চস্থ করার ভাবনা মাথায় আসে নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর। নির্দেশক মনে করেন—

"এই বিশ্বগ্রাসী শক্তি নানা দেশে নানা বেশে রাজত্ব করছে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে সেই শক্তি বা তার প্রতিভূদের ওপর আঘাত হানলে তার কম্পনতরঙ্গ কোনো বিশেষ দেশ বা রাজ্য ছাড়িয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দেখলাম, এ নাটকে মোহিতের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যায় আর কোন অস্পষ্টতা রইল না। অন্যদিকে তিনি এটাও বললেন যে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফুর্ত আকাঙ্ক্ষা বা আবেগকে মূলধন করে কত বিশালাকায় দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না, তার বিশ্ব বিস্তৃত জালকে ছিন্ন করা যায়না। ওই সময়টাতে আমরা তো প্রতক্ষ করেছিলাম যে, রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনে যুব ছাত্র সমাজের যে অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে অভাব ছিল না সততার বা সংকল্পের, তাদের স্বপ্ন ছিল গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙেচুড়ে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার, কিন্তু জনগনকে কি তারা সেই ভাবনার শরিক করে তুলতে পেরেছিল? একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আঘাত করার প্রয়োজনীয় শক্তি ও সমর্থন কি তারা সঞ্চয় করতে পেরেছিল?" (মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রাজরক্ত কাহিনী, বিভাস চক্রবর্তী, বহুরূপী, পৃষ্ঠা — ২২০)

রাষ্ট্র আমাদের পুতুল বানিয়ে রাখে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। আমরা তাই প্রতিনিয়ত ছকে বাঁধা গতানুগতিক জীবনে আবদ্ধ হয়েই দিন অতিবাহিত করি। তা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেও আমরা বিফল হই। সে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা যায়না, মাঝে মাঝে সম্ভব হলেও গায়ে লেবেল সেঁটে যায় দেশদ্রোহীর, রাষ্ট্র বিরোধীর। রাজরক্ত নাটকের অবয়বে নাট্যকার সেই বিধিবদ্ধ জীবনকেই দেখাতে চেয়েছেন। আমাদের বন্দী জীবনের অসহায়তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। পাশাপাশি নাট্যকার রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সবাইকে পূর্বতন সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রে পরিবর্তন ঘটাবার আহ্বান জানিয়েছেন। 'রাজরক্ত' নাটকে এই রাজনৈতিক বোধে স্থির হয়েছেন নাট্যকার। নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে সবশেষে বিভাস চক্রবর্তীর মন্তব্যটি উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার ইতি টানা যেতে পারে —

"রক্তকরবী-র রাজার মতো এ নাটকে রাজাসাহেব তার গবেষণাগারে মানুষ দিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। জনগণ তাদের কাছে গিনিপিগ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ তাদের পরীক্ষার বস্তু, ঠিক যেমন বিজ্ঞানীদের কাছে গিনিপিগ। তাই মোহিত নাটকের নাম দিয়েছিলেন গিনিপিগ। শাসক তাদের গিনিপিগ মনে করতেই পারে, কিন্তু মানুষ তো মানুষই। তাই তারা, তরুণ প্রাণগুলি এই ব্যবস্থা মানতে চায় না, বিদ্রোহ করে, রাজার বিনাশ চায়, চায় রাজরক্ত। নামটা এসেছিল অশোকের মাথা থেকে। বিসর্জন নাটকের রাজ পুরোহিত রঘুপতি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ষড়যন্ত্র করে প্রজাবৎসল রাজাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, জয় সিংহকে রাজরক্ত নিয়ে আসার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। এ নাটকের রাজরক্ত কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো ব্যক্তি রাজার রক্ত এ নয়, একটি ব্যবস্থার বিলোপ বা বিনাশের প্রতীক এই রাজরক্ত।" (মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রাজরক্ত কাহিনী, বিভাস চক্রবর্তী, বহুরূপী, পৃষ্ঠা — ২২৬)

৩০২.৪.১৬.২ : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবন দর্শন

নিছক creative freedom-এর উল্লাস, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর আবিষ্কার, বা শিল্পের কারুকার্য রচনার জন্যই মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক লেখেননি। তিনি লিখেছেন মানুষ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে। তিনি ভালো করেই জানেন আমরা এমন একটা পরিবেশের মধ্যে বাস করছি যেখানে কোনও মানুষই তার স্ব-অবস্থানে সুখী নয়। বিবিধ অভাব, অসন্তোষে তারা কণ্টকিত, তাদের জীবন নিষ্প্রভ, তাদের স্বপ্ন

বর্ণহীন, এমনকি তাদের আশা দুরাশামাত্র। মোহিত ভালো করেই জানেন যে এমতাবস্থায় মানুষ যদি আন্দোলিত হয়ে না ওঠে, তাহলে এই বিধ্বস্ত জীবন সতেজ, সজীব এবং সুন্দর হয়ে উঠতেই পারে না। যদিও সারা পৃথিবীটাই যেন কিরকম আন্দোলনহীন। মোহিত জানেন একমাত্র সঠিক রাজনীতির হাতেই রয়েছে এই ভগ্নদশার মধ্যে নতুন নির্মাণের শক্তি। কিন্তু কেবল রাজনীতিরই নয়, শিল্প-সংস্কৃতির ভূমিকাও এক্ষেত্রে কম নয়। একজন লেখককেও তাই দায়িত্ব নিতে হবে সমাজসচেতন, রাজনীতি সচেতন থেকে মানুষের জীবন ও পরিবেশ বদলে দেওয়ার, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষকে প্রসন্নতা দেওয়ার। মোহিত মনে করেন একজন আদর্শ লেখক চিরকালই মানুষ ও সমাজের বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনীতি যেন এই বিবেকবোধ সঞ্জাত উপলব্ধি। তাই তাঁর কাছে মানুষের কল্যাণকে উপেক্ষা করে যে লেখা তা বিবেকহীন বিভ্রান্তি। তিনি ভালো করেই জানেন যে তিনি এমন ক্ষমতাবান লেখক নন যে, তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে মানুষের দুরবস্থা বদলে দিতে পারবেন। কিন্তু সেকথা ভেবে তিনি আপন কর্তব্য পালন না করে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে দায় এড়াতে পারেন না। তাই সীমিত ক্ষমতা নিয়েও তিনি লিখে যান মানুষের হয়ে, মানুষের জন্যে।

তথ্যসূত্র :

১-১০৮ : মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 'নাটক সমগ্র', প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আশ্বিন, ১৪০৮, পৃষ্ঠা : ৪১৭-৪৫৯

৩০২.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'নাটক সমগ্র', মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আশ্বিন, ১৪০৮, পৃষ্ঠা : ৪১৭-৪৫৯

২। নাট্যতত্ত্ব বিচার, ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

৩। রবীন্দ্র ভাবনায় রাজা, শতঞ্জীব রাহা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২।

৪। বিশেষ ক্রোড়পত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বহুরূপী পত্রিকা।

৫। বাংলা নাটক ও নাট্য মঞ্চ, নাট্য ব্যক্তি মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ, ২০১৩।

৬। নাট্য ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি, ড. অপূর্ব দে, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১২।

৭। নাটকের কথা, ড. অজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্যলোক, ১৪২০।

৮। বাংলা নাটকের ইতিহাস, ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে''জ পাবলিশিং, ১৪১১।

৯। স্মৃতি সত্তা নাট্য, শ্যামল ঘোষ, প্রতিক্ষণ, ২০০৩।

১০। বিমোহিত কথকতা, শ্যামল ঘোষ, আজকাল, ২০১৩।

৩০২.৪.১৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রাজরক্ত' নাটকটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো/ 'গিনিপিগ' থেকে 'রাজরক্ত' — নামকরণ পরিবর্তনে কারণ কী ? — তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।